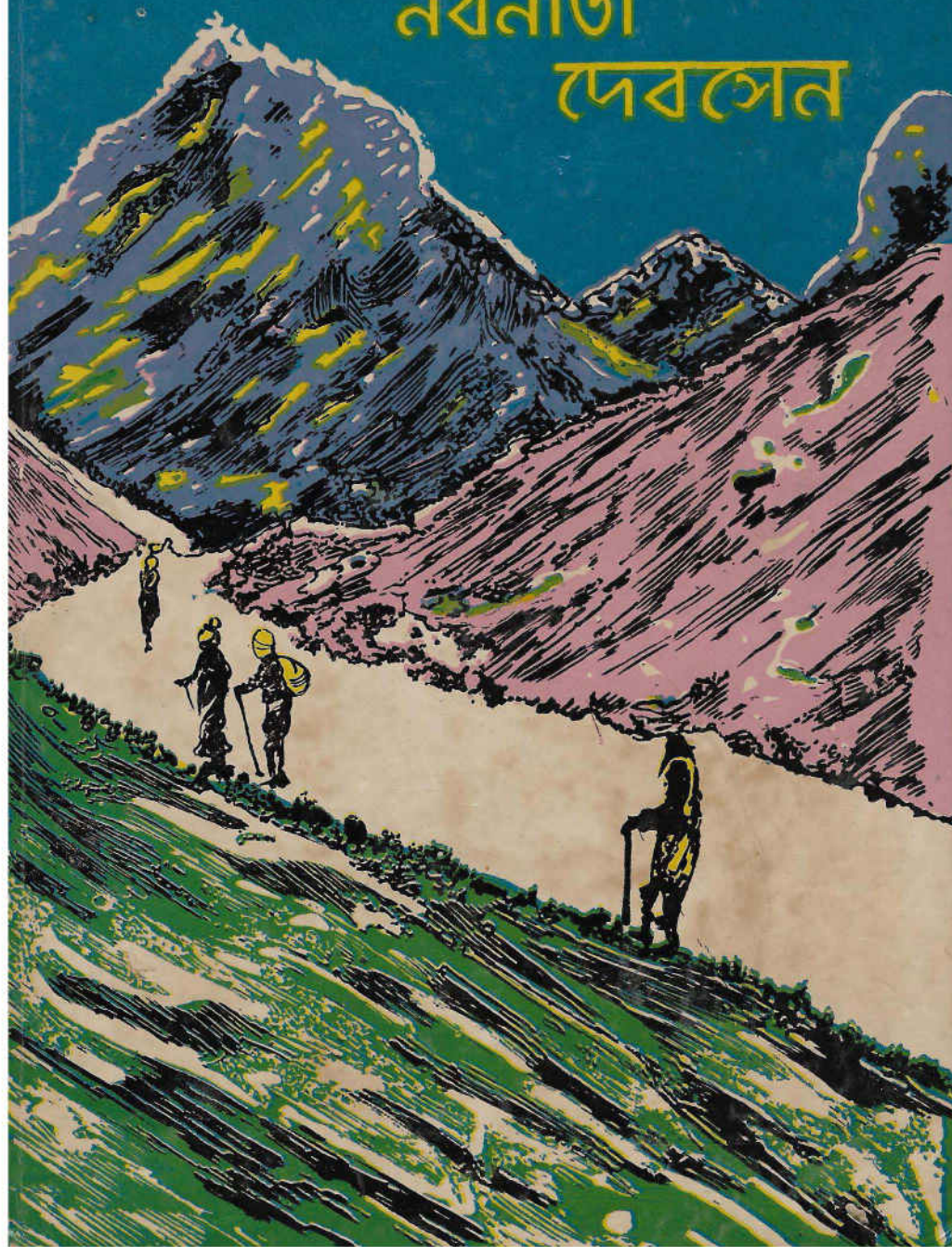


হে পূর্ণ তব চরণের কাছে

নবনীতা

দেবসেন



# হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে

নবনীতা দেবসেন



মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স  
প্রাইভেট লিমিটেড

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৯১, মার্চ ১৯৮৫  
দ্বিতীয় মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৩৯২, নভেম্বর ১৯৮৫  
তৃতীয় মুদ্রণ  
— আঠারো টাকা —

প্রচ্ছদপট  
অঙ্কন : পূর্ণেন্দু রায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্রীমাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩  
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র  
সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

সংসারে এক সন্ন্যাসী

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

পূজনীয়েষু



হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে

## প্রথম পর্ব

### মুখবন্ধ

সেখানে অভূত বৃক্ষ, দেখিতে স্ফটিক ।

যাহা চাই তাহা পাই, নাম করতরু ॥

কল্পতরু কি আর আমরা চিনি? ধরুন আপনি একদিন খুব মনে দুঃখ করে ভাবলেন—আহা, এজন্মে তাহলে আর উত্তরাখণ্ড ঘোরা হবে না। অমনি আপনার সামনে একটা সাদা ধবধবে নতুন গাড়ি এসে থামলো, জানলায় জানলায় নীল পর্দা। ঝকঝকে উর্দিপরা ড্রাইভার নেমে বললো—“সেলাম বিবিজী। গাড়ি হাজির।” আপনি অবাক। কিসের গাড়ি? কার গাড়ি? —“জী আপকো লিয়ে—চারোখাম যানা হয় না?” আপনি তখন চোখ বুজে মনে মনে বললেন, “হুদীকেশ!” অমনি বো করে গাড়ি ছুটলো—মৌরাত, রুড়কী, হরদুয়ার হয়ে হুদীকেশ। যেন হুদীকেশ নয়, গুণ্ডিরাজ্য! ভূতের রাজার বর কিন্তু দুঃখীরা সত্যি সত্যি পায়। গুপী গাইনের গল্পটা একদম মিথো নয়। মনের দুঃখে বনে গিয়ে আপনি যখন বলছিলেন, “উত্তরাখণ্ড যাত্রা, আমার আর হোলো না”—তখন সেই গাছটাই যে কল্পতরু বৃক্ষ ছিল, তা কি আর আপনি জানতেন? জানতেন না তো? এখন জানলেন। জগতে মানুষের ইচ্ছাপূরণ যে এমন করেও হয়, তা কে জানতো? আজ আপনাদের যে রূপকথার গল্পটা বলবো, তার এককণাও আপনারা বিশ্বাস করবেন না। আপনারা কেন, আমার নিজেরই তো বিশ্বাস হচ্ছিল না। এখনও যেন বিশ্বাস হয় না—যতবার ভাবি—সুরেশ সিং, জগৎ সিং, মিষ্টার মিটার, শিব-খুর্টানন্দ, মেসোমশাই—সবই যেন স্বপ্নের মতন সত্য অথচ অলীক মনে হয়।

আমার জীবনটাই যে স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন মাজিয়ে গড়া। ছেলেবেলাতে মা বলেছিলেন, খুব মন দিয়ে যদি কিছু চাওয়া যায়, ঈশ্বর সেই ইচ্ছে ঠিক পূর্ণ করেন। কিন্তু সেইজন্তেই ঈশ্বরকে এটা-ওটা চেয়ে বিরক্ত করতে নেই। আমাদের ধর্মে বড়ই ভিকিরিপনা। কেবল দাঁও দাঁও। দেহি দেহি। সংস্কৃত মন্তরেও রূপং দেহি যশং দেহি জয়ং দেহি, আবার বাংলা পাঁচালিতেও। পুরুষমানুষও চেয়ে চেয়ে কুল পাচ্ছে না, মেয়েমানুষও তাই। পুরুষ বলছে দ্বিষো জহি—তুমিই আমার শত্রুদের মেয়ে দাঁও। নারী বলছে, শিবের মতন স্বামী দাঁও, সভাউজ্জল জামাই দাঁও, আমার সন্তান যেন থাকে ছুধেভাতে। কী নির্লজ্জ ধর্ম রে বাবা!

পনেরো-ষোলো বছর বয়সে হঠাৎ আবিষ্কার করলুম, ঈশ্বরের কাছে কিছু চাইবো যে, ভক্তিই তো নেই। ঈশ্বরই আছেন কি নেই সেইটে নিয়েও মনে মনে নতুন প্রশ্ন। বড়ই মুশকিল হোলো। তারপর থেকে ঈশ্বরের কাছে একটাই প্রধান চাইবার জিনিস। মশাই হে, যদি থাকো, তবে সেটা বুঝিয়ে দাও। টের পাইয়ে দাও। অর্থাৎ কিনা, পূর্ণা ভক্তি দাও। পূর্ণ বিশ্বাস দাও। এই ত্রিশঙ্ক অবস্থা বড় কষ্টের।

ওদিকে দেখতে পাই ঈশ্বরের সব স্পয়েন্ট্‌ চাইলড চাদিকে খেলা করে বেড়াচ্ছে। তারা ভগবানের খায় ভগবানের পরে আবার ভগবানেরই দাড়ি গুপড়ায়। আমার এরকম কয়েকজন ‘হাইলি সাকসেসফুল’ রূপেগুণে ধনেমানে জগদ্বিখ্যাত বন্ধুবান্ধব আছেন, যাদের জীবন ঈশ্বরের অসীম করুণার স্পষ্ট ছবি এবং যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা ঘোরতর নাস্তিক। কেউ সুবুদ্ধিতে, কেউ বা গুরুর আদেশে (অর্থাৎ রাজনীতির কল্যাণে)। তাঁরা যা কিছু পেয়েছেন সবই তাঁদের নিজগুণে প্রাপ্ত বলে তাঁদের বিশ্বাস। ভগবান তাঁদের ছপ্পড় ফুঁড়ে সবই দিয়েছেন, কেবল নিজেই ছাড়া। জীবনে কখনো তাদের এতটুকু টক্করও লাগতে দেননি, যাতে হঠাৎ ছিটকে এসে তাঁর পায়ে না পড়ে! তার বদলে দিয়েছেন কী? দর্পিত নাস্তিক্যের আত্ম-হীন আত্মবিশ্বাস। আর আমার মতন স্পয়েন্ট্‌ চাইলডও আছে। অনবরত অনার্জিত দোভাগ্যে যার জীবন উপচে পড়ছে। আর সবসময়ে বুকের মধ্যে কে যেন সাবধান করছে, এসব কিছু তোর নয়, এ হল পরের ধনে পোদ্ধারি। তুমি বাপু মনে কোর না এসব নিজগুণে অর্জন করেছো, যা পাচ্ছো সবই তিনি দিচ্ছেন বলেই। চিরকুতার্থ থাকা উচিত। এর বদলে কী করছো তুমি হে,—যে এত এত পাবে? এই যে বৃষ্টির গন্ধ, এই যে হঠাৎ চোখের সামনে রংচটা শুকনো গাছপালাগুলো ভিজে গিয়ে কাঁচা সবুজ রঙের হয়ে গেল, যেন হাত দিলেই পাতা থেকে হাতে কাঁচা রং উঠে আসবে—এই যে পালসকরের “চলো মন”, এই যে আমীর খানের মালকোঁষ এসব ম্যাজিক তোমার প্রাপ্য নাকি? মনে রেখো, মনে রেখো।

আর শুধু কি তাই? ভক্তি দাও ভক্তি দাও করে চাঁচানোর ফলেই বোধ হয় হ্যাঁচকাটানে এনে পায়ের ওপরে কেলেন। “হে ঈশ্বর রক্ষা করো” বলা ছাড়া তখন আর পথ ছিল না, আর ঈশ্বরেরও তাই আশ্রয় না দিয়ে উপায় ছিল না।

সেই নিশ্চিত আশ্রয়টায় বসে বসেও, মাঝে মাঝে সব গোলমাল হয়ে যায়। আবার খোঁচাই, আবার বলি—“কী হে, এখনো আছো, না নেই? আর তো পারছি না। থাকো যদি, তবে একবার দেখিয়ে দাও?” অন্তরালবর্তী তিত্তি-বিরক্ত হয়ে মাঝে মাঝে বলেই বসেন—“তবে জাখ, বেটি! দেখে নে।”

আর তখনই শুরু হয় আমার সকল স্বপ্নের দিন। এমনি একটা স্বপ্নের সত্যি হওয়ার কাহিনী আমার উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ। স্বভাবটি যার পরশ্রীকাতর, তাঁকে বলব, এ লেখাটা পড়বেন না। কল্পতরুর গল্প কিন্তু সকলের জ্ঞাত নয়। হিংস্রটে হলে আপনার পুজোর ছুটিটাই মাটি। রূপকথার মতন অযাচিত অভাবিত ভাগ্যের গল্পে অবিশ্বাসীরা ভীষণ মন খারাপ হয়ে যেতে পারে। মা বলেন যারা হিংস্রটে, তাদের মত দুঃখী কেউ নেই। তারা দিনরাত জ্বলছে পুড়ছে। এ লেখাটা পড়লে তাদের দহনজ্বালা আরো বাড়বে—তখন হরুকি প্যারির কমণ্ডলু থেকে গঙ্গোত্রীর হিমজল ঢেলে আমি সে-জ্বালা জুড়োতে পারব কি ?

১

### পূর্বকথা

কলকাতা থেকে রওনা হয়েছিলুম দিল্লিতে—কেননা ১৯৮১-তে এই দিল্লি থেকেই আমার স্বপ্ন দেখার শুরু। যেমন হয় আমার ক্ষেত্রে, নব্বই ভাগই আক্সিডেন্টাল, দশভাগ গোছগাছ করে। সেবারে ফরিদাবাদের বড়খল লেকে একটা অলু ইন্ডিয়া সেমিনার ছিল। সেমিনার-শেষে দিল্লিতে এসেই দেখি আমার বৌদিভাই আর বিনিমা এসেছে কলকাতা থেকে, গাড়ি করে হব্বীকেশে যাচ্ছে, গুরুর আশ্রমের পুজো দেখতে। আমিও নিমন্ত্রিত। লাকিয়ে উঠলুম। পরদিনই যাত্রা শুরু। কী ভালোই লেগেছিল, দিল্লি থেকে হরিদ্বার হয়ে হব্বীকেশের পথ। আর হব্বীকেশে পৌঁছে যেন প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। আমরা যে অল্প আশ্রম ধর্মশালায় ছিলাম, তার দুপাশে দুটি মন্দির। স্বন্দর কাঁসরঘণ্টা ঢাক শানাই বাজে। মন্ত্রধ্বনি ঘরে বসে শোনা যায়। মন্দিরে আরতি দেখা যায়। ঘর ভরে যায় ধূপধুনোচন্দনের স্বাসে। ঘরই নয়, মনও। আর জানলায় খাড়া পাহাড় হিমালয়। হিমালয়ের সেই সূর্য-ওঠা দেখবার জগ্গে আমি রোজ সূর্যের আগেভাগে উঠে পড়তুম।

অনেকক্ষণ ধরে অভিষেকের বন্দোবস্ত চলত। আকাশ নীল থেকে বেগুনী, বেগুনী থেকে গোলাপী, গোলাপী থেকে লাল হলুদ, লাল হলুদ থেকে তীর উজ্জ্বল চোখধাঁধানো সোনার তৈরি হয়ে যেত। আর মহান্ হিমালয়ের যে নামহীন শিখর দুটি আমার জানলার সামনে, নিশ্চয় তারা নেপালের মৎস্তপুচ্ছ, আন্দেস-এর মাচ্চুপিচ্চুও নয়, কিন্তু তেমনিই দেখতে—তারা আস্তে আস্তে কালো পাথরের সিংহাসনের মতন গুরুগম্ভীর চেহারা করে ফেলত। তারপর হঠাৎ একসময়ে টুকুস করে একলাফে স্থান্যদের উঠে আসতেন পৃথিবীর ওপার থেকে এপারে। লাল-টুকটুকে আপেলের মত চেহারা। হহুমানের দোষ ছিল না—থেতে ইচ্ছে হতেই

পারে। সিংহাসনে বসতেন অল্প কিছুক্ষণ। তারপরেই উঠে যেতেন আকাশে।  
সোনার বর্ণটি হয়ে। রোজই দেখতুম, আর রোজই মনে হত যেন ম্যাজিক দেখছি।

আর গঙ্গা? কলকাতার গঙ্গাকে দেখেই যে-চোখ অভ্যস্ত, সে-ই কি করে  
হুবীকেশের গঙ্গাকে গঙ্গা বলে চিনে নেবে? একজন চণ্ডাপেড়ে গরদপরা গিন্নী-  
বান্নি, আরেকজন নীল ডুরেশাড়ি জড়ানো ছটফটে কিশোরী। গঙ্গাকেও কী  
ভালোই লেগেছিল! রোজ যেতুম, শালপাতার বাটিতে করে ফুল নিয়ে নদীতে  
ভাসিয়ে দিতুম ত্রিবেণী ঘাট থেকে।

হে স্বর্গবাসী আত্মীয়বন্ধুরা, মুক্ত হও তোমরা, তৃপ্ত হও তোমরা, হে মর্ত্যবাসী  
আত্মীয়বন্ধুরা, তোমরাও সুখেশান্তিতে থাকো।

ঠাণ্ডা-কনকনে স্বচ্ছতোয়া গঙ্গার জলের নিচে কী অপরূপ রং-বেরঙের আর  
নিভুল গড়নের হুড়িপাথর! প্রত্যেকটি যেন দৈব কারিগরের হাতেগড়া, যেন  
বাটালি দিয়ে চটে পালিশ করে সাজানো হয়েছে। গঙ্গারনাথ আশ্রম থেকে গঙ্গায়  
স্নান করতে হলে যে পাথরে পথটি বেয়ে যেতে হয় তার চারিপাশে প্রত্যেকটি  
পাথরকেই মনে হত কোলে তুলে বাড়িতে নিয়ে যাই। যেন নাড়ুগোপালটি।  
হাজার বছর ধরে গঙ্গার স্রোত আর হিমালয়ের বাতাস তাদের কত যত্নে কত আদরে  
গড়েপিটে তৈরি করেছে। হুবীকেশের হিমালয় তুষারচূড় নয়। অরণ্যশীর্ষ।  
হুবীকেশের হিমালয়ও হুবীকেশের গঙ্গার মতই তরুণ, সবুজ, বাড়ন্ত।

কী ভালোই লেগেছিলো। জীবনে পূজোআচ্ছা করি না। ধূপধূনো-ফুল-  
চন্দনের সঙ্গে মুখ-দেখাদেখি নেই। অথচ ঘরে বসে সেই পূজোর গন্ধে কী করে  
যেন মনটা ভরে যেতো! ঠিক গির্জের ভিতরে গেলে তার নিস্তর্রতায় আর ধূপের  
গন্ধে আর মোমের আলোয় মিলে ঠিক যেরকম একটা পবিত্রতার স্বাদ দেয়, যে  
রকম মুগ্ধতা তৈরি করে, ঠিক তেমনি লাগত ঘরে বসেই। অথচ একদিনও ঐ  
ছুটি মন্দিরে যাইনি। বিগ্রহ কেমন, দেখতেও আগ্রহ হয়নি। বিগ্রহের যা কাজ,  
তা তো বুকের মধ্যে আপনাই হয়েছে। আর ভিতরে ঢুকে কী হবে?

আমার বুকের ভেতরটা বড় জটপাকানো—আমি ঠিক বিশুদ্ধ হিন্দু নই।  
আমি তো মুসলমানও নই। খৃষ্টানও নই। আমি কি বৌদ্ধও নই? কি জানি!  
একটু একটু বৌদ্ধ বরণ হতে রাজী আছি। হুবীকেশ হিমালয় আর গঙ্গার এই  
কবিশ্রেনশের কিন্তু মানুষকে ঘাড় ধরে হিন্দু বানিয়ে দেবার একটা অতিরিক্ত শক্তি  
আছে—অন্ততপক্ষে আস্তিক তো হতে বলবেই। এখানকার আকাশ-বাতাসই  
বলছে—অস্তি, অস্তি। তুমি একা একা নাস্তি। নাস্তি বললে কী হবে! শুনছে কে?



### নাম শুধু নাম

সেই হৃষীকেশে গিয়েই পথের বাঁকে বাঁকে প্রবল সব লোভনীয় নামের পাল্লায় পড়ে গেলুম। আহা, এত সব সুন্দর সুন্দর নামের জায়গাও আছে পৃথিবীতে? এই আমারই নিজের দেশে? দেবপ্রয়াগ—এত মাইল, রুদ্রপ্রয়াগ—এত মাইল, শ্রীনগর—এত, উত্তরকাশী, গুপ্তকাশী, পিঙ্গলকোটী, যোশীমঠ, নন্দপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, শোণপ্রয়াগ—কত দেশ, কত চমৎকার সব রূপকথার মত নাম। কেদারবদ্রী যেতে হলে এসব জায়গা পথে পড়ে। এমনিতে নাকি এসব জায়গায় কেউ যায় না। এসব সুন্দর নামের জায়গাগুলিতে যাবো বলেই আমি ঠিক করলুম, কেদারবদ্রীই যেতে হবে। নইলে তো আর এতগুলো প্রয়াগ দেখা হবে না। হৃষীকেশে জিজ্ঞেস করে জানলুম, অসামান্য কাণ্ড—সব পৌরাণিক নদনদীর এখানে ঠেসা-ঠেসি করে নামছেন—কোথাও মন্দাকিনী নদীর সঙ্গে অলকানন্দার দেখা হচ্ছে, কোথাও হনুমানগঙ্গার সঙ্গে যমুনার। কিন্তু বৌদি রিনিমাকে রাজী করানো গেল না কেদারবদ্রীর পথে বেরিয়ে পড়তে। জামাকাপড়, বিছানাপতর, টাকাকড়ি কিছুই সঙ্গে নেই, পাগলামি তো করলেই হোল না? আমার সঙ্গে কিছু টাকা ছিল—আমি একাই বাসে করে বেরিয়ে পড়বো ঠিক করলুম। তখন পুজোর ছুটি। এমন সুযোগ আর হবে না। বাসের খোঁজখবর নিলুম হৃষীকেশে গ্যাটোয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম সংস্থায়, আর হরিদ্বারে গিয়ে উত্তরপ্রদেশ ট্যুরিজম ডিভেলপমেন্ট অফিসে।

রিনিমাটা ভারী দুষ্ট।

—তুমি বাবে বাসে করে? তাহলেই হয়েছে, দিদি! ওই ছাথো তো, বাসের জানলার নিচে বাসের গা-ভর্তি সাদা সাদা ওগুলো কী? ঐ স্ট্রাইপস?

—কী রে রিনিমা?

—বমি। শুকনো বমির দাগ। বাসস্থানু সঝাই বমি করতে করতে যাবে। তুমি না পারবে থামতে, না পারবে নামতে—সেটা ভালো হবে?

এক মিনিটেই আমার যাবার মন্ত উৎসাহে ঠাণ্ডা পানি। না বাপু, বমি করতে করতেও যেতে পারব না, বমি করা দেখতে দেখতেও যেতে পারব না।—ট্যাক্সি? ট্যাক্সির খরচ কত?

একবার কাশী টু কুস্ত ট্যাক্সিতে গিয়ে খুব স্মার্ট হয়ে গেছি। অন্তত ট্যাক্সি ভাবতে অস্ববিধা হয় না, কার্যত ভাড়া করতে হয়তো হবে। U. P. Tourism-

এর ট্যাক্সি, হরিদ্বার-কেদারবন্দী-হরিদ্বার—চারদিনে আড়াই হাজার টাকা। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও ট্যাক্সিওয়ালাই করে দেবে। বিছানাপত্রও যোগাড় করে দেবে। হুবীকেশ থেকে ট্যাক্সি নিলে দুই। পাঁচশো বাঁচছে। ট্যাক্সিতে আর দু'এক জনকে নিলে ভাড়াটা ভাগাভাগিও করে নেওয়া যায়। আমি তক্ষুনি ঠ্যাং তুলে রাজী। দুই বউ যে কী শত্রুতাই করেছিল সে-বছর! বৌদি বললে, না মশাই, আমি তোমাকে একা একা ট্যাক্সিতে করে অজানা অচেনা লোকদের সঙ্গে কেদারবন্দী যেতে মোটেই ছেড়ে দিচ্ছি না! ও-পুজোয় বরং আমরা তিনজনে মিলে আবার আসবো কেদারবন্দীতে।

হল না। বৌদির-মনের মতন সঙ্গী জুটলো না। চেনা সঙ্গী না হলে বৌদি ছাড়বে না। চেনা বান্ধবের সঙ্গে দেখা হলো তাঁরা সবাই বাসে যাচ্ছেন। ট্যাক্সির খরচ অনেক বেশি। হল না, হল না, হল না, হল না—মনের মধ্যে কেবল এই শব্দ গুনতে গুনতেই দিল্লি ফিরলুম। ফিরে বুলুম এটাই ভাল হয়েছে—যাইনি। বাড়িতে আমার অল্পপস্থিতি দীর্ঘায়িত হওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত ছিল না—নানান বিপদ-আপদ গিয়েছিল আমি যখন ছিলাম না। তীর্থ-টার্ণের ব্যাপারে, কথায় বলে না, “না টানলে, হয় না”!

৩

### গাইডবহি

এর আগে কেদারবন্দীতে যাওয়ার কোনো ইচ্ছে একবারও অনুভব করিনি, যদিও ইচ্ছে হয়েছে বিষ্ণোদেবী যাবার, জালামুখী দর্শন করবার। এসব জায়গা শুধুমাত্র দুর্গম বলেই যেতে শথ হয়েছে, ধর্মীয় কারণে নয়। কিন্তু কেদারনাথে, বন্দীনাথে অনেকদিনই যাত্রা স্থগম হয়েছে—কত রকম “স্পেশাল” ছুটছে কত ধরনের যাত্রীদের পিঠে বেঁধে। তাই আমার উৎসাহ জাগেনি। এবারে হুবীকেশে গিয়ে এই একটা প্রবল ঝাঁক এলো, একটা জেদ—যাবই। ফেরার পথে হরিদ্বার আর কন্থল থেকে দুয়েকটা বইপত্রও কিনে ফেললুম।

সবচেয়ে জরুরী বইটির লাল মলাটের সামনে বন্দীনাথের মন্দিরের ছবি। তাতে স্পষ্ট বাংলায় লেখা—“শ্রী চারোধাম যাত্রা ঐর মহাত্ম ॥ শ্রী বন্দীনাথ-কেদারনাথ গঙ্গোত্রী-যমোত্রী।” —এত সুন্দর নামকরণ যে-বইয়ের, সে-বই কি না কিনে পারি? কলকাতায় এসে সেই বইটিই হল আমার প্রধান অনুপ্রেরণা। তাতে একটি অপূর্ণ ন্যাপে (ভগীরথ ও শিবের ছবি সমেত) মানস-যাত্রার মার্গও দেখানো রয়েছে। “গাইড-বহি” কিনা। যাত্রার সব খরচ-খরচা দেওয়া আছে—

প্রস্তুতি, খাওয়া, থাকা, ডাঙী, কাঙী, ঘোড়া কুলি সমেত। “খাওয়া-খরচ জন-পিছু প্রতিদিন ১।০ হইতে ২ পড়িয়া যায়—তবে গরীব যাত্রীরা খাওয়াদাওয়া কাপড়জামা কেনা সব করিয়া ৬৫-১০০ মধ্যে বদরীনাথ যাত্রা সমাপন করিতে পারে। পাহাড়ী ঘোড়ার ভাড়া ১০ আনা মাইল প্রতি, তবে বিশেষ পাওয়া যায় না। কুলীদের মজুরী ছাড়া প্রত্যহ দুই পয়সার ছোলা খাইতে দিতে হয়।” এই গাইড-বহি পাঠকরতঃ কেউ যদি ভক্তিতরে দুই পয়সার ছোলা নিয়ে একজন কুলির কাছাকাছি যান, তাহলে তাঁর কী হবে আমি ভাবতেও ভয় পাচ্ছি।

খাওয়ার খরচ এখনও ওখানে শস্তাই—দিনে দশ থেকে পনেরো টাকার মতন। ঘোড়া? মাইলপ্রতি আট আনা ছিল, এখন চৌদ্দ কিলোমিটারে পঞ্চাশ টাকা (হিসেবটা আপনি কবে নিন)। যাই হোক, ওতে কেদারনাথের স্তোত্র আছে, বজ্রীনাথের মাহাত্ম্যাবর্ণনা আছে, চারধামের মহিমাগাথা আছে। আর আছে কিছু অনামান্ত মন্তব্য। যেমন এই তিনটি :

এক ॥ মানবের মনই মানবকে বন্ধনে জড়িত বা বন্ধনমুক্ত করে।

দুই ॥ নিশ্চিন্ত ও নিবন্দ মনে, তন্ময় হইয়া, আস্তিকতার সহিত, সমস্ত ভুলিয়া, নিজে প্রসন্ন থাকিয়া ও অপর যাত্রীদিগকে প্রসন্ন করিয়া পথ চলিতে হয়। সেই সব যাত্রীই যাত্রার বাস্তবিক আনন্দ উপভোগ করে।

তিন ॥ উত্তরাখণ্ডের অদ্ভুত যাত্রামাহাত্ম্য আজও রহিয়া গিয়াছে। অত্যাশ্চর্য্য তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য তো রেলগাড়ি অপহরণ করিয়া লইয়াছে।

ইংরিজি বাংলা আরও কিছু বই কেনা হল। পরের বছর পুজোর ছুটি পেরিয়ে গেল। যাত্রা হলো না। কলকাতায় ফিরে অবধি চেষ্টা করছি সঙ্গী সংগ্রহের। যাতে ট্যাক্সিভ্রমণ নিরাপদে এবং কম খরচে হয়। তা আমি একা চেষ্টা করলে কি হবে, কেদারনাথ-বজ্রীনাথের পক্ষে কোনোই চেষ্টা ছিল না। অতএব সঙ্গী আর জোটে না। বৌদি বিনিমা আর নামও করে না যাবার। অথচ স্বয়ং হ্রদীকেশকে আমি কথা দিয়ে এসেছি। বলেছি ঠিক আসবো, আবার আসবো, দেখা হবেই। আর কেউ যাক বা না যাক—আমার না গেলেই নয়। সেই ১৯৮১-র পুজোয় প্রণাম করে এসেছি হ্রদীকেশে শীতারামদাস ওঙ্কারনাথকে, কনথলে আনন্দময়ী মাকে, ঋষিদের আশীর্বাদ কি বিফলে যেতে পারে? ১৯৮২-তে এঁরা দু’জনেই দেহ রাখলেন, হ্রদীকেশ এবং কনথল দুটি ঠাইয়ের আলোবাতাসের রং বদলে দিয়ে। বিরাসীর গ্রীষ্মে ঘোরাঘুরি অনেক হলো : ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, রাশিয়া, আমেরিকা, ক্যানাডা। পুজোর ছুটিতেই দেশে ফিরে আবার বেরুনো অসম্ভব।

তাই ওটা পিছিয়ে দিতে হোলো।

মনকে বললুম সামনের বারে। গ্রীষ্মের ছুটি পড়লেই। যত কিছু কাজকর্ম থাকুক, সব ফেলে রেখে চলে যাবো। আমার মনের ভাবখানা ঠিক যেন কোনো মানিত আছে, রক্ষা করেতেই হবে।

৪

### চলো দিল্লি পুকারকে

যেহেতু সেবার দিল্লি থেকে গিয়েছিলাম সেই জন্তেই এবারেও সোজা দিল্লি গিয়ে হাজির হব ঠিক করলুম। ট্যাক্সিভাড়া করে যখন যাবই তখন যে ক'জনকে পারি তাতে ভরে নিই, এই ভেবে শেষমুহুর্তে মা সঙ্গে দিয়ে দিলেন পিকোলোকে, আমার বড় মেয়ে—যার পার্ট ওয়ান পরীক্ষা এক মাস পরেই। আর একা একা স্ত্রীজাতির দু'জন ট্যাক্সি করে হিমালয়ের নির্জন বাঁকে বাঁকে ঘুরে বেড়াবে এটা সহিতে না পেরে দীপঙ্কর শেষতম মুহুর্তে, বেলা ৫টার সময় জোকা থেকে রঞ্জনকে তুলে নিয়ে এল। রঞ্জনের জন্তে নিজের জামা-কাপড় দিয়েই একটা ব্যাগ গুছিয়ে দিল দীপঙ্কর—যেহেতু নিজের ছুটির আবেদন অফিস নাকচ করে দিয়েছে। উল্লাসে ভাসতে ভাসতে তিনজন যাত্রী দিল্লি রওনা হলেন। চেকার এলেন যখন ট্রেন চলতে শুরু করেছে। তখন খেয়াল হলো—টিকিট? ওদের টিকিটই নেই তো! টিকিট আছে তো কেবল আমার। আমি তো একলাই আসছিলুম।

যথারীতি সমস্ত আত্মীয় পরিজনই আপত্তি করছিলেন :

এ কি তোমার কুস্তমেলো যে একরাত্তির দু'রাত্তিরেই হয়ে গেল? এ অনেকদিনের ব্যাপার—অস্থবিস্থ করলে? বয়েস তো রোজ রোজ কমে যাচ্ছে না? তারপরে আরো সাতটা বছর গেছে—হেঁপো রুগীদের পাহাড়ে চড়া কি উচিত? ইয়ারে, তোর হার্টের সেই ব্যাথাটা?

—ওসব কবেই সেরেহুয়ে গেছে। এখন হার্টে ব্যথা লাগেও না, করেও না। তাছাড়া একা তো ঠিক যাচ্ছিও না।

—তবে যে গুনলুম, বাড়ির কেউ যাচ্ছে না?

—বাড়ির কেউ যাচ্ছে না বটে তবে আরো অনেকেই যাচ্ছে।

—কারা?

—ওই কুস্তমেলায় যারা গিয়েছিল না, তারাই যাচ্ছে।

—যাচ্ছে? তবু ভাল। বিপদে-আপদে ওরা তোকে দেখবে। আমাদের জন্তে গঙ্গোত্রীর জল আনতে ভুলিসনি কিন্তু। আর সব জায়গা থেকেই প্রসাদ

নিবি। তুই যেমন, হয়তো কিছুই আনবি না !

যাক, যে কোনো একটা ব্যাখ্যা দিয়ে খুশি করে দিয়েছি মাসি-পিসিদের। কুজের কারা গিয়েছিল? সারা ভারতবর্ষের মানুষ। তারাই তো যাবে কেদারনাথে, বঙ্গীনাথে। আমার কথাটা মিথ্যে নয়। আমার সঙ্গীরা পথ জুড়ে ছড়ানো। আবার তারই প্রমাণ পাওয়া গেল যেই চেকার উঠলেন, আর আমাদের থেয়াল হোলো যে ওদের টিকিটই কাটা হয়নি। গুরুগম্ভীরা চশমা পরা একজন মাস্টারনী যে ভুলে ভুলে বিনা টিকিটে দুটি প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে নিয়ে হাত্তবদনে এয়ার কন্ডিশণ্ড কামরায় উঠে বসে থাকে, এটা তো চোখে দেখেও বিশ্বাস হবার কথা নয়। তাই তাঁরা বিব্রত হয়ে বার-বারই বলতে লাগলেন—“তুটো প্ল্যাটফর্ম টিকিটও নেই? কী আশ্চর্য! এখন কী করি? এদের নামিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।” হুসময়ে আমাদের অভিভাবক হয়ে উঠলেন মিটার মুখার্জী, আমার বড়ুর দাদা। তিনি সপরিবারে এই কামরাতেই যাচ্ছেন। নগদ বিশ হাজার টংকা বেতনে এক বিদেশী কোম্পানীতে মাস্তানি করে এই দেশেই বসে উনি ওই মাইনেটা পান। তাই তাঁর আত্মবিশ্বাসের রকমটাই কিঞ্চিং আলাদা। এবং পরিমাণটাও ( ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতির দ্বিগুণ )। অনতিবিলম্বেই মিঃ মুখার্জী খানিক কহতব্য এবং খানিক অকহতব্য উপায়ে বহুং গচ্চা দিয়ে সমস্তটা আমাদের পকেট থেকে চেকারদেরই পকেটে চালান করে দিলেন। ফলং পথে যে কোনো ইন্সটিশানে রোরুগ্গমান অবতীর্ণ না হয়ে দিল্লি স্টেশনেই আমরা তিনটি টিকিট সমেত “সদস্যানে উত্তীর্ণ” হতে পারলুম।

“আপনারা রাইটাররা যে কী করেন?” খুব মাইল্ডলিই বলেছিলেন মিঃ মুখার্জী। “এত রাতে পথের মধ্যে বাচ্চা মেয়েটাকে নামিয়ে দিলে কী যে হত!” অবশ্য আমার বিশেষ দুর্ভাবনা হয়নি। প্রথম থেকেই ‘যে খায় চিনি তার চিনি যোগান চিন্তামণি’ পলিসিতে গা ছেড়ে আছি। যা হয় হবে। অতশত ভাবতে পারি না বাবা। তাহলে আর অত বড় ভগবান আছেন কী করতে, জগতের সব ভাবনা-চিন্তা যদি এই তুচ্ছ আমাকেই করতে হোলো!

অগত্যা ভগবান মিঃ মুখার্জীকে অকুস্থলে পাঠিয়ে দিলেন। অকৃত্রিম স্নেহমমতা পরোপকারের ইচ্ছে এবং সক্ষমতার এমন স্পষ্টাম সম্মেলন দেখা যায় না চট করে। তদুপরি এমন নিখাদ ভালোমাহুধী!



### অর্থম্ অনর্থম্

আগে থেকেই দিল্লিতে বন্ধুবান্ধবদের বলে রেখেছি খোঁজখবর জেনে রাখতে। রত্না নিয়েছিল সব সন্ধান। তবে চারধাম যাত্রার নয়, শুধুই কেদারবন্দীর। দিল্লি ট্যুরিজমের ট্যাক্সি—যাতায়াত পাঁচ হাজার। দিল্লি ট্যুরিজমের বাসট্রিপ—সাতশো দশ জনপ্রতি। তবে বাস না ভরলে ট্রিপ দেয় না। এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে। লাকসারি বাসট্যুরও আছে, তবে আগামী তিন হপ্তা বুকড।

নানা মূনির নানা মত। এ বলে এটা করো ও বলে ওটা কোর না, আর আমি তো একদম মনস্থির করতে পারি না। মহা মুশকিলে পড়লুম। দুটো জায়গা পাঁচ হাজার হলে, চারটে তো দশ হবে। পাঁচ বা দশ দুটোই আমার ক্ষমতার বাইরে। এদিকে সঙ্গে মেয়ে। তিনি আবার বাসে চড়ে বসতে পারেন না। কলকাতার রাস্তায় আমার গাড়িতেই তাঁর মাথা ঘোরে, গা গুলিয়ে ওঠে। দুটি কন্টাই এ বিষয়ে এক। শুই মেয়েকে নিয়ে বাসে করে পাহাড়ী পথে পথে একেবেঁকে ওঠানামার প্রশ্ন নেই। সেই রিনিমার প্রদর্শিত লাল বাসের গায়ের রেড অ্যাণ্ড হোয়াইট স্ট্রাইপস মনে পড়ে গেল। নাঃ! আর বাসে যাওয়া হবে না। গাড়িই নিতে হবে। বরং কাল রাত্রেই টেনে হরিদ্বার চলে যাই। সেখান থেকে দ্বীকেশ। সেখান থেকে ট্যাক্সি।

এখানে এসে শুনছি ওই অঞ্চলে দৈনিক ৪/৫-তে থাকা-খাওয়ার গল্প। সব গুল্‌গল্লই। জনপ্রতি এক একটা মীল ৪ থেকে ৬ এবং বাথরুমসহ ভদ্রস্থ বাসস্থানে ১০ থেকে ৫০ পর্বন্তও লাগে। অর্থাৎ খরচ আছে। তত্পরি ট্যাক্সি-ভাড়া। পাঁচজনকে নেয়। অর্থাৎ আমরা আরও দুজনকে নিতে পারি। এখনও যদি আড়াই থাকে, তবে হয়তো বা দেড় হাজারেই—কিন্তু এ কী, আমি তো কেবল কেদারবন্দী ভাবছি। কিন্তু যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী স্বদু? দ্বিগুণ? কি হয়তো তারও বেশিই পড়ে যাবে। তার জন্তে যাত্রী জোটাও শক্ত। কিছু টাকা ধার নিতে হবেই দিল্লি থেকে। ধার মানেই তো শোধও দিতে হবে? কে জানতো ভাড়া এত বেড়ে গেছে? একা এলে বাসেই চলে যেতুম। এখান থেকেই বাসে বাসে। হরিদ্বার, দ্বীকেশ, দেৱাহুন, মূর্মোৱী, শ্রীনগর, দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ—যেখানে খুশি থামতে থামতে—বাস বদলাতে বদলাতে। যতদিন খুশি থাকতে থাকতে! সেই যাওয়াই ঠিক হত। এখন হয়ত যাওয়াই হবে না। দ্বীকেশ থেকে চারধামের ট্যাক্সিভাড়া কত কেউ বলতে পারলো না। তবে

পাঁচের কম হবে না—এটা সবাই বললে। তার ওপর তিনজনের থাকা-খাওয়া পুজো-পাণ্ডা ঘোড়া-ভাণ্ডী এটা ওটা কেনা। ওরে বাবা, এ তো বিলেত যাবার সমান। তাহলে বরং নাই বা গেলাম! রঞ্জন বলল, “তাহলে খুবই ভাল হয়, আমার অকারণ কামাই হচ্ছে। ছুটি পাওনা নেই। দীপঙ্করদার চাপে পড়ে লীড উই দাউট পে-তে এসেছি।” পিকো বলল, “তাহলে তো খুবই ভাল হয়। আমারও হাতে সময় নেই। সামনে পার্ট ওয়ান, জার্মানটা একদমই তৈরি হয়নি। দিম্মার আর শিবুমামার জোরজুলুমে এসেছি—চল, দিল্লি বেড়িয়েই ফিরে যাই।”

যাত্রীসঙ্গীদের এই অপরূপ প্রেরণাপূর্ণ কথাবার্তা শুনে মন অমৃতরসে সিঞ্চিত হল। গেলেও ভাল, না গেলেও ভাল—এই অবস্থায় এদের নিয়ে রওনা হয়েছিলুম। এখন দেখি দুজনেই না-গেলেই ভাল-র এসে দাঁড়িয়েছে। এদের সঙ্গে নিয়ে কোথাও যাওয়া যায়? এত অনিচ্ছুক সঙ্গী নিয়ে ভ্রমণে বেরুলে “যাত্রার বাস্তবিক আনন্দ অনুভূত হইবে” কী উপায়ে?

আমি বললুম, “যাক গে, ওরা না-হয় কলকাতাই ফিরে যাক। আমি যাবই। ট্রেনে হরিদ্বার চলে যাই কালই।” মিঃ মুখার্জী আবার উদ্ধারকর্তার ভূমিকার অবতীর্ণ হয়ে বললেন, “দাঁড়ান, দাঁড়ান, একটু ভেবে দেখি কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা। রাত্রে তো আপনার বন্ধুর বাড়িতে আমাদের নেমস্তন্ন। ওখানে নিশ্চয় অনেকের সঙ্গেই দেখা হবে আপনার।”

## ৬

### শিকে ছিঁড়ল

দেখা হোলোও। নানা ধরনের শক্তিম্যান, পদমর্যাদাবান ব্যক্তিত্বে দিল্লি শহর পরিপ্লাবিত। তাদের মধ্যে আমার মতন তৃণদূর্বাদলেরও মহীর্নহ বন্ধুর অভাব নেই। আমার যাত্রার যজ্ঞাণা শুনে হাত উল্টে একজন বললেন, “এজন্ত ভাবনার কী আছে? আমার সেক্রেটারী সব বন্দোবস্ত করে ফেলবে। আপনি কেবল একটা দিন সবর করুন। কেদারবদ্রী অনবরত সবাই যাচ্ছে। বি আওয়ার গেস্ট!”

—তার মানে?

—মানে বোঝার কিছুই নেই। এটা পি. আর. ফর্ম আর কি—পাবলিক রিলেশানস্। কালকের দিনটা আমাকে দিন, পরশুই আপনাদের রওনা করিয়ে দেব। কোথায় কোথায় যেতে চান? জায়গাগুলোর নাম বলুন তো?

—ঘমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ। এই তো, ব্যাস। ত্যালি অফ ক্লাওয়ার্ড বন্ধ। হেমকুণ্ডে ইঁটতে হয়। ওসব যাব না। গোম্খ ইচ্ছে

ছিল, কিন্তু রওনা হবার সময় গোমুখ যেতে মা বারণ করে দিয়েছেন। কাজেই আর যাবার কিছু নেই। পি. আর. দেখে বিমুগ্ধ হয়ে গড়গড় করে বলে যাই। মন দিয়ে শুনে বহুটি বললেন, “ও. কে.। কাল টেলিফোনে সব জানাব। ইতি-মধ্যে প্লীজ রিল্যাক্স। বাসে করে বেরিয়ে পড়বেন না। কী ভাবে কী করা যায় দেখছি। হয়ে যাবে একটা কিছু। ইউ গ্যাল বি আওয়ার গেস্ট।”

টেলিফোন এল। ব্যবস্থা সম্পূর্ণ। কোম্পানির গাড়ির ড্রাইভার এখানে আপনাকে তুলে নেবে। হৃষীকেশে আপনি কোম্পানিরই গেস্টহাউসে থাকবেন, ওখানকার গাড়ির ড্রাইভার আপনাদের চারধার ঘুরিয়ে আনবে। ওসব অঞ্চলে হিল্-ড্রাইভিং জানা চাই কিনা? আমাদের দিল্লির ড্রাইভার ওটা ঠিক পারবে না। পাহাড় থেকে ফিরে আবার আমাদের কোম্পানির গাড়িই আপনাকে দিল্লি নিয়ে আসবে। উইল টেন ডেজ বি ইনাক্স! আর ডু ইউ নীড ফিফটিন?

আমি টেলিফোনটা কানে ধরেই আছি, কিন্তু ঠিক বাংলা ভাষা বলে বোধ হচ্ছে না।

“বি আওয়ার গেস্ট” মানে তো নিখরচায়। কিন্তু সেটা ভুল বুঝিনি তো? গাড়ি, ড্রাইভার, টেন-ফিফটিন ডেজ, গেস্ট-হাউস—এসব কী বলে রে বাবা! আমি চুপচাপ শুনেই যাচ্ছি। বিশ্বাস করতে পারছি না। প্রশ্ন করেই উনি মুশকিলে ফেলে দিলেন। দশ দিন, না পনেরো দিন? খরচ-খরচা কত? বুঝতেই তো পারছি না ব্যাপারটা। এটা কি সত্যি?

—খরচ-খরচা কত, তার ওপরে অনেকটা নির্ভর করবে, তাই না? গাড়ি ড্রাইভারের জন্ত কি ডেইলি-বেসিসে—?

—কী আশ্চর্য! কালই বললাম না? ইউ আর আ জিয়ার ফ্রেণ্ড অব্ আওয়ার হাউস। অ্যাণ্ড আওয়ার মোস্ট অনারড্ গেস্ট। আপনাকে আতিথ্য দিতে পেরে আমরাই কৃতার্থ। আপনার কোনো খরচের প্রশ্ন উঠছে না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে শুধু গাড়ি ড্রাইভার পেলেই তো হোলো না? প্রত্যেক জায়গায় বুকিং চাই! সেটার সময় নেই। ওসব জায়গায় ফোন করাও অসম্ভব। এখন ‘ঠাই নাই ঠাই নাই ছোট এ তরী’ অবস্থায়, সাজনের শেষ প্রান্ত—সব ট্যুরিস্ট-লজ ভর্তি। আপনারা থাকবেন কোথায়? ‘চেষ্টা করছি এক মিনিষ্টারের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে নেবার, যাতে জায়গা পেতে সুবিধা হয়। দেখি!

ঠিক বেলা একটায় ঝকঝকে চকচকে জানলায় জানলায় সাদা লেসের পর্দা আঁটা সবুজ গাড়ি এসে দাঁড়ালো। ধবধবে উর্দিপরা তরুণ ড্রাইভার নেমে নমস্কার করে বললে, “গু কার ইজ হিয়ার, ম্যাডাম। লাগেজ রেডি!”

জাহুর চটিটি পায়ে গলিয়ে হাতে হাতে তালি পড়লো। চলো হৃষীকেশ! রঞ্জন উঠলো, পিকো উঠলো, আমি উঠলুম। হৃষীকেশ নয়, প্রথমে চলো জনপথ আর পালিকাবাজার। রঞ্জনের কিছু জামাপ্যান্ট কিনতে হবে। টুপি চাই জুতো চাই। আমিই কেবল টুপ্পার স্কুলের পি. টি. জুতোজোড়া নিয়ে এসেছি পাহাড়ে চড়বার জন্তে। রঞ্জন আর পিকোর পায়ে চটি।

বাজার করে রওনা হতে হতে বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে হয়ে গেল।

৭

## যাত্রা

কল্পতরুর যাত্রা শুরু।

কী হলো? বিশ্বাস হচ্ছে না তো? শুধু কেরার-বদ্রীর পাঁচ হাজার—ট্যাক্সিতে। সেই শুনে পরশু যাত্রার আইডিয়াটাই ত্যাগ করছিলুম। মনে আছে তো? আর এখন? রওনা হলুম চারধাম। ফ্রী। বিনা খরচে। বাঙালীকে বাঙালী না দেখিলে কে দেখিবে? আর ভাগ্যিস, কুস্তুর যাত্রাটা ইনি পড়েছিলেন! সেই থেকেই নাকি তাঁর ইচ্ছে ছিল একটু আরামে যদি এই মহিলাকে তীর্থভ্রমণ করানো যেত? আহা, কত কষ্ট করেছি সেবার? কিন্তু এই আরামই বোধ হয় আমার কাল হলো। কচ্ছন্দান ছাড়া কি তীর্থভ্রমণ হয়? তীর্থগমন দুঃখভ্রমণ হওয়া চাই—তা নইলে তীর্থপতির টনক নড়বে কেন? মনটা যেন ভরে না। কিন্তু আমার বেলায় তীর্থপতি নিজেই যদি সেধে সেধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত উপায়ে আকস্মিক ভাবে বিলাসভ্রমণের ব্যবস্থা করে দেন, তবে আমি কী করি? তারপর থেকে কাণ্ড-কারখানা সবই যা হতে লাগলো তা বলবার নয়। লেডী গুপী গাইন হয়ে উঠলুম বলতে গেলে।

হাতে একগুচ্ছ চিঠি। কতকগুলিতে আমাকে ইনট্রোডিউস করা হচ্ছে—ইনি প্রসিদ্ধ লেখিকা, বাংলা সাহিত্যের গজমোতিবিশেষ, আমাদের হাউসের গভীর শুভার্থী প্রবল বন্ধু এবং আমাদের সম্মানিত অতিথি, আপনার যথাসাধ্য সহায়তা এঁর প্রতি দিলে আমাদের হাউস কৃতার্থ হবে।

আর কতকগুলিতে বলা হচ্ছে—ইনি প্রসিদ্ধ লেখিকা এবং অমুক মন্ত্রী ভাইঝি (?), এঁর জন্ত অতি অবিশিষ্ট ঘরটর দেবেন। কেন রে বাবা আমি অমুক মন্ত্রীর ভাইঝি হব? অল্পবল চিনি এই পর্যন্ত। বুঝলাম এসব জায়গায় তো কোম্পানির নামের জোর খাটে না। তাই মন্ত্রীর নাম ধরে টানাটানি করে কোম্পানির হাত শক্ত করছেন আমাদের বন্ধু মশাই। সত্যিমধ্যে চিঠিপত্রের দৈব-

দুর্দৈব অশুভশ্রেয়স্ফুজিত হয়ে তো আমরা জয় বাবা কেদারনাথ জয় বাবা বজ্রীনাথ  
জয় যমুনামাঙ্গিকি জয় গঙ্গামাঙ্গিকি বলে বলে ছুঁশ করে দিলি থেকে বশনা হয়ে  
ভেসে গেলুম।

যেন স্বপ্নের মধ্যে।

৮

### স্বাক্ষর

তবু লোকে বলবে ঈশ্বর নেই? নেই তো আমি এই এয়ারকন্ডিশনড ভাবল  
স্বাইটে শুয়ে শুয়ে কাঁচের দেয়ালের বাইরে ঝাউবন আর হিমালয় দেখতে দেখতে  
আকাশপাতাল ভাবছি কী করে? পাশের স্বাইটে রজন। আমার পাশে  
পিকোলো ঘুমিয়ে পড়েছে। ঝাউবনে অন্ধকার নেমেছে। আসতে আসতে অন্ধুত  
একটা চাঁদ দেখতে পেলুম হরিদ্বারের আকাশে। চাঁদটা ভাঙাচোরা, মলিন, এবং  
বেশ দীনদুঃখী। তার মাথার ঠিক ওপরে প্রকাণ্ড জলজলে একটা দান্তিক তারা।  
হাতি কাদায় পড়েছে আর ব্যাঙে পদাঘাত করছে—ঠিক যেন তার নৈসর্গিক ছবি।  
সারটা আকাশ ঘোর অন্ধকার। একটুও অন্ধকার কমাতে পারছে না ঐ আকা-  
বাক একটুকরো চাঁদ। আর কোনো তারাও নেই। এটা কি লুক্কর? ভগ্নস্তর?  
বোধ হয় তাই। বড় ভয়ানক দেখাচ্ছিল ওকে আজ।

পথে হরিদ্বার দেখতে দেখতে এলুম। খুব ভালো লাগছিলো। এদিকের  
প্রাচীন তীর্থনগরী, পিকোলো এলাহাবাদ, গয়া, কাশী কিছুই ঝাথেনি। রজনও  
না। (রজন কে? আমার একটি ছোট ভাই। দীপঙ্কর, রজন, শিবু—এরা সব  
আমার পরিবারের অন্তর্গত। এদের চিনে রাখুন।) পুরোনো তীর্থস্থানের এই  
যে একটা আলাদা চরিত্র আছে উত্তরপ্রদেশে এটা আমাকে বড় মুগ্ধ করে।

পথে একটা জলুস বেরিয়েছিল। বিয়ের মিছিল। ঘোড়ার ওপরে বছর ধোলো-  
সতেরোর বর। দাড়িগোঁফ গজায়নি। রাস্তায় বাড়ির মেয়েরা নাচছেন। বয়স  
কোনো ব্যাপার নয়। এঁরা গৃহস্থ পরিবার। আগে আগে মাইকে গান গাইতে  
গাইতে একজন হেঁটে যাচ্ছেন। তিন-চাকার সাইকেলগাড়িতে চড়ে সঙ্গে যাচ্ছেন  
আমপ্লিকায়ার। আমি ড্রাইভারকে “দাঁড়ান! দাঁড়ান!” বলে গাড়ি থামালুম।  
দেখতে হবে। ওই ভাঙা চাঁদের নিচে, পিচের পথে, ওই নিঃশব্দ গঙ্গার পাশে,  
স্নান হলুদ বাতি-জলা, ধূপধূনোর গন্ধওলা কয়েকশো বছরের প্রাচীন গলির মুখে  
দাঁড়িয়ে ওই উচ্ছল নৃত্যগীত যে কতটা অভুত লাগলো, কি বলব? গানটা বোধ হয়  
হিন্দি ফিল্মের। গানের বোল হচ্ছে :—“কর্চোড়ি খায়েগী ছোরী—। ও পাতা



চাটেগা ছোরা।” সামনে দাঁড়ালো এই মুহূর্তে দুটি ভিন্ন-ভারতবর্ষ, তার বিভিন্ন সংস্কৃতি, ধর্মীয় অতীত আর ফিল্ম বর্তমান নিয়ে। আর মাথার ওপরে সাক্ষী রইল চিরন্তন সময়—চাঁদে বিকীর্ণ, গঙ্গায় বহমান।

গতিরুদ্ধ হয়ে ড্রাইভার অবাক, একটু মজা পেল, আর একটু বিরক্তি। সবিনয়ে জানতে চাইল, এবার রঙনা হই? পথে একটুখানি বনাকুল পার হতে হয়। সেখানে হঠাৎই গাড়ির সামনে বেরিয়ে এল একটি শিশু—বন থেকে। বুনো শেয়ালের মতো। একেবারেই গাড়ির নিচে। চাপা দিতে দিতে অনেক কষ্টে গাড়ি সামাল দিয়ে দিল ড্রাইভার। “শালাঃ—মার্ব ডালাথা মুঝ্‌কো” বলে কপালের ঘাম মুছলো জগৎ সিং। হঠাৎ হেডলাইটের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলুম শিশুটির হুঁচোখই সাদা, মণিহীন।

“আন্ধা! বিচারাঃ! ওক্! ভগবাননে বচা লিয়া উম্‌কো!” মুহূর্তেই জগৎ সিং কর্ণস্বরে একেবারে অন্ধ মানুষ। অভিভাবকহীন শিশুটি বোধ হয় পাগল। নিজের মনেই চলতে লাগলো। নিজের বনের পথে। একা!

## ৯

### হয়তো ভোরের কাক হয়ে

অবাক সেই সূর্যোদয়। সেই আকাশ, সেই পাহাড়, সেই গঙ্গা। কিন্তু এবার কানে নেই শব্দঘণ্টার বাজনা, নেই দেবমূর্তিদের স্নান করাতে করাতে দক্ষিণী পুরোহিতের সম্মেহ মন্তোচ্চারণের স্রব। তার বদলে পেলাম—কী? বশংবদ এয়ারকন্ডিশনারের কলগুঞ্জন। সামনে কাঁচের বাইরে থোলা ময়ত্রচর্চিত কদমছাঁট মাঠ, যার নাম লন, তার ওপারে সৈন্তের মতো সারিবীধা ডিসিপ্লিন্ড ইউ-ক্যালিপটাস। ওপাশে উচ্চ খাদের মধ্যে গঙ্গা। তার ওপারে জঙ্গল পাহাড় ঝাউবন।

ভোর পাঁচটায় যখন সূর্যের জগ্গে উঠেছিলুম, আকাশ ফর্সা হচ্ছিল, সূর্য ছিল না, দোরের সামনে গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তলাল পপিফুল ফুটেছিল। এখন সূর্যের আলোতে দূরের পপিগুলি গোলাপ হয়ে গেছে, আর কাছের পপিরা হয়েছে পিটুনিয়া। কুয়াশায় যারা দুর্লভ পপি ছিল, রোদ্দুর তাদের সস্তা আটপোরে করে দিয়েছে। আটটা বাজে। একটা কাকপক্ষী ওঠেনি। কেবল একটি কোকিল আপ্রাণ ডেকে যাচ্ছে। রাত্রেও সে বহু ভাকাভাকি করেছে। কি অলস রে বাবা এখানকার পাখিরা! আমার মেয়ে দুটির মতো স্বভাব দেখছি। বেলা ৯টা না বাজলে উঠবে না।

৮১ সালে এখানে এসে একটা ভোরবেলাতে বিনিমা বোর্দি আর আমি মূনি কী রেতী ঘাটে গিয়েছি চা খেতে। তখন সন্ধ্যা ভোর হচ্ছে গীতা ভবনের পিছনের পাহাড়ী আকাশে। চায়ের দোকানে তখনও কাঠের জ্বালের ধোঁয়া উঠছে। মূনি কী রেতীর বাধানো উঠোনটা বাঁট দিচ্ছে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে একজন দেহাতী বৃদ্ধ। আমাদের দেখে কোকলা হেসে ভারী সুন্দর “নমস্কে” বলল। সবারই মেজাজ ভোরবেলায় ভালো। আমার মনটাও খুব খুশি-খুশি লাগলো। হঠাৎ একটি কাক। কাকটা এসে লাফিয়ে নেচে বেড়াতে লাগলো আমাদের সামনে, আর ভাইনে বায়ে ঘাড় বেকিয়ে বেকিয়ে আমাদের ঘোরতর পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। আমি খুশি হয়ে বলে ফেললুম, “হ্যালো, কাক! গুড মরনিং!” কাক কী বুঝলো সে-ই জানে, সুন্দর করে ঘাড়টি বেকিয়ে গুরুগম্ভীর জবাব দিল, “কা—!”

ঐ ঝাড়ুর ধুলোয়, কাঠের ধোঁয়ায়, আধোভোরে কুয়াশামাখা নৌকা-বাঁধা ঘুম-ঘুম নদীর তীরে হিমালয়ের ছায়ায় ভোরের প্রথম কাকটিকে দেখে বৃদ্ধ ছাৎ করে উঠেছিল, মনে পড়েছিল হঠাৎই, ‘হয়তো ভোরের কাক হয়ে—’

আজ, এই এয়ারকন্ডিশান্ড গেস্ট-হাউসে শুয়ে সেকথা মনে এল। খুব ইচ্ছে হল মূনি কী রেতীতে আরেকবার যেতে। এমন সময়ে দোরে টোকা পড়ল।— “চায়।” চা দিয়ে বেয়ারা জানালো—“গাড়ি তৈয়ার। বাহার যানা হ্যায় তো—” আরে হামতি তৈয়ার। এম্মুনি মূনি কী রেতী যাবো। চল চল—ওঠ ওঠ।

তারপর মূনি কী রেতী।

কিন্তু এত বেলা হয়ে গেছে!

এখন কি আর তার সঙ্গে দেখা হবে? গেলুম। চা খেলুম। সিঙাড়া জিলিপি পর্যন্ত ভাজা হয়ে গেছে। কাকের সঙ্গে আজ দেখা হোলো না।

১০

### হিমালয়

—“তুমি পর্বত ভালোবাসো, না সমুদ্র?” বেড়াতে বেরুতে হলেই সাহেবদের এই এক ছকবাঁধা প্রশ্ন। কেন যে এই প্রশ্নটা ওঠে, আমি বুঝি না। এই হয় এটা নয় ওটা—এমনি দ্বিধারায় ভাবনা করাই আমার পোষায় না, এই ভাবধারাটা পুরো ধার-করা, সায়েবীমান। আমাদের তো আইদার-অর বলে কোনো ব্যাপারই নেই। হয় এটা, নয় ওটা, নইলে সেটা, নইলে আরেকটা,—সব সময়ে একসঙ্গে একশোটা চয়েস দিতে পারি। সে যে প্রশ্নই করো না কেন। জগৎ কী? জীবন

কী ? মৃত্যু কী ? ঈশ্বর কী ? আনন্দ কী ? এটা না ওটা না সেটাও নয় করে কতে এগুতে এগুতে সেই কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারি ! হয় সমুদ্র, নয় পাহাড় ? কেন ? এটা কি ইংল্যান্ডের মতন একমুঠো দেশ ? আমাদের আরো তে কতো কিছু রয়েছে দেখতে যাবার । জলজঙ্গল, বনপাহাড়ী, শালপিয়াল, বাঘ-ভালুক, ঠাকুর-দেবতার ঠাঁই, রাজারাজড়ার প্রাসাদ-কেল্লা-স্মৃতি-সমাধি—কী নেই ? সমুদ্রেও যেতে হবে না, পর্বতেও নয় ।

বরং মক্কাভূমিতে যেতে পারো । সেখানেও কি দেখবার জিনিস কম আমাদের ? তীর্থও পাবে, প্রাসাদও পাবে ; কেল্লাও পাবে, জীবজন্তুও পাবে । ধর্ম করো, কি শিল্প করো—ইতিহাস করো কি বিজ্ঞান করো । যা প্রাণ চায় তাই করো । আসমুদ্র-হিমাচল মানে তো সমুদ্র আর হিমাচল নয় !

সমুদ্রতীরে যাওয়া মানে যেমন সমুদ্রযাত্রা নয়, তেমনি হিল-স্টেশনে যাওয়া মানে হিমালয় যাত্রা নয় । পাহাড়ে বেড়াতে যাবে বললে লোকে তো ত্রিযুগীনারায়ণ কি নীলকণ্ঠের কথা ভাবে না । বাঁচ-রিসর্টসে যেমন গভীর গভীর নিশ্চল মধ্য সমুদ্র নেই, হিল-স্টেশনে তেমনি হিমালয় থাকেন না । হিমালয় একেবারে অগ্নি ব্যাপার । পাহাড়, না সমুদ্র—এই প্রশ্নোত্তরের আওতার বাইরে হিমালয় নামে অগ্নি এক ভূ-ভূবংশ দেশ আছে । অগ্নি এক লোক । যার ছবি ভূগোলের খাতায় বাদামী রঙে কিরিকিরি করে আঁকা যায় না । তার তো মানচিত্র হয় না, তার তো হয় শস্যান-চিত্র । এভারেস্টের চূড়ায় গিয়ে উঠলেও, হায়রে, এভমাও হিলারীদের সঙ্গে সেই হিমালয়ের এজন্মে দেখাই হয় না । হবে কি করে ? হিমালয়কে তো দেখা যায় না, হিমালয় দেখা দেন । এ তো তোমার আলস পাহাড় নয়, টিকিট কেটে যে কেউ যাবে সে-ই দেখে ফেলবে ।

হিমালয়ের ভেতরে যে রয়েছে আরেকটা কাণ্ডকারখানা—যার জন্তে তাকে ‘দেবতাত্মা’ বলে ডাকা যায়, ‘ভারতাত্মা’ বলে ডাকা যায় । আলস পাহাড় তো ইউরোপের আত্মা নয় ? মানচিত্রে অবস্থিত শৈলশ্রেণী মাত্র । হাজার হাজার বছর ধরে পুরাণে, ধর্মগ্রন্থে, রসসাহিত্যে গড়ে ওঠা হিমালয়ের সঙ্গে পাল্লা দেবে কোন্ আলস ?

এই হিমালয়েই এবার আমার যাত্রা । হিমালয়ে যেতে অগ্নি ভ্রাইভার লাগবে । অগ্নি গাড়ি । ধবধবে সাদা অ্যাম্বাশাড়র এসে দাঁড়ালো—তার জানলায় জানলায় নীলরঙের পর্দা । ঝকঝকে উর্দি পরা জুজুন সিং নেমে এসে নমস্কার করে বলল—“নমস্কে বিবিজী । গাড়ি তৈয়ার । লাঞ্চ-বন্ধ বি ডাল্ লিয়া । আর কখন তাকিয়া-উবারা উঠা লে ?”

গেস্ট-হাউস থেকেই প্রত্যেককে কম্বল, চাদর, বালিশ দিয়ে দিলেন, সঙ্গে লাঞ্চ, ডিনার, স্ন্যাক্স, আর জরুরী ওষুধপত্রের একটা থাম। আর হাতে আবার এক-তাড়া চিঠি। কালীকম্বলীওয়ারার ধর্মশালাতে, আর গাড়োয়ালমণ্ডল বিকাশ নিগমের ট্যুরিস্ট লজে ঠাই দেবার অনুরোধ-পত্র।

স্বরথ সিং এই গাড়োয়ালেরই মাল্লব। অনেকবারই গাড়ি নিয়ে কেদারবড়ী গেছে। যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী যায়নি। তাই তার নিজেরও খুব উৎসাহ যেতে। ভোর ৬ টায় হোলো না, ৭টায় বেরিয়ে পড়লুম। দেহরাডুন মসৌরির পথে।

১১

### সহস্রধারা

গতকালও আমরা দেহরাডুনে গিয়েছিলুম জগৎ সিং আর রামপ্রসাদ শর্মার সঙ্গে, সে-পথই ছিল আলাদা। একের পর এক হুড়িঢালা শুকনো নিজলা চণ্ডা পাহাড়ী নদীর সোঁতা পেরিয়ে, নানান বনজঙ্গল দিয়ে পাহাড়ী পথে ঘুরে ঘুরে। পথে একটা বেড়াল চোখে পড়তেই জগৎ সিং থুথু ফেলে কান মুলল। বড়ই অলক্ষণ যাত্রাপথে বেড়াল দেখা। এক এক অঞ্চলের ড্রাইভারদের এক-একটা আলাদা ধরনের কুসংস্কারের ঐতিহ্য থাকে। জগৎ সিং সোমাল সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট। কিন্তু সংস্কারমুক্ত নয়। এই নিয়ে শর্মাজী ওকে খ্যাপাচ্ছিলেন সর্বক্ষণ। আমাদের গন্তব্য ছিল সহস্রধারা বার্নী।

দিল্লিতে সুনীলদা বৌদি বার বার বলে দিয়েছেন—“দেখে যেও”। ছেলেবেলায় মা-বাবার সঙ্গেও এসেছিলুম, কিন্তু ভালো মনে নেই। বিয়ের পরেও স্বামীর সঙ্গে মসৌরী এসেছিলুম, তখন কেম্প্টি ফলসে গেছি, সহস্রধারায় যাইনি। শর্মাজী সঙ্গে এসেছেন পথ দেখাতে। তিনিই জমিয়ে রেখেছেন সারাটা রাস্তা হৈ-চৈ করে। পথটখ তিনি চেনেন না। প্রথমেই আমরা পথ ভুল করে অনেক দূরে রায়পুর বলে একটা একলা-ক্যাংলা ছোট পাহাড়ী গ্রামে চলে গেলুম। কী সুন্দর লুকোনো মতন সেই মুসলমানী গ্রামটি। বোরখা পরা মেয়েরা আর ছোট ছোট মসজিদের পরিচয়ে তার চরিত্র চেনা যাচ্ছে। কী চমৎকার সব কুকুর এখানে! প্রত্যেককে আমাদের কলকাতার বাড়ির তাওয়াংয়ের মতন দেখতে। তাওয়াং তিব্বত বর্ডার থেকে আমার কুড়িয়ে পাওয়া কুকুর। রায়পুরে চমৎকার নীল একটা শীর্ণ জলশ্রোত আছে। নালাই বলবো, সেটাকেই শর্মাজী সহস্রধারার একটি ধারা বলে চালাতে চেষ্টা করলেন কিছুক্ষণ, তারপর ফিরে যেতে স্বীকৃত হলেন। সহস্র-ধারায় পৌঁছে সবাই খুব খুশি। বার্নায় স্নান করবে বলে পিকোলো আর রঞ্জন

তোয়ালে এনেছিল, কিন্তু স্নানের উৎসাহ রইল না এমন নোংরা আশপাশ।  
 অক্রণ্ড নেই। জগৎ সিং কিন্তু নেমে পড়লো রক্তনেরই তোয়ালেটা নিয়ে।  
 আনন্ডারওয়্যার পরে দিবা নেয়েধুয়ে উঠলো। পুণ্য হয়ে গেল একটু এই ফাঁকে।  
 সহস্রধারার নামে একটা পৌরাণিক কাহিনী আছে, যার বলে সে পুণ্য দিতে পারে।  
 রক্তন যত মুগ্ধ হয় আমি তত বলি, ওরে, এ তো কিছুই নয়। এরকম লক্ষ লক্ষ  
 দেখবি। এ বছর দেহরাত্নন অঞ্চলে খরা—মাটি শুকিয়ে ধু-ধু করছে। সহস্র-  
 ধারার ঘোবনেও খরা লেগেছে। জল কোথাওই বেশি নেই।

পথের ধারে পাহাড় খুঁড়ে চারদিকে স্লেট রং-এর পাথরকুচি সাজিয়ে রেখেছে—  
 যেদিকে চাইবে চলেছে পাহাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে পাথরকুচি চালান দেওয়া। সর্বত্র  
 লরি। সোডিয়াম সালফেট, না ক্যালসিয়াম কার্বনেট—কী সব যেন বলতে  
 লাগলেন শর্মাজী। মোট কথা, এই সব প্রস্তরখণ্ড থেকে সংগৃহীত হবে কতিপয়  
 কেমিক্যালস। শর্মাজী দারুণ লোক। জগৎ সিং যখনই একটু আন-  
 কোঅপারেটিভ হয়, তখনি তাকে গুরু মহারাজ, মহাপ্রভু, প্রভুজী, মেয়ে পুরুষোত্তম  
 ইত্যাদি সম্বোধনে জল করে ফেলেছেন। এই শর্মাজী অদ্ভুত মানুষ। বিয়ে-থা  
 করেন নি। মাকে নিয়ে একাই থাকেন। হৃষীকেশ বাজারে নিজের পৈতৃক বাড়ি  
 ও মিষ্টির দোকান আছে। এমন প্রাণবন্ত, ফুটিবাজ, হাসিখুশি মানুষটিকে সঙ্গে  
 পেলো আমাদের যাত্রা সত্যি জমতো ঢের ভালো। আজ সুরথ সিং ওপাথে না গিয়ে  
 শহর দিয়ে-দিয়েই চলে এল দেহরাত্নন। সেখান থেকে পাহাড়ে চড়া শুরু হল—  
 মূর্দোরির পথ। আর শুরু হল পথে পিকোলোর গা গুলিয়ে ওঠা। পথে টোল গেটে  
 খামতে হল। তখন রক্তনকে পাঠালুম লেবু কিনতে। একটা পানের দোকান থেকে  
 বারো আনা দিয়ে একটি লেবু নিয়ে এল। আর একটি অরেঞ্জ ড্রিংক। ইত্যাকার  
 প্রচেষ্টায় পিকো তো একটু স্বস্তি পেল। আট টাকা শুরু দিয়ে গাড়ি চলল।

১২

### ফুলবালা

পথে ফের সমস্তা। নাকে প্রাবল পেট্রলের গন্ধ। এটা আবার কোথা থেকে ?  
 এর জন্তেই তো গা সবারই গুলিয়ে উঠতে পারে। গাড়ি থামানো দরকার।  
 সুরথ সিং বললে, বিশ লিটার রিজার্ভ পেট্রল একটা বোতলে আছে। তার মুখ  
 থেকেই উপচে পড়ছে। সেটা কমাতে হবে। কিছুটা ঢেলে নেওয়া হলো  
 গাড়িতে—যাতে উথলে ওঠার সম্ভাবনা কমে। আবার যাত্রা। পিকোর জন্তে  
 টাকা পাতার স্বাস সংগ্রহ করতে গিয়ে পাহাড়ের গায়ে সুন্দর সুরভিত একটি

উদ্ভিদ আবিষ্কার করলুম। পাতাগুলি চন্দ্রমল্লিকার পাতার মতোই দেখতে। কিন্তু ফুল নেই। এই সময় সুরথ সিং একরকম কচি কচি ফল তুলে এনে পিকোকে খেতে দিল। কমলা রঙের ছোট্ট মালবেরির মতো দেখতে। টকমিষ্টি খেতেও। খুব কাঁচাওলা ঝোপে ফলেছে। খেয়ে ভালো লাগাতে আবার গাড়ি থামানো হলো। এবার রঞ্জনকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ফল তুলতে, হাতে সাজির বদলে একটি সেলোফেনের ঠোঙা দিয়ে। কাঁচা হেরি ক্যান্স না হয়ে অতি মস্তপুর্ণে বহু সময় নিয়ে, মন দিয়ে রঞ্জন ফল তুলতেই লাগলো।

গাড়ির দূরত্ব থেকে ওকে ফলচয়নে রত আশ্রমবালাবর মতো দেখাচ্ছে। বুনো মালবেরি ফল খেতে খেতে মূর্সোরী। সেখানে আরেক রকম ফল বিক্রি হচ্ছে—খুবানী। স্পষ্ট দেখলুম কাঁচা এপ্রিকট। মূর্সোরি শহরের ভিতরে গাড়ি ঢুকতে দিত না আগে। গতবার যখন অমর্ত্যর সঙ্গে বাচ্চাদের নিয়ে এসেছিলাম দিল্লী থেকে গাড়িতে, সেবারে গাড়ি শহরের বাইরের পার্কিংয়ে রাখতে হয়েছিল বলেই স্মরণ হচ্ছে যেন। গাড়ি যেখানে থামলো সেখানে একটা নল থেকে পানি-কা-পানি ঝরছিল—এত শীতল, এত মিঠা পানি খুব কমই খেয়েছি জীবনে। কুলিরা বোঝা নামিয়ে মুখহাত ধুচ্ছে সেই জলে। আমরাও ধুলুম। পিকো অনেকটা তাজা হোলো। পাশ দিয়ে একটা খচ্চরে-টানা বাস-গাড়ি ভর্তি কিছু ছেলেমেয়ে গেল, পাহাড়ী মাহুযজ্ঞন, একঝলক বিদেশী চার্লি-পারফিউমের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। এ অঞ্চলেও বেশ আগলিঙের ব্যাপার-স্বাপার আছে তাহলে ?

## ১৩

### গাড়ি হটাও !

মূর্সোরি থেকে খানিক দূরে কেম্পটি ফল্‌স্‌। চমৎকার বর্না। অনেক দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে সেখানে গাড়ি ও বাসের সারি। বাস থেকে টিফিন ক্যারিয়ার, শতরঞ্জি, কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে গৃহস্থরা নামছেন। যতই রূপ থাক, নেহাৎ উটকো বিলিতি বর্না এই কেম্পটি ফল্‌স্‌। নামের মতনই সে বেচারার কোনো পৌরানিক ঐতিহ্য নেই। তাই তার জলে পুণ্যস্থান হয় না। সে শুধুমাত্রই ছুটির দিনে পিকনিক স্পট। সহস্রধারার মতো মাহুযকে পুণ্য দেবার রাইট তার নেই।

কেম্পটির ধারের রাস্তাও মেরামত হচ্ছে। প্রচুর পাথর ঢালছে। একটা পাথর-ভর্তি টেম্পো গাড়ি রাস্তা বন্ধ করে খাড়া।

“গাড়ি হটাও !”

“কোন হটাগা ? ড্রাইবর নেই। থানা খানে গয়া।”

“বাঃ!” সুরথ সিং ভুরু কুঁচকে বসে রইল। তার ভাবনা হচ্ছে। সময় হিসেব করা দৌড় তো? এখানে অকারণে আটকে থাকলে সময়মতো আশ্রয়স্থলে পৌঁছোবো না। আজই আমাদের হুমানচটিতে পৌঁছানোর কথা, যমুনোত্তীর পথে। সেখানে থাকার জায়গাও নাকি বেশি নেই। ট্যুরিস্ট বাসগুলো ভোর ছুটায় ছেড়েছে হুসীকেশ, তারা যায় অল্প একটা পথে, ওরা আগে পৌঁছোলে সব বাসস্থান ভরে যাবে। আমাদের এই শিক্ষাটা দিয়ে দিয়েছেন পি. আর ও. গুপ্তাজী। হাতে সরকারী বাসযাত্রীদের ইটিনেরারীর একটি সিডিউল গুঁজে দিয়েছেন, সঙ্গে আমাদের নিজেদের ভ্রমণেরও একটি সূচী তৈরি করে টাইপ করে তার দুটি কপি দিয়েছেন। সেই হিসেব মাসিক পৌঁছুতে চেষ্টা করতে হবে তো!

এমনিতেই পথে ফল তুলে, পাতা তুলে, ঝাঁর জলে মুখ ধুয়ে থামতে থামতে চলেছি। তার ওপর টেম্পোগুলার লাঞ্চ ওভার হওয়ার জন্তোও অপেক্ষা করতে হলে তো গেছি! সুরথ সিং স্বভাব-ভদ্র মানুষটি। একজন খেতে বসেছে, তা সে যতই তোমার অসুবিধে করুক আর যতই তোমার অচেনা হোক, তাকে তাড়া দেবার কথা ওর মাথায় আসবে না। কিন্তু আমার মাথায় আসবে। আমি স্বভাব-অসভ্য। আমি লাকিয়ে নেমে পড়ে দূরে দেখা-যাওয়া কুলিদের ঝুপড়ির দিকে রওনা হই। ধোঁয়া উঠছে। হয়তো রান্না হচ্ছে। কিন্তু এখনও তো লাঞ্চ টাইম হয়নি। এখনই ভাত খাবে কি? চা খাচ্ছে নিশ্চয়। ঝুপড়িতে গিয়ে চৈচামেচি করতে একটি ছেলে ধীরেস্থে বেরিয়ে এল এবং ধীরেস্থে টেম্পো সরাতে চলল। প্রথমে অবশ্য সে সমস্ত পাথর পথে চলে গাড়ি খালি করে নিল। তার জন্ত সময় লাগলো যৎসামান্য। এটা সে কেন যে আগেই করেনি! না করে হাই-ওয়েটা বন্ধ করে গাড়ি রেখে চা খেতে গিয়েছিল কেন, এর উত্তর মেলা শক্ত।

১৪

### পানিচাক্কী

পথে থিদে-থিদে পাচ্ছে। সঙ্গে নাকি চীজ-স্ট্রাওউইচ আছে, পুরী-আলু আছে। আলুর দমের জ্বন্ধে প্রাণ পাগল। চীজ-স্ট্রাওউইচ খাবার চেষ্টা আগেই করেছি। মাখনরুটি আছে, চীজটা ছিল না। পুরী-আলুটা খেতে হবে এবার। সুরথ সিং বললে, “আমি তো নৈনিবাগে ভাত খাব। আমি আবার দুপুরে ভাত না খেলে পারি না। রাত্রে বরং পুরী হবে।” ঘুরতে ঘুরতে গাড়ি অনেক ওপরে উঠেছে। হঠাৎ দেখি বহু বহু নিচে ছবির মতো উপত্যকা। সেই উপত্যকায় সরু জ্বতোর মত নদী। নদীতে খেলনা-ব্রিজ। নিশ্চয় যমুনা! আমরা যমুনা ব্রিজের



দিকেই যাচ্ছি। সম্ভাব্যস্থল যমুনোত্রী। পথে যমুনা-উপত্যকা তো ধরতেই হবে। এই উচু পথই ঘুরে ঘুরে নেমে যাবে ঐ উপত্যকায় ঐ নদীর ধারে, ঐ ব্রিজের কাছে।  
“ঐ জাথ ঐ জাথ, যমুনা!”

“কই? কই? কোথায়? কোথায়?”

হৈ হৈ করে যমুনা দেখছি। আমার মনে পড়ে গেল কামেং নদীর অবিকল চেহারা, কামেং উপত্যকার বৃক—তাওয়াং যাবার সময় ঠিক এমনিই দেখিয়েছিল।

ঘুরতে ঘুরতে সত্যিই নদীর কাছে এসে পড়লুম। এক জায়গায় খুব তোড়ে দারুণ একটা বর্না ঝরছে পানিচাক্সী থেকে। পথের ওপর দিয়েই বয়ে যাচ্ছে তার জল। পাহাড়ী মানুষজন জল ভরছে, কেউ কেউ স্নান করছে। আমরা গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ি। বর্নার ঠাণ্ডা জলে তোললে ভিজিয়ে নিই পিকোলোর জন্তে। ফ্লাস্টা ভরবার চেষ্টা করতে রঞ্জনকে ডাকি। রঞ্জন এসেই আগেই মুণ্ডুটা বাড়িয়ে দিয়ে জামাকাপড় না ভিজিয়ে মাথা ধোবার আশ্রয় কসরৎ করতে লাগলো। কিন্তু বর্নার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলো না। ইতিমধ্যে পিকোলো নেমে বর্নার অত্র একটি সরু ধারা থেকে দিবা ফ্লাস্টা ভরে নিয়েছে—মুখে চোখে জল দিয়ে খানিকটা তাজা হয়েছে। আমি চটি খুলে ছপ্ ছপ্ করে পথে যে জলটা বয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে হেঁটে বেড়াই। পা ভেজাই। খানিক পাশেই নদী। চাঙ্গা হবার ফলে পিকোলোর ঝাঁক হল নদীতে নামবে। রঞ্জনের তাতে পুরো সায়, কিন্তু পাহাড়ের মায়াবী দূরত্বের কথা ওরা ভুলে গেছে। নদীকে মনে হচ্ছে বৃষ্টি পাশেই। নামতে গেলেই টের পাবে বাছাধনেরা, টের টের দূরে। যাওয়া সহজ হলে পাহাড়ীরা ওখান থেকেই জল আনছে না কেন? ওখানেই চান করছে না কেন? অতিকষ্টে ঠেকানো গেল পিকোর নদী অভিযান। ফের যাত্রা। এবার থামলুম নৈনিবাগে। গরম গরম ভাত। চমৎকার ছোট্ট একটা রেস্টোরঁ। জানলার পাশ ঘেঁষে আমরা যে টেবিলে বসলুম, তার নিচে সরেগে বয়ে যাচ্ছেন খরশ্রোতা বর্নার মতো নীল যমুনা, ফেনায় ফেনায় দুধ-সাদা হয়ে। খাওয়াটা জমলো দারুণ। ধবধবে ভাত, ডালফ্রাই, দই, আমি একটি সজী, ওরা তিনজনে ওমলেট।

উত্তরাখণ্ড অঞ্চল এমনিতে নিরামিষ। হরিদ্বারের পর থেকেই মাছ মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল এতকাল। চিরদিন শুনে এসেছি জুবীকেশে মাছ মাংস ডিম চোকে না। কার্ভত দেখলুম বাজারে না থাকলেও ডিম আছে প্রায় সব দোকানেই। এখানে গাড়োয়ালের নামহীন পাহাড়ী গ্রামে মাংসের চলটাও আছে। মাছ খায় না কেউ। (মাছখোর বাঙালী তো নয় এরা!) তবে ছোট ছোট খাবার দোকানে মাংস থাকে না। চমৎকার পরিচ্ছন্ন বকবকে নতুনের মতো স্টীলের বাসনপটে

ব'ব' ছিল। কলকাতা কেন, পশ্চিমবঙ্গেই কোনো এরকম ছোট্ট দোকানে এ ধরনের  
পরিচ্ছন্নত অকল্পনীয়। বড় দোকানেই যা দেখি।

১৫

### পর্বতশৃঙ্গের আরোহিণী

একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম বুঝি। পিকো তো প্রথম থেকেই দুটি বালিশ নিয়ে  
জঁকিয়ে তার মা'র কোলে শুয়ে আছে। আর রঞ্জন স্রুথ সিংয়ের পাশে বসে  
মাঝে-মাঝেই ঘাড় কাত করে ঘুমিয়ে পড়ছে। আমিই যা চোখ কান খুলে বসে  
আছি স্রুথ সিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে। বড্ড শুষ্ক, বর্ণহীন অঞ্চল। ঘুম-ঘুম ভাবটা  
কাটতে দেখি ঝাউবনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, ঠাণ্ডা হিম-হিম হাওয়া দিচ্ছে। নিজে  
সোয়েটার পরলুম, মেয়েকে পরালুম, “রঞ্জন ওঠ, ওঠ, সোয়েটার পরে নে।” অসম্ভব  
গরম ছিল সারাটা পথ। লোকে বলে মূর্সোবি-টুর্সোরি ঠাণ্ডা জায়গা—কই ভাই ?  
আমরা তো দেখলুম ফুটিফাটা গরম। অতো গরমেই পিকোর শরীর খারাপ করে-  
ছিল। আমি অবশ্য ওষুধও খাইয়ে দিয়েছি। ঠাণ্ডায় মন ভালো হল। রঞ্জন বলল  
নামবে। নেমে একটু হেঁটেই সে হঠাৎ বনের দিকে গিয়ে বমি করতে শুরু করলো।  
ঘুরনচাকী পথের শিকার নং ২। ইতিমধ্যে পিকোলো কই ? কখন উঠে দরজা খুলে  
নেমে পড়েছে এবং পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। স্রুথ সিং ভাগিয়স দেখেছে  
ঐদিকে গেছে! ওর শরীর এখন নাকি “কিট”। রঞ্জন উঠে এসেছে গাড়িতে,  
পিকোলো ঐদিকে নামেই না। অগত্যা আমিই পাহাড়ে চড়তে থাকি আর হাঁক  
পাড়তে থাকি রাতের চৌকিদারের মতন—“পিকোলো-হো-ও-ও...” হঠাৎ সামনে  
একটা বাকবাকে ছোট্ট লাল-টুকটুক মণির মতন দেখতে ফল। একটা লতানে টোমা-  
টোর ধরনের গাছে ফলে আছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না। স্ট্রবেরি যে!  
হ্যালো, স্ট্রবেরি! এই জীবনে প্রথম বুনো স্ট্রবেরি দেখলুম। স্ট্রবেরি ক্ষেতে  
গিয়ে চাখের কল তুলেছি ঢের যদিও, কিন্তু এটা দেখে প্রবল আহ্লাদ হলো।

“পিকোলো-হো-ও-ও!”

“যাই-ই-ই—” অনেক উঁচু থেকে সরু গলায় সাড়া এলো। দেখি বন-বাদাড়ের  
ভেতর দিয়ে প্রায় চোখ-বন্ধ-অবস্থায় পিকো নেমে আসছে। বেশ খাড়াই পথ।  
পথই নয়—ছাগল-টাগল হয়ত উঠতে পারে। আমি ভগবানের নাম করতে লাগলুম।  
পিকো কাছাকাছি এসে পড়াতেই থপ্ করে পাকড়াও করলুম।

—অত উপরে কী করতে উঠেছিলি? বনবাদাড় দরকার হলে তো ঐদিকেই  
ছিল?

—বনবাদাড় ? বনবাদাড় দিয়ে কী হবে ?

—তাহলে কোথায় যাচ্ছিলি ?

—পর্বত-শৃঙ্গে ।

—প-ব-ব-ত-শৃঙ্গে ? মারব টেনে এক থাবড়া । ইয়ার্কির জায়গা পাওনি ? কাউকে কিছু না বলে তুমি তেনজিং নোরগে হচ্ছ ?

পিকোর ফ্যালফেলে চোখ দেখে হঠাৎ বুঝতে পারি ও পুরো জাগ্রতই নয় । ঐ যে ওকে বমি-নিরোধক ভ্রমণ-বডিটি থাইয়েছি, তাতেই ঘুমের নেশা হয়েছে । নেশার ঘোরে অর্ধজাগ্রত চেতনায় ও পাহাড়ে উঠছিল । যদি পড়ে যেত ? “পর্বত-শৃঙ্গে” ভাষাও তাই । ঘুমের মধ্যে থেকে উঠে আসা শব্দ । বাক্যঃ ! ভগবানের দয়ায় পর্বতশৃঙ্গারোহিণীকে গাড়িতে পুরে বেঁধে নিয়ে চললুম সায়নচটি ।

১৬

### সায়নচটি, হনুমানচটি

এতক্ষণ আমরা সমানে যাচ্ছিলুম ‘বরকোট’-এর পথ ধরে । পথে নগাঁও পার হলাম । সেখানে এক পেয়লা করে চা খাওয়া হলো । বরকোটে না ঢুকে আমরা সায়নচটির পথ ধরে ছুটি । এই প্রথম ‘চটি’ । ছেলেবেলা থেকে এই শব্দটি শুনে আসছি হিমালয়ের প্রসঙ্গে । দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, প্রবোধ সান্যাল—প্রত্যেকেই এই ‘চটি’র উল্লেখ করেছেন । এছাড়া আমি হিমালয়-ভ্রমণ-সাহিত্যে কিছুই পড়িনি । এমন কি উমাপ্রসাদও পড়া হয়নি । তাছাড়া ভক্তি বিশ্বাস, শঙ্কু মহারাজ, বৈতালিক, কতজনের তো কত বই আছে । এটা লিখতে-লিখতেই নারায়ণ সান্যালের “পথের মহাপ্রস্থান” বইটি উপহার পেলুম । আগে পড়ে গেলে উপকার হতো । “কে কী লিখেছেন জানা থাকলে সেগুলো না লিখে পারা যায়”—বললেন নারায়ণবাবু । “নইলে না জেনেই পুনরুচ্চারণের দোষ এসে যেতে পারে ।”

আর পুনরুক্তি করলেই বা কী ? এই বহু পুরাতন হিমালয়ে, এই বহু পুরাতন পথে নতুন আর কী লিখব ? যাই লিখব তাই হবে পুরোনো কথা । সনাতন কাহিনী । ‘সায়নচটি’ নামটিও আমার খুব পছন্দ হল, মুনীর নামে স্থান—আর ‘চটি’ কেমন হয় দেখবার জগে চোখ আবুল হয়ে আছে । উন্মুক্ত উপত্যকাটিতে প্রথমেই চোখে পড়ে খেলার মাঠ । ইন্ডুলই বোধ হয় । নাকি মিলিটারী ব্যারাক ? জানি না । যাই হোক, জনমনিষ্টি নেই । মরুভূমির মতো জনহীন । একধারে চমৎকার বর্না, সেতু পেরিয়ে পথ গেছে হনুমানচটির দিকে । এক কাপ চা পর্যন্ত পাওয়া গেল না । অথচ শুনেছি এখানে অনেক থাকার জায়গা । ট্যুরিস্ট-সজ্জ

হাচ্ছ, কালীকুশলীগুলার ধরমশালা আছে। একবার ভাবলুম এখানেই থামি। যাবার মনে হল, যতটা পারি এগিয়ে থাকি। যমুনোত্রীর যতটুকু কাছে দস্তব। কাল ভোর ছ'টায় না বেকলে সন্ধ্যার মধ্যে নিচে ফিরে আসা যাবে না। এতদূর থেকে গিয়ে ঘোড়া-টোড়ার ব্যবস্থা করে রওনা দিতে-দিতেই ঢের বেলা হয়ে যাবে। এক বৃদ্ধ এসে হাতে একটি কার্ড গুঁজে দিয়ে গেলেন। “আমার ছেলে হুম্মান-চটিতে আছে—সে যমুনোত্রীর পাণ্ডা। পুজো দিতে হলে ওর সাহায্য নিও।” এখানকার পাণ্ডারা তো তাহলে বেশ অন্তরকম? পুরীর মতন নয়। কার্ডে লেখা—“রামেশ্বর। তদাত্মজ ভাগীরথপ্রসাদ, ঘনশ্যাম। জমুনোত্রীকে পাণ্ডা, জমুনোত্রী, উত্তরপ্রদেশ।”

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বার্না পেরিয়ে সুন্দর পথ দিয়ে যখন হুম্মান-চটিতে পৌঁছোলুম পরম চা-ভুক্ষা অবস্থায়, তখন সেখানে হাড়কাঁপানো শীত। অজস্র বাস দাঁড়িয়ে আছে। এখানটি সায়নচটির বিপরীত। উন্মুক্ত নয়, ছোট একটু-খানি ঠাঁই, বাসে বাসে ভরা। এবং গাড়িতে গাড়িতে। এবং খচ্চরে। প্রচুর সারিবন্দী খচ্চর এবং এলোমেলো মালুষের ভিড়। বৃষ্টি, কাদা, নোংরা। এখানে থাকব কোথায়? একদিকে উঁচু পথহীন পাহাড়। অন্যদিকে নৃত্যপর্যায় যমুনার খাদ। মাঝখানে যে একটুখানি চাতাল আছে, তাতে এইসব রকেট-পুণ্যার্থী এবং পকেট-পুণ্যার্থীদের ভিড়ে পাদমেকং জায়গা নেই। একপাশে কতগুলো সেই আবোল-তাবোলের “বুড়ীর বাড়ি”র মতন দেখতে কাঠের নড়বড়ে ঘরবাড়ি, খুবই নোংরা দেখতে, একটির সামনে আবার লেখা “আনন্দভবন”। প্রত্যেকটির সামনে নিচের তলায় চায় জিলাইবা পুরী-পার্কোড়ে কে দুকান থেকে কাঠের ধোঁয়া উঠে বৃষ্টির মধ্যে মিশে যাচ্ছে। খচ্চরের মলমূত্র ও কাদার মিশ্রণে “পুতিগন্ধময়” শব্দটির অর্থ প্রাজ্ঞল হচ্ছে। কে নামবে বাবা এর মধ্যে? আমার অত শখ নেই। থাকবোই বা কোথায় এখানে? হঠাৎ দেখি একটা উঁরুই পথ, খুব খাড়া নিচে নেমে যাচ্ছে, অল্প একটু গিয়েই আরেকটা চাতাল। সেখানে তিন-চারটে গাড়ি এবং একটি ঝকঝকে খেলাঘর প্যাটার্নের কংক্রিটের বাংলা। “স্বরথ সিং, এখানে চলো ভাই!” পড়েছি এমনই ধনবান স্টাইলে বেরিয়ে, এখন অত কষ্ট করে থাকবার কথা মাথাতেই আসবে কেন!

যমুনোত্রী যাবার ঘোড়া-খচ্চর-ডাঙী-কাণ্ডী সব এখানেই মিলবে। এই হল যাত্রারস্তের স্টেশন। অথচ এত নোংরা? এত অযত্ন-লালিত? সরকারের দৃষ্টি কেন এখানে নেই?

## গুরু মহারাজ

গাড়িস্থক নিচের চত্বরে নেমে হুরথ সিং জেনে এলো যে বাড়িটি একটি P. W. D. Inspection Engineer-এর কোয়ার্টার। ওটা বাংলা নয়। ভাড়া দেয় না। তখন মরীয়া হয়ে ভাবলুম, এন্জিনিয়ার বাবুকেই ধরব, একরাত্রি যদি দয়া করে ঠাই দেন! কোথায় তিনি? রঞ্জনকে পাঠালুম খবর নিতে। রঞ্জন এসে বলল, ব্যাপার কিঞ্চিৎ গোলমালে। ভাড়াটাড়া ছ'টার আগে হবে না। ছ'টা অবধি অগ্নি লোক আছে। চাবি তাদের কাছে। ছ'টার পরে দিতেও পারে—না দিতেও পারে। ওটাকে “দিতেই হবে” করতে এবার পাঠানো হলো রঞ্জন আর পিকোলোকে। পিকো এসে বললো, “রঞ্জনমামা ঠিক শর্মাঙ্গীর মতন করে কথা বলতে লাগলো—আরে মহাপ্রভু, ঘর দে দো দোস্ত, তুমি মেয়ে গুরু মহারাজ, নেহি দেগাতো মর জায়গা—চলো, চা খায়গা? চা খাও পুরুষোত্তম, আউর ঘর থোলো। এই করে সত্যি সত্যি চা খেতে খেতে ঘর ঘোগাড় করে ফেলেছে। চল্লিশ টাকা লাগবে। আর ঐ নোংরা-টোংরা বাড়িগুলোই হচ্ছে এখানকার হোটেল। এক-একটা ঘর চল্লিশ থেকে ষাট টাকা, ঘরে খাটও নেই। কাঠের দেয়াল, কাঠের মেঝে, মেঝের খড় পাতা, ইলেকট্রিক নেই, বাথরুম নেই—কিছু নেই মা, ঠিক আস্তাবলের মতন। তাতেই লোক থাকছে।” ওদিক থেকে হুরথ সিং এসে জানালো: “হোটলে ঘর আছে। কিন্তু হোটেল আপনার যুগ্মি নয়। ঘরগুলো বেডরুম নয়, কিচেনের মতো। কালীকদলীওয়ালার ধর্মশালা আছে, সেও মানুষ থাকার যোগ্য নয়। মাটির তৈরি ঘর, মাটির মেঝে; দরজা-জানলা নেই, একটা করে গর্ত—তা দিয়ে ঝড়জল বৃষ্টি-বাতাস সব ঢুকবে, খড় ভিজ়ে যাবে। তাছাড়া খড়ের গাদায় শোবেনই বা কী করে? এবং বাথরুম কোথাও নেই—হোটলেও না, ধর্মশালাতেও না। তবে শেষেরটা স্ত্রী। হোটলে খুব খরচা।”

অতএব “হে মহাপ্রভু”, “আও মোর গুরুজী”, এসব আরো চালাতে হবে রঞ্জনকে যতক্ষণ না ঘর মিলছে। এ ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচড বাথরুম আছে। ঘরে সতরঞ্জি পাতা এবং দোকা ও টেবিল আছে। অর্থাৎ এটি বসবার ঘর। শোবার ঘরটি খুলে দেবে না। সেখানে নাকি খাট পর্যন্ত বর্তমান। কিন্তু তার মালিকও বর্তমান—আপাতত যমুনোত্রীতে।

বৃষ্টি ধরার নাম নেই। ওরই মধ্যে চড়াই পথ ভেঙে নোংরা কাদার মধ্যে সারসের মতো ঠাং ফেলে ফেলে কোনো রকমে সামনের “হোটলে” উপস্থিত হলুম

চা খেতে। দ্যোতলায় উঠে কাঠের রেলিং-ঘেরা বারান্দায় ভাঙা বেতের চেয়ারে বসে পড়লুম। একটি মাত্র চেয়ার। অগুরা দণ্ডায়মান। দুটি ছেলে দেখি ভিতরের ঘরে বাংলা ভাষায় কথা বলছে। অমনি আমি চেপে ধরেছি।—“ও ভাই, কলকাতা থেকে নাকি?” “হ্যাঁ দিদি, বেলেঘাটা—আপনারা?” “গড়িয়াহাট।” ছেলে দুটি আজই এসেছে—গঙ্গোত্রী ঘুরে। খুবই ভালো লেগেছে, তবে একটু ডেনজারাস হয়ে গেছে গোমুখ-ট্রিপটা।

“আপনারা যেন গোমুখে যাবেন না—উপযুক্ত জুতোফুতো চাই, ঠাণ্ডা আর্কটিকার মতন, মাথার ওপরে আজেবাজে অ্যাস্কেলে উটকো পাথর ঝুলে আছে, খসে-খসেও পড়ছে। পায়ের নিচের পাথরও পিছল, অনবরত হড়কে যাচ্ছে—ওরে বাবারে, বড্ড স্ট্রেন হয়েছে। আগে কেদারবন্দী গেছি, লাস্ট ইয়ারে অমরনাথ ঘুরে এসেছি, এত টেনশনে ভুগিনি। এমনি গঙ্গোত্রী মোস্ট বিউটিফুল।”

“গোমুখ বিউটিফুল নয়?”

“হ্যাঁ, সে আরো বিউটিফুল হতে পারে, কিন্তু এনজয় করবার মতো শক্তি থাকে না। লালবাবার আশ্রমটি অবিশ্টি অসামান্য। ওক্, এত যত্ন—এত যত্ন! গেলেই গরম চা হাতে ধরিয়ে দেবেন, রাত্রে হটওয়াটার ব্যাগ পর্যন্ত—কী যে আদর-আপায়ন, তার তুলনা হয় না। শুধু ওটার জগেই যাওয়া যায়। গোমুখের উৎসটা ইন্টারেস্টিং নয়।”

“তবে?”

“জুতোফুতো নিয়ে আসবেন। মে মাসে আসবেন। এইরকম মিড-জুনে নয়। বৃষ্টি নামার আগেই যাবেন।”

গোমুখ আমরা এমনিতেই যাব না। কলকাতা ছাড়বার আগে মা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন—গোমুখে যাবে না। যেখানে হেঁটে যেতে হয়, সব বারণ। অতএব গোবিন্দঘাট থেকে যে ভেবেছিলুম হিমকুণ্ডে যাব, শোণপ্রয়াগ থেকে যে ত্রিগুনা নারায়ণে যাব—সব নিষিদ্ধ। তবু কেন সেধে সেধে এত গোমুখের অস্থবিধের তালিকা বর্ণনা শ্রবণ? রঞ্জনকে শোনানোর জগে। সে খেপেছে গোমুখ যাবে।

আমি যেতে দিতে রাজী নই, তাহলে তিনদিন গঙ্গোত্রীতে থাকতে হবে। তা ছাড়া রঞ্জনের শরীরও দুর্বল, ছেলেমানুষী বৌকের পাল্লায় পড়ে অস্থখ করলে এই হস্ত পণ্ড। বৌদি-রিনিমার মতো শক্ত হয়েছে—“গোমুখ হবে না।” তখন ঘর-ভিত্তি দেখলুম। সত্যি মিরাকুল! ছ’ বাই আট ঘরে ছ’জন-আটজন মানুষ। ইং : এখানে থাকবার মতো অত পুণ্যের জোর আমার নেই।

## খচ্চর-কাঁহাকা

গাড়িতে গিয়ে পুরী-আলুর দম সদ্যবহার করতে গিয়ে দেখি সারাদিনের গরমে আলুর দম পচে গেছে। পুরী শুকিয়ে নেড়ে বিস্কুট। আলু ফেলে দিয়ে ক্লাস্ক দিয়ে রঞ্জনকে পাঠালুম চা আর কলা কিনে আনতে। তাই দিয়ে পুরী ঠেলতে হবে গলায়। খাবারের বাক্সে দেখি গেস্ট-চাউস থেকে গুপ্তাজী তিন প্যাকেট ডালমুট, তিন প্যাকেট বিস্কুট, একটিন ল্যাক্টোজেন, কিছু মোরি আর মিছরি, কিছু চিনি দিয়েছেন। ডালমুট ও বিস্কুট খাওয়া শুরু হয়ে গেল। পুরী পড়ে রইল।

ঘর ছ'টার সময় খালি হল। মালপত্র কিছু গাড়িতেই রইল। গাড়ি উঠোনেই পার্ক করা। স্বরথ সিং গাড়িতেই ঘুমোবে। তার সঙ্গে আছে তার ঘরে-তৈরি নিজের পোষা ভেড়ার লোমের ধবধবে সাদা ছুটি গাড়োয়ালী কখল। ঠাণ্ডা যতই পড়ুক ওই যথেষ্ট, দুটো হাত পুরো পুলোভারও আছে তার। স্বরথ সিং চা খেতে গিয়ে রাত্রে খেয়ে এল। আমাদের খাওয়াটা ঠিক জমলো না। তবু কেউই যেতে চাইলুম না ঐ হোটেলে। বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। রঞ্জন আর তার প্রভুজী চা খেতে গেছে। তিনজন বাঙালিনী মাঝবয়সী মহিলা এলেন। আমি এগিয়ে গিয়ে আলাপ করি। প্রত্যেকের পরনে স্ত্রী তাঁতের শাড়ি। একজনের রঙিন, দুজনের সাদা। এঁরা “রাখী ট্র্যাভেলসে”র সঙ্গে এসেছেন—একজন কলকাতার, বাকি দুজন মফঃস্বলের মানুষ, প্রত্যেকেই যে যার পরিবার থেকে একাই বেরিয়েছেন। দুজন বিধবা না কুমারী বুঝতে পারিনি, কিন্তু একজন সধবা। এঁরা আগে অমরনাথে গেছেন, যমুনোত্রী যেতে গুঁদের ভয় নেই, চার-ধামেই যাবেন। খচ্চরে চড়ে উঠবেন যমুনোত্রী ও কৈদার। বঙ্গীনাথে পুরোটা গাড়ি যাবে। গঙ্গোত্রীতে তিন কিলোমিটার হাঁটতেই হবে। “খচ্চরে চড়ে গেলে কোনো কষ্টই নেই।”

একজন বললেন, “শুধু একটু গায়ে ব্যথা হতে পারে।” আরেকজন বললেন, “অনভ্যাসের দরুন।” “ও-ব্যথা চলে যায়।” তৃতীয়জন বললেন। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি, “খচ্চর থেকে পড়েটড়ে যাবো না তো?”

“হ্যাঁ, তাও যেতে পারেন।” প্রথমজন উত্তর দেন। “আমার খচ্চরটাই তো পড়ে গিয়েছিল আমার ওপরে।”

“আপনার ওপরে? তার মানে?”

“মানে আমিও খচ্চর থেকে পড়ে গেলুম, খচ্চরটাও পা পিছলে পড়বি তো পড়

আমার বুকের ওপরে পড়ে শ্রেফ অজ্ঞান হয়ে গেল। আর তোলা যায় না।”

“কে অজ্ঞান হয়ে গেল?”

“খচ্চর, খচ্চর। ব্যাটা পড়ে আছে অজ্ঞান হয়ে, নড়ছে না। হঠাৎ দেখি পিট পিট করে তাকাচ্ছে। তখন ওকে টেনে-হিঁচড়ে তোলা হলো।”

“আর আপনাকে? আপনার কিছু হোল না?”

“আমার খুব গায়ে ব্যথা হলো। সঙ্গে ডাক্তার ওয়ুধ সবই ছিল—তাই কিছু হয়নি।”

“উঠলেন অমরনাথে তারপরে? ঐ একই খচ্চরে চড়ে?”

“হ্যাঁ, ঐ খচ্চরেই উঠলুম অমরনাথে।”

“ভয় করল না?”

“ভয়ের কী আছে? খুব শিওরকুটেড অ্যানিম্যাল বলেই তো ওদের ব্যবহার করে।”

“আমরাও কত খচ্চর নেব ভাবছি।”

“খরচা কত জানেন?”

“গুনেছি ১১০/১২০ মতন। দর করতে হয়।” এমন সময়ে বাসে ভেঁ।  
ওঁরাও ছুটলেন।

“বাসে করে কোথায় যাচ্ছেন এখন?”

“বাসে নয়, হোটেলে যাব। সবাইকে ডাকছে আর কি জন্তো হতে।”

## ১৯

### ঘরওয়ালা

রঞ্জনের প্রাভুজী বড়ই সুন্দর দেখতে, বছর বাইশ-তেইশের একটি তরুণ। জানা গেল, ঐ হোটেলটি ওরই দাদার এবং ওদের অনেক খচ্চর আছে। ওরাই খচ্চর পাঠাবে সকালে ১১০ করে এক-একটা। রঞ্জন বলল, হেঁটে উঠবে। পিকো হেঁটে উঠতে পারবে না, তার কোমরে হাঁটুতে ব্যাধা, ক্রফেন খেতে খেতে চলেছে দিনে তিনবার করে।

আমরা শোবো কিসে? খাট-বিছানা কিছুই তো নেই। ধরো গুরুজীকে। গুরুজী বললেন, কুছ মুশকিল নহী, আ জায়েগা বিস্তার। তিন রাজাই তিন গদা। আমাদের সঙ্গে আছে গেস্ট-হাউসের তিন কয়ল তিন চাদর ও তিন তাকিয়া। আর আশ থিক্যা আনসি দুইডা কয়ল। এটা স্লিপিং ব্যাগ। এটা আমার জন্তাই ধার করেছিলুম, আর কয়ল দুটো ওদের জন্ত লাস্ট মোমেন্টে নিয়ে



এসেছি। গুরু মহারাজের ভৃত্য গিয়ে পরিকার মার্কিনের ওয়াড় পরানো গদি লেপ এনে দিল, গদি ২ লেপ ১ হিসেবে এবং তিনটে মোটকা মোমবাতি কেনা হলো, মারারাত জেলে রাখা দরকার। এসব অঞ্চলে খুব পোকামাকড় আছে। ওডোমস আনা উচিত ছিল এবং পোকার স্প্রে-ও। আমাদের অবিশিষ্ট মশা বা পোকায় কামড়াচ্ছিল না, কামড়াচ্ছিল শীতে। দুপুরের গা-গুলোনো বমি-পাওয়া গরমটাকে দুঃস্বপ্ন মনে হচ্ছে। বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা বাতাসে মর্মভেদী অবস্থা। যমুনা এখানে খর-স্রোতা বার্না, বেশ ঝকঝকে নির্মল; রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে যে একটু দেখবো, ঠাণ্ডার চোটে তারও উপায় নেই। ঘর থেকে বেরনো যাচ্ছে না। জানলা একটি, তার একটা কাচ ভাঙা। সেখানে একটা ব্যাগ রেখে কিছুটা সামাল দেওয়া গেল। ঘরে ঐসব গদা পেতে ফেলতেই ঘর ভর্তি হয়ে গেল। বালিশ, চাদর, লেপ, কবল দিয়ে চমৎকার লোভনীয় দুটি বিছানা করে ফেললুম। একটি চণ্ডা—তাতে মা ও মেয়ে। তাদের মাথার কাছে একটি সরু—তাতে মামাবাবু। ইংরিজি T অক্ষরের মতন। এভাবে ছাড়া অতটুকু ঘরে জায়গা নেই। সব বিছানা করে শুয়েছি, হঠাৎ রঞ্জন বলল, দিদি, একটু আস্তে করে উঠে পড়ে ডানদিকে সরে এসো তো পিকোকে নিয়ে।

—কেন? এখন পারব না।

—এসো না! আঙে করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাও যদি, মোটাই বেস্ট।

—কেন?

—শ্রীজ, দেরি কোর না। একটা কিছু দেখেছি—বেরিয়ে পড়, বলছি। ওর গলায় কী ছিল, পিকো এবং আমি উঠে গিয়ে সোয়েটার জড়াতে জড়াতে বেরিয়ে পড়ি ছিটকিনি থলে। রঞ্জন একপাটি জুতো হাতে করে ঢোকে। আমি ওর পিছু পিছু ঢুকেই “ঈ ঈ ঈ ঈ ক্ ক্ ক্” করে এক নারকীয় চিৎকার করে ঘর ছেড়ে পালাই পিকোকে টেনে নিয়ে। ঘরের দেওয়ালে মোমের আবছা ভুতুড়ে আলোয় একটা ইয়াব-বড়া রোয়াওয়ালা কালো কুচকুচে মাকড়সা। এখনও সেই দৃশ্য মনে পড়লে হাত-পা এলিয়ে পড়তে চায়। পিকো সাহসী হবে বলে জুতোর পাটি হাতে চোঁকাঠের কাছে দাঁড়ালো, রঞ্জন সেই ছুটন্ত মাকড়সাকে তাড়া করে শেষ পর্যন্ত মারলো। বাকবাং, বাঁচলুম! রঞ্জন না দেখে মধ্যরাত্রে ওটিকে আমিই যদি দেখতুম বা উনিই যদি আমাদের দেখাশুনো করতে আসতেন, তবে কী হত ভাবা যায় না! আরশোলার চেয়েও মাকড়সা বেশি ভয় করে আমার এবং এটাকে ভয় না পাবে, এমন মানুষ কমই আছে। রঞ্জন মোমবাতি এবং টর্চ নিয়ে আঁতিপাতি করে ঘরের কোণা-ঘুপচি সব খুঁজলো—ওর মতোই আর কোনো বাসিন্দা আছে কিনা এ-ঘরে।

ন পের নিশ্চিন্ত হয়ে বড় মোমটি জেলে রেখে ফের লেপের তলায় ঢোকা এবং  
ফের

২০

### নিশি-কুটুম্বিতা / রাতের অভিজি

মহারাষ্ট্রে ঘুম ভাঙলো। প্রচণ্ড হৈ-চৈ হচ্ছে বাইরে। এত কথাবার্তা চোঁচামেচি  
ক'ত করছে? বকুনি দিতে হবে তো! একটু ত্যাগ তো রঞ্জন? রঞ্জন দোর  
খোলামাত্র একদমক ঠাণ্ডা বাতাস হাড়ে হাউ-ডু ইউ-ডু বলে গেল। এবং অল্প  
আলোয় দেখলাম বারান্দা-ভর্তি মানুষ। নারী শিশু বৃদ্ধ। কী ব্যাপার? বান  
ভেকেছে নাকি? না, এঁরা যমুনোত্রীর যাত্রী। নগুগাঁও থেকে এসেছেন। থাকার  
ভয়না নেই, বৃষ্টি থেকে বাঁচতে বারান্দায়। রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, “ওদের ভেতরে  
এসে বসতে বলি, দিদি?”

“নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।” প্রথমে অবিশ্বাসী, অবাক—তারপরে ধগা হয়ে ঘরে ঢুকে  
এল ন'জন নারী, দু'জন পুরুষ। রঞ্জন টেনেহিঁচড়ে সোফাগুলো বারান্দায় বের  
করে দিল কোমের কুশনস্বকু, চোঁকিদারকে ডেকে বলল কুশনগুলো তুলে রাখতে,  
মোকা বের করতে যে একফালি ঠাই হল, সেখানে ঝটপট ভোটকবল বিছিয়ে সারি-  
বন্দী উবু হয়ে বসে পড়ল মেয়েরা। তারপর শুরু হল তাদের গল্প। গল্পের মধ্যে  
প্রধান হয়ে উঠলো একটিই শব্দ, “ভোগ লাগা”। আমাদের খাতের বাস্তু গাড়িতে  
কিন্তু ঠোঙাভর্তি পুরী আর কলা আছে। উঠে পুরীর ঠোঙাটি আর কলা এগিয়ে  
দিলুম, “কুটা নেহি, আপ লোগ লে সকতে হেঁ।” তারা প্রচণ্ড খুশি হয়েই “জয়  
ভমনা মাদিকি” বলে গ্রহণ করলো এই সামান্য বস্তুটি। যা আমরা খাবার যোগ্য  
বলে মনে করিনি। আলুর দম অবিশি দিতে পারলুম না, গুটা পচে গেছে। পুরীটা  
বড় শক্ত বানিয়েছে এবং তরকারী নেই বলে খেতে পারিনি। কিন্তু ওদের খেতে  
ক'ত হলো না, “ভোগ” এমনই বস্তু।

ছোট্ট ঘর। তিনজনের পক্ষেই ছোট—সেখানে যে এখন চোঁদজন। যদি হও  
সুজন—! এতগুলি মানুষ নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে খুব কম জায়গায় কী করে যে বসে  
আছে আমার অবাক লাগছে।

অসত্যের মতো আমরা শুয়ে আছি। “এই বিছানায় এসে শোও” বলবার মতো  
উদারতা আমার নেই। অনেকবার ভেবেও কিছুতেই বলতে পারলুম না। এজগ  
খুব খারাপ লাগছিল নিজেকে। ওদের গায়ে অতি জীর্ণ, ছিন্নভিন্ন কাপড়চোপড়  
মবই স্বতীর, জোড়াতালি দেওয়া, হতদরিদ্র গ্রামা চাষী পরিবার। একজন বৃদ্ধা

৩৩

আছেন, তাঁর ইঁপানির টান আমার চেয়ে বেশিই এই মুহূর্তে। একটি বউ আছে, বুকের মধ্যে কয়েক মাসের শিশু। পুরুষ দুজন—একজনের বয়স হয়েছে, আরেকজন যুবক। বাকীরা নানা বয়সী মেয়ে। এত অল্প জামাকাপড় নিয়ে (কোনো গরম জামা কি গরম চাদর কারুরই নেই) এরা কী করে অত ঠাণ্ডায় যাবে?

“তোমরা কি প্রতি বছরই যাও?”

বুড়ো বললে, আমি যাই। এরা সবাই আমার সঙ্গে যাচ্ছে। অনেকেই অবশ্য অনেকবার গেছে। সবাই নওগাঁও গ্রামের। একসময়ে কথাবার্তা ফুরুল। সবাই ঘুমিয়ে পড়লুম। ভোর হবার আগেই আমাদের রাতের অতিথিরা যাবার জন্তে তৈরী। বুড়ী আমাকে ডেকে তুলে বললে, “তোমার অনেক দয়া। তুমি দোর খুলে না দিলে ঠাণ্ডায় জমে মরে যেতুম—রাতে খিদের সময় তুমি পুরী খেতে দিয়েছ, নিজের ঘরে শুতে দিয়েছ, তোমার তীর্থযাত্রা সার্থক হবেই। আজ হমলোক ইতনা বারিষমে তো জানসে মর যাতা থা। বাচ্চা বুড়্‌তা লে-কর মাথেপর ছজ্জা নাহি, গাওপর আচ্ছাদন নাহি—, তুম সবকুছ দিয়া। যম্‌নামাঈ তুমহারা ভালা করে।”

বিলিতি খ্যাংকিউকে হার মানিয়ে দেওয়া এই গ্রাম্য সৌজন্যে আমি লজ্জায় মরে যেতে থাকি। দুটো কমল একটা লেপেও হি হি করে কেঁপেছি। সারারাত সোয়েটার পরে মোজা পরে মাথায় মাফ্‌লার বেঁধে শুয়েছিলাম, তবুও। আর ওদের একটা কমলও অফার করিনি। যা খেতে পারিনি নিজেরা, তাই ওদের খেতে দিয়েছি ‘উড়ো খে গোবিন্দায়’ করে। ঘরটুকুতে বসতে দেওয়া ছাড়া কিছুই করিনি। দিতে পারতাম কমলের ভাগ। কিছুই দিইনি। তবুও এত প্রশংসাবাক্য শুনে ক্লমিকীটের মতো লাগছে নিজেকে। ওরা এখন রওনা হলে বাঁচি। শীত এখনও যথেষ্ট। তবে বৃষ্টিটা ধরেছে।

২১

## ভোরের অতিথি

যম্‌নামাঈ-এর জয়ধ্বনি দিয়ে ওরা রওনা হয়ে গেল। আমরাও উঠে পড়ি। কিন্তু বাথরুমটি ভেতর থেকে বন্ধ। এ কী করে হয়? হয় হয়। গুরু মহারাজ এবং এ-বাড়ির চৌকিদার মহারাজের যুগ্ম মদতে হয়। ঐ হোটেলগুলোর তো বাথরুম নেই। মহিলাদের জন্য এটা খুলে দেওয়া হচ্ছে। ওপাশে একটা দরজা আছে না মেথর যাবার? সেটার বাইরে তালা, ওদের হাতে চাবি। ওরা সেটা পয়সা নিয়ে ব্যবহার করতে দেয়। অগত্যা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদেরই অ্যাটাচ্‌ড বাথরুমে ঢোকবার টার্ন নিতে হল। গুরুজীর স্লোগানঃ—“কুছ ফিকব্ব মত করো।

বিবিজী, সব ঠিক হো জায়েগা।” রঞ্জন চৌকিদারকে দিয়ে ফ্লাস্কে ভরে চা আনাল। বিস্কুট-চা খেয়ে বিছানাপত্র গাড়িতে তুলে রওনা দিতে গিয়ে থেয়াল হল সোফার ওপর আমার শালটা আর তোয়ালে ছিল—কোনোটাই নেই। সোফা তো রাত্রে বাইরে ছিল। কারা নিয়ে গেছে কে জানে? প্রথমে প্রচণ্ড রাগ হল রঞ্জনের ওপর। ভালমাহুত্বী করে সোফা বের করলি, শালটা তোয়ালেটা নামিয়ে রাখলি না! সঙ্গে আর মাত্র একটা তোয়ালে আছে, শাল নেই। যাত্রারস্টেই অলুকুণে কাণ্ড। রঞ্জনটার যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে!

তারপর মনে হল, যদি ওই নওগাঁওয়ের অতিথিদের সঙ্গে ভুল করে চলে গিয়ে থাকে তাহলে অবিশি খুবই ভাল হয়। কিন্তু তা কি আর হবে? নিয়েছে ঠিকই চৌকিদার, কুশনগুলো মূলতে এসে। যাকগে, সেও বেশ গরীব লোকই। কুলুর শাল। হিমাচলের জিনিস হিমাচলে থাকুক।

২২

### জয় যমুনা মাদ্রিকি

চাঁ খেতে খেতে যমনাকে গুড মর্নিং করতে গিয়ে আমরা অবাক। আরে কোথায় সেই স্বচ্ছসলিলা বার্না! এক রাত্রের বর্ষণেই তার রং গেরুয়া হয়ে গেছে। আশপাশ থেকেও আর ছ’একটা সরু বার্না নামতে শুরু করেছে। আমাদের গুরু মহারাজ এসে গেছেন, সঙ্গে এক ঘোড়াওলা। তার নাম স্ত্রজন সিং। আমাদের এখন হেঁটে হেঁটে ঘোড়া পর্যন্ত যেতে হবে। সেই মল-কর্দমাক্ত পুতিগন্ধময় নরক পার হয়ে।

ছাত্রাবস্থার দুটো সোয়েটার, একটা ডাব্লু কোট, ছ’ জোড়া মোজা, টুমপীর পি. টি. শুজ এবং মাফলারে নিজেকে বেশ সুরক্ষিত মনে হচ্ছে। পকেটে চামড়ার দস্তানাও আছে। পেনটুলুন যদিও আছে সঙ্গে, ঘোড়সওয়ার হবার উদ্দেশ্যেই শিবু ভরে দিয়েছে বাজ্রে। কিন্তু এখানে বড্ড বেমানান লাগবে মনে হল। রঞ্জন আর পিকোলো দুটি ভাইয়ের মতন সেজেগুজে রেডি শার্টপ্যান্ট, নতুন কেডস্‌জুতো, সোয়েটার, মাফলারে কোটে—থুব স্মার্ট। পিকোর মাথায় আবার স্কার্ফ।

স্কার্ফ মানে ৫ মিটারের এক মিটার নীল স্ত্রতি ছিট্‌ হুবীকেশ বাজার থেকে কিনে মাঝখানে লম্বাখাষি ছিঁড়ে আধখানা করে নিয়েছিঃ স্কার্ফ। মা-মেয়ের চুল বাঁধবার জন্তে। মাকে যাতে গাঁইয়া এবং মেয়েকে যাতে মেমসাহেব মনে হচ্ছে।

যমুনা আর হুম্মান গঙ্গার মিলনক্ষেত্র এই হুম্মান চটি। সেই সমস্তটা যে কী অপূর্ব! দুটি রাগী পার্বত্য ধারা ফুঁসতে ফুঁসতে এসে মিশছে—জলটা যেন ফুটছে—পাথরে, জলে, ফেনায় ছিটিয়ে আশ্চর্য এক চেহারা। আমি ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে বললুম, “একটা ছবি তুলি।” রঞ্জন এবং পিকো বললে, “এখন থাক, পরে।” ফলে ছবি তোলা হয়নি। ফিরেছি বৃষ্টিতে, সন্ধ্যার স্নান মন-থারাপের মধ্যে।

অস্বস্তিতে যমুনাতীর পথে রওনা হলুম। ব্রিজটি পার হয়েই দুটি খুদে খুদে খচ্চরের পিঠে চড়িয়ে দিলেন মহারাজ। সূজন সিং একটার সঙ্গে আর অন্যটার দড়ি ধরে আছে খুদে গুড়গুড়ে এক বালক। রবীন্দ্র সিং তার নাম। খচ্চরের পিঠে বসে মনে হল পড়ে যাচ্ছি, পড়ে যাবই, পড়ে যাওয়া থেকে নিস্তার নেই, মাধ্যাকর্ষণ যেন ভাকিনী মায়া হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। অথচ ঘোড়ায় বহু চড়েছি, কিন্তু খচ্চরে চড়িনি, এ খচ্চরের সাইজ আবার গাধার মতন। পিকোকে বেশ মানিয়ে গেল। যেন চিরকাল ও এভাবেই জীবনযাপন করেছে—যা দেবী সর্বভূতেষু খচ্চরপৃষ্ঠে আরোহিতা। রঞ্জন স্মার্টলি লাফিয়ে পাহাড়ের পথে চলল। এই ডানদিকে হুম্মান গঙ্গার খাদ, বাঁদিকে পাহাড় কেটে রাস্তা। মাথার কাছে পাথরের চাইগুলো ঝুলে আছে। “শিরু বঁচাকে, শিরু বঁচাকে” বলে সতর্কবাণী হাঁকছে সব ঘোড়াওয়ালা। একটু পরে পথ বাঁক নিল। বাঁহাতে এল গভীর খাদের মধ্যে যমুনা আর ডানদিকে পাহাড়। পথ চণ্ডা থানিকটা, বড় বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা। ফুলে ফুলে পথ ছেয়ে আছে। কী ফুল! কী ফুল! মন্দার। দেখতে ঠিক চেন্টনাট গাছের মতো। ফুলও। কী ফুল বললে? মন্দার। ‘এই তবে মন্দার তরু?’ দেশের মদারি গাছ, বিদেশের চেন্টনাট ট্রি আর এই মন্দার—এরা কি সব একই গাছ? কে বলে দেবে? মন্দার পুষ্প বড় সুশ্রী।

২৩

### হেলে, ঝুঁকে

পথটি শুষ্ক শ্যামল, ঝোপঝাড় গাছপালা, ফুলে ফুলে ভর্তি। পিকো কেবলই হাত বাড়িয়ে ফুল তুলছে। আমি দুই হাতে খচ্চরের পিঠের আসনের একটা কোণ প্রাণপণে চেপে ধরে আছি, যাতে পড়ে না যাই। লাগাম-টাগাম, রাশ-টাশের বালাই নেই বলে ব্যালান্স রাখা খুব শক্ত। কুন্দন সিং যত বলে উৎসাহ-য়ের সময়ে পেছনে হেলে থাকতে হবে, আর চড়াই ভেঙে ওঠার সময়ে ঝুঁকে থাকতে হয়—আমার কিছুতেই মনে থাকে না। কেবলই উন্টোপান্টা হয়ে

যবে। প্রধান শত্রু পেছনেই আছে। কেবলই টেঁচায়—‘এবার বুকে, এবার হেলে।’ মাকে জ্ঞান দিতে পেরে তার স্বর্গীয় আহ্লাদের কোটো খিচকর রাখা আছে।

খচ্চর আমার বুকের ওপর চার ঠ্যাং মেলে শুয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়নি ঠিকই, কিন্তু আমার অবস্থা শ্রীরাধিকার মতো। প্রতি অঙ্গ কাঁদে মোর প্রতি অঙ্গ লাগি। এই সীতেও শ্বেদ-কম্প সব কিছুই দেখা দিয়েছে এবং দুই পায়ের ডিমে ক্রমাগত সঃপ্রম রামচিহ্নটি কাটছে খচ্চরের স্রাডালের বেন্ট। পা ঢোকাবো কোথায়? রেকাব নেই। যে নেয়ারের দড়িটি বুলছে, তার ফাঁসের মধ্যে পা গলাতে হবে। পা এদিকে কিট করছে না। ফাঁসটা’স ঢের নিচে। পায়েরা আপনমনে ঝোঝুল্যমান, পায়ের নিচে “মাটি” তো নেই-ই, রেকাব দড়ি ফাঁস কিছুই নেই, বিগুন্ধ পার্বত্য বায়ু খেলে যাচ্ছে। ফলে আমার আত্মবিশ্বাসের কিঞ্চিৎ অভাব দেখা দিয়েছে। পিকোর হাতেও সীট আঁকড়ানো, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ঈশ্বরই একমাত্র সাপোর্ট, কেননা পা রেকাবে ভরা আছে, তবু রক্ষে। হাতেও সাপোর্ট নেই, পায়ের সাপোর্ট নেই। খচ্চরটি অবগু আমার চেয়ে ঢের বেশি ভদ্রমহিলা। তার নাম যমুনী। সে তার গতিপথ ভালরকম চেনে এবং মনিবের সব কথাই বশবদ কুকুরের মতো ভক্তিতরে মানে। অত্যন্ত ভয়ে কাঁটা হয়ে যাচ্ছি। বাঁদিকে যমুনার খাদ।

সুন্দর দৃশ্য নিশ্চয় আছে, কিন্তু দেখবার সুযোগ নেই। বুকে এবং হেলে, হেলে এবং বুকে, স্রাডল আঁকড়ে এবং সামনে দেখে চক্ষু কর্ণ পেট পিঠি ঘাড় কাঁধ হাত পা প্রত্যেকটি অঙ্গের যথাযথ অস্তিত্ব সম্পর্কে ক্রমশই উত্তরোত্তর নিঃসন্দেহ হয়ে উঠছি। বাধায় বাধায়। সামনে হঠাৎ দেখলুম তিনটি গাছের মোটা মোটা শেকড়। তার ওপর দুয়েকটা পাথর—পথ বলতে এই। তলা দিয়ে যমুনার লীলাচাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে, খচ্চরের পা তার ওপর পড়ছে দেখেই ‘চক্ষু মুদিয়া ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিলাম’। তারপর পেছন ফিরে দেখলুম মেয়ে আছে, না নেই! আছে। রঞ্জন হেঁটে আসতে আসতে অনেক পেছিয়ে পড়েছে।

প্রচুর জাঠ আর রাজস্বানী যাত্রী। কী বর্ণবৈচিত্র্য! গাঢ় হলুদ, গাঢ় লাল, ম্যাজেন্টা, ঘন নীল ঘাঘরার আর ওড়নার মধ্যে দেখছি এই রংগুলিরই প্রাধান্য। পায়ে কেডস অথবা নাগরা জুতো। কেউ কেউ কেডসের পেছনটা কেটে চটিজুতো বানিয়ে নিয়েছে। জুতোর ওপর মোটা মোটা রূপোর রমর রমর মল বাজছে। হাতে মোটা বালা, কঙ্কন, রঙিন গালাব ওপর হীরের মতন কাঁচবসানো চুড়ি। কী সুন্দর সব অলঙ্কার! আভরণ সত্যিই যে মানুষকে কত সুন্দর করে তা আরেকবার নজরে পড়ল। বৃদ্ধাদেরই গায়ে বরং রূপোর ভার ঢের বেশি। অল্পবয়সীদের

মল চুড়ির মতো সুরু হয়ে এসেছে। তাদের গলার হারও সুরু। বুড়াদের গলায় মোটা মোটা হাঁহুলি, দীতাহারের মতো গয়না শার্টের বুকের ওপর লুটিয়ে আছে। ঘাঘরার সঙ্গে শার্ট পরাই এদের স্টাইল। আর কাঁচুলিও আছে। বুকের মধ্যে ওড়না গোঁজা। মাথায় তোলা। ভোটকম্বল কাঁধে। প্রত্যেকের হাতে লাঠি। রঞ্জন লাঠি নিতে ভুলে গেছে। অনেকক্ষণ ওকে দেখা যাচ্ছিল। একসময়ে হারিয়ে গেল।

২৪

### এই জায়গাটার নাম কী গো ?

পথটা অসহ্য স্থলর। অনেকক্ষণ বাদে একটা উপত্যকায় এলাম। গম হচ্ছে, যব হচ্ছে, ধানও হচ্ছে—ছোট ছোট বারান্দার মতো কোণাচকাটা গুটে। রাস্তা চওড়া হল। এখানে দু'একটা ধর্মশালা আছে। কালীকম্বলীওয়ালার উঠানে একটা কচি বউ কাপড় কাচতে কাচতে বলে উঠল, “এই জায়গাটার নাম কী গো ?” খালি গায়ে ধুতি পরা এক ভদ্রলোক গামছা শুকোতে দিতে দিতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, “ফু-উ-উ-ন্ চো-ও ওট্টি”। বুকের পৈতেটা দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ খাম বাংলা কথা শুনে প্রাণ জুড়োলো, মুহূর্তের জন্তে ভুলে গেলুম খচ্চরে বসে আছি, চারিদিকের হিমালয় ঠিক কলকাতার মতো চিরচেনা বোধ হলো। তার পরেই দেখতে পেলুম সেই দাঁড়কাকটাকে এবং খেয়াল হলো, এতক্ষণ একটাও পাখি দেখিনি। এত গাছগাছালির ভেতর দিয়ে এলুম, একটা পাখির ডানার শব্দ একটা পাখির ডাক কানে যায়নি। আশ্চর্য তো ! আর দেখিনি বেড়াল। সেই জগৎসিংহের দৃষ্ট অলুক্ষে বেড়ালের পরে দেরাডুন থেকে ফুলচটি অবধি একটাও বেড়াল দেখিনি, কেবল কুকুর আর কুকুর। ফুলচটির পর রাস্তা কিছুটা সহজ হল খানিকক্ষণ।

পাহাড়ের গায়ে সারাপথে নানান উপদেশ লেখন। বেশির ভাগই সরকারী উপদেশ—স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে, পি. ডব্লু. ডি. থেকে, গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম থেকে। তেড়ে যাত্রীদের জ্ঞান দিয়েছে। রাস্তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট সাদা রং-করা ক্যানভাসের হাকম্বর (চার ফুট বাই আড়াই ফুট হবে)—তার গায়ে বড় বড় (দুই বাই এক) হরফে লেখা শৌচাগার, মুজ্রায় ইত্যাদি। তার ওপরে মহিলা-পুরুষও চিহ্নিত আছে। এবং কাছ দিয়ে যাবার সময় নাকে কাপড় দিতে হয়। জলের কোনো বন্দোবস্ত দেখিনি। ঝাডু বালতি সমেত কোনো মূর্তিও চোখে পড়েনি। তবে পাহাড়ের গায়ে অনবরত লেখা আছে টিকে নেবার কথা, কলেরার

ইনজেকশন নেবার কথা। লেখা আছে ‘লেবু খাও, রোগ থেকে বাঁচবে’ বা ‘চলতি পথে যাত্রীদের সাহায্য করুন’ ‘দাস্তবমির ওষুধ এফুনি খাও, দেরি করো না।’ ওষুধটা দেবে কে? পথে স্বাস্থ্যবিভাগের কোনোই আপিস চোখে পড়েনি। এমন কি কোনো ফ্লাস্ট এড আপিসও না। অথচ কী কঠিন পথ, কত যাত্রীই তো অস্থস্থ হয়ে পড়ছেন! প্রধানত বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা গ্রাম থেকে আসেন এখানে, স্বাস্থ্য-বিভাগের স্লোগান তাদের রক্ষাকর্ম কতটা করতে পারে কে জানে? এই জন্তই বোধ হয় স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে প্রায়ই লেখা হয়েছে—“ভগবান আপকো যাত্রা সফল করে।” ( কেননা আমরা সাহায্য করতে পারছি না। )

জানকীচটিতে ইস্কুল আছে, গ্রাম্য বালক-বালিকারা যায়। স্বরথ সিং গাড়ির পথে আসতে আসতে বলেছিল বটে। বহুগুণাজী হিমাচল প্রদেশের বহু উপকার করেছেন। এইসব ভালো মোটর রাস্তা বানিয়ে দিয়েছেন, গ্রামে গ্রামে বিজলী বাতি এনেছেন, প্রতি পাচ কিলোমিটারে ফ্রী ইস্কুল হয়েছে, হাসপাতালের মতো ছোটখাটো স্বাস্থ্য-অফিস বানিয়েছেন ( সারাপথ লাল ত্রিকোণ, দো ইয়া তিন ইত্যাদি দৃশ্যমান ) এবং পোস্ট অফিসও এনেছেন। সবচেয়ে ভাল কাজ করেছেন—গ্রামে গ্রামে ব্যাঙ্ক বসিয়েছেন। এই ব্যাঙ্কগুলো পাহাড়ীদের ঋণ দেয়। তাইতে কেউবা ছাগল ভেড়া কেনে, কেউ চাবের যন্ত্রপাতি কেনে, কেউ দোকান খোলে। মোট কথা হিমাচলের গ্রামে কেউ আর কাজের অভাবে বসে থাকে না। সব বাচ্চারা ইঙ্কুলে যায়। একা নাকি বহুগুণার গুণেই।

২৫

### জানকীচটি আ গয়া

জানকীচটিতে প্রচুর দোকানপাট, সবাই চা-জিলিপি আর গরম গরম পকৌড়া বিক্রি করছে। আমরা পথে যেতে যেতে দেখলাম দুটি ছিপছিপে বাঙালী মহিলা, ছাপা লালপাড় সূতী শাড়ি আর সাদা ব্লাউস পরনে, কোমরে সোয়েটার বেঁধে কেডস পায়ে দৌড়ছেন। লাঠি হাতে প্রায় দৌড়েই জানকীচটি পৌছে যাচ্ছেন। পথে আরেক জায়গায় একজন টাকমাথা তরুণকেও দেখেছি ট্রেকিং স্ট্রট পরে লাঠি হাতে ছুটতে। একটু পরে তাঁকে দেখি বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। পিঠে হ্যাভারসাক, হাতে লাঠি, কাঁধে ফ্লাস্ক। কখন কাঁধে পুঁটলি মাথায় নাগরা পায়ে চাদর গায়ে দলে দলে মাতৃগুণ্ডলির মধ্যে রীতিমতো বেমানান একক। যেন শোভাযাত্রা করে চলেছে এই রঙবেরঙের মেয়েপুংকষের গ্রাম্য জনতা। এই আদিম পাহাড়, আকাঁড়া বন, এই উদ্দাম ঝর্না, এই অযত্নে গড়া পথ—এর মধ্যে



এরাই ঠিক মানিয়ে যাচ্ছে। পথের বাঁকে-বাঁকেই বিশ্রাম করছে পুঁটলি নামিয়ে। দেখা হলেই জয়ধ্বনি—জয় জম্নাজী কী, জয় জম্নামাঙ্গী কী। ঘোড়ায় (খচ্চরে) চড়া মানুষগুলি উত্তরে প্রথম প্রথম কিছুই বলে না। কিন্তু জানকীচটিতে পৌঁছতে পৌঁছতে তাদের কনডিশানিং হয়ে যায়। তখন শুনি ঘোড়সওয়ার সাহেব মুখ থেকে চুরট নামিয়ে বলছেন—“জয় হো জম্নাজীকী”—পুঁটলি মাথায় পদযাত্রী বুড়ির দিকে চেয়ে। বুড়ি হেসে বলে, জয় জম্নাজীকী—আব তো আধা রাস্তা আ গয়ে হো—জানকীচটি তো ইধরই হ্যায়।” পরস্পরকে মনোবল দিতে দিতে ত্রুগ্রসর হচ্ছে অসংলগ্ন অথচ পরস্পর অন্তর্লগ্ন এক আশ্চর্য জনতা। যারা নেমে আসছেন তাঁরাও আমাদের আত্মীয়। যারা উঠতি তাঁরা তো বটেই।

জানকীচটিতে নেমেই পিকো ব্যথার গুণ্ণ, আমি শ্বাসকষ্টের গুণ্ণ চা দিয়ে খেয়ে ফেললুম। ঘোড়াওয়ালারাও চা খাচ্ছে। পুরো রাস্তা রুজন সিং অল্প সমস্ত পদযাত্রী ও অশ্বতরারোহীদের যাত্রার নিয়মকানুন শেখাতে শেখাতে এসেছে। মোড়ে বাক নেবার সময়ে পদযাত্রীরা কদাচ ঘেন খাদের দিকে যাবেন না। খচ্চররা বাইরের দিক বাক নেয়, তারা ঠেলে দিতে পারে। “ভাইনাব, জানবর কো বিশোয়াস নাহি—পাহাড়কা সাইড্‌সে চল্‌না”—চোখে দেখলুমও খচ্চর কী ভাবে ঠেলা মারে। একেবারে জাস্তব। কুন্দন সিং খুব লোক ভালো এবং প্রথম শ্রেণীর ট্রেনার। খুঁদে রবীন্দ্র সিংকে সে যত্নে শিক্ষা দিতে দিতে আসছে। পিকোর ঘোড়াটি বয়সে ছোট, তার ট্রেনিং কম, আমার যমুনী পাকাপোক্ত। যমুনী যা করে, মোহন দেখাদেখি তাই করে। যমুনী যেই পাহাড়ী ঘাস ফুল খেতে পাথরে চড়তে চেষ্টা করে, মোহনও তাই করে। যমুনী যেই বর্নায় জল খেতে মুখ নামায়, মোহনও জল খায়। আর যমুনী যদি সেই মন্দ কর্মটি করে পথ নোংরা করে, মোহনও সেটি করবেই। দুর্গা-অপুর মতো আর কি। রবীন্দ্রকে প্রায়ই কুন্দন সিং বলছে, “ধক্ তো নাহি গয়ে হো? জব্বা রেস্ট লোগে?” রবীন্দ্র বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ছে। সে বাক্যব্যয়ে বিশ্বাস করে না, খচ্চরদের মতোই লাফিয়ে লাফিয়ে পাথরে পাথরে পা ফেলে পথ চলছে। খচ্চররা যা বুঝলুম, মাটি কাদা দিয়ে চলা পছন্দ করে—তা যদি সেই রাস্তা ছ’ ইঞ্চিও চওড়া হয়, চার ফুট চওড়া তুঁড়ি নিয়েও সেই ছ’ ইঞ্চি দিয়েই চমৎকার হেঁটে যাবে তারা। হুড়ি পাথরে বা সিঁড়িভাঙা পথে উঠতে তাদের কষ্ট হয়। দেখতে দেখতে জানকীচটিতে রঞ্জন এসে পড়ল।

## ডাঙী, কাঙী কাঙজান

চা খেয়ে ফের রওনা হবো, দেখি এক থরথরে বড়ী পাঞ্জাবী মহিলা কাঁদো কাঁদো মুখে কোনরকমে হুমড়ি খেয়ে ঘোড়ায় বসে আছেন, তাঁকে ধরাধরি করে নামানো হচ্ছে। অল্প ঘোড়াবরদাররা তাঁর সহিসকে বকুনি দিচ্ছে, “এরকম সওয়ারী কেন নিয়েছ? পড়ে গেলে কে দায়ী হবে? বড্ড তোমার লোভ!” সহিসও চুপ করে নেই। বলছে, “কী করব? অনেক করে বলল, ধরল তাই।” মহিলার ডাঙী বা কাঙী নেওয়া উচিত ছিল। এ বয়সে শরীরের এ অবস্থায় কেউ ঘোড়ায় চড়ে না। ডাঙী অবশ্য বড্ড খরচ। আর কাঙীতে খুব ভয় করে।

একটা মোড়ে দেখছিলুম প্রচণ্ড পেণ্ট করা, মুখময় রং মাথা এক ফ্যাশানেবল মোটা যুবতী, প্রচুর গরম পোশাকের মধ্যে টবের গোলাপ ফুলটির মতো কাঙী থেকে মুখ বের করে বসে আছেন। মোটা শরীরে কঠোর চিহ্ন নেই। কাঙী-ওলাটি তরুণ। সে কাঙীটি একটা পাথরে ঠেস দিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। প্রায় জিব বেরিয়ে পড়েছে তার। দেখে বড্ড মায়া হল। আর লজ্জাও। অমনি শুনলুম মেমসাব বলছেন, “চলো চলো, দেবু কিউ কর্তা? ফির ঘুমকে তো আনা হায়!” কাঙীওলার কপাল থেকে এই শীতেও সহস্রধারায় ঝর্ণা ঝরছে।

কাঙী হচ্ছে একরকম কুলোর মতো গড়নের চ্যাপ্টা বুড়ি, কুলিরা ভালো করে পিঠে বেঁধে নেয়। বুড়ির মধ্যে উবু হয়ে বসে থাকে যাত্রী। বসার এই ভঙ্গিটা ভালমতোই প্র্যাকটিস করা থাকে—ভ্রণাবস্থায়। মাতৃজঠরে আমরা এই ভঙ্গিতেই থাকি, হাঁটু দুটি চিবুকের কাছে গুটিয়ে। আর একবার একজন কাঙীওলার পিঠে একটি দেহ দেখলুম। দেহে প্রাণ আছে কি নেই বুঝিনি। মুখ হাঁ, চোখ উল্টোনো, ঘাড় কাত। দেহাতী বুদ্ধা। মুখ-চোখে মাছি বসছিল না। হয়ত জীবিতই ছিলেন, অচেতন। পিঠে পিঠ দিয়ে বুলে থাকা নিশ্চয় আরামপ্রদ নয়। গ্রীসে এককালে বড় বড় জালার মধ্যে মৃত মানুষকে এই ভঙ্গিতে পুরে গোর দেওয়া হত, অনেক কঙ্কাল পাওয়া গেছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আথেন্সের জাদুঘরে দেখেছিলুম।

মাঝে মাঝে হুম-হাম করে সদর্পে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ডাঙী। শেঠজী আর তাঁদের বিবিজীরা আরামকেদারায় কাত হয়ে আছেন। কাঙী শিশু ও বুদ্ধদের জন্তে। কাঙীর আর খচ্চরের একই খরচ পড়ে। তবে ভারবাহী

মাহুঘটির চেয়ে পার্বত্য পশুটি বেশি ভারসই এবং নিরাপদ এবং মূল্যবান প্রাণীও বটে।  
কিনতে গেলে তো মূলধন চাই।

এবারে হেঁটে রওনা দিল পিকো। খচ্চরে চড়ল রঞ্জন। পথটা ভারি সুন্দর  
এখন। চওড়া সবুজ শস্তভরা উপত্যকা। চারিদিকে পাহাড়। ডান পাশে যমুনার  
নৃত্যলীলা পথটা একটুক্ষণ কিছু পাহাড়ী গাছের নিচে দিয়ে যায়। কী গাছ  
জানি না—চেনা ঝাউ, পাইন নয়। ঝিরঝিরে, বেঁটে, ছড়ানো ছাতার মতো নাম  
না-জানা গাছ। এখানেই কেবল দেখা গেল গোটা পঁচিশ-তিরিশ গাছ। যেন  
উপবন। তারপর শুরু হল খাড়া চড়াই। রাস্তা এবার জ্যামিতিক ধাঁচে ভাইনে  
বায়ে কোনাকুনি বাঁক নিতে আর চওড়াতে কমতে শুরু করল। পিকোকে স্বজন  
সিং ঘোড়ায় তুললো আর রঞ্জন চলল পাকদণ্ডী বেয়ে। পাহাড়ী মাহুঘজনদের  
দেখাদেখি।

পথটা সত্যি আশ্চর্য সুন্দর। চারিদিকে ঘিরেছে উন্নত সবুজ পাহাড়, একদিকে  
খুব নিচে—অনেক নিচে যমুনার খাদ। প্রপাত গর্জন পর্যন্ত মূছ হয়ে যায়। তাকাতে  
ভয় করে। পথ ক্রমশ সরু হচ্ছে আর এবড়ো-থেবড়ো পাথরে হচ্ছে। ঘোড়া গেলে  
মাহুঘ যেতে পারে না। মাহুঘকেই দেয়ালে পিঠ দাঁড়িয়ে খচ্চরকে সসম্মানে পথ  
ছেড়ে দিতে হয়। মাঝে মাঝে দেয়ালে একটু গুহামতো আছে। তাতে মাঝে  
মাঝে একটি তরুণ সাধুকে দেখছি, বসে গাঁজা খাচ্ছেন। অনেকবারই ওর সঙ্গ  
দেখা হল। পথে কখন যে আমাদের পেরিয়ে যাচ্ছেন টের পাচ্ছি না। যখন বসে  
গাঁজা খাচ্ছেন তখন দেখতে পাচ্ছি। কুন্দন সিং বলল, “মরেগা শালা সাধো। গাঁজা  
খাকর চল রহা। বহুৎ খতরনাক রাস্তা।”

২৭

### জানবরকো বিশোয়াস নহী

ইতিমধ্যেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পথের অবস্থা, পাহাড়ের মধ্যে গর্ত খোদাই  
করে রাস্তা কৌদা, ঢাকা বারান্দার মতন মাথার ওপর ঝুঁকে আছে পাথরের এবড়ো-  
থেবড়ো ছাদ। খচ্চরারোহীদের মাথায় যখন-তখন “অতিবাড় বেড়ো নাকো”  
বলে গৌত্তা মারতে পারে। কুন্দন সিং চোঁচাচ্ছে, “শির বাঁচাকে, শির বাঁচাকে।”  
রেলিং দেওয়া আছে থানিকটা রাস্তা। এক জায়গায় দেখি রেলিং ভাঙা। কুন্দন  
সিং বলল, “কাল এক লড়কী গির গয়ী।” সে কি? পনেরো-ষোলো বছরের  
উত্তরপ্রদেশী মেয়ে, নাচতে নাচতে আসছিল আগে আগে, বাবা মা দাদা পিছনেই  
ছিল, খচ্চরের হঠাৎ ধাক্কা সামলাতে না পেরে আট হাজার ফিট নিচের খাদে

যমুনার স্রোতে—“শালে জানবু কো বিশোয়াস নহী—আগে বাঢ় যমুনী ঝ ঝ ঝঃ  
লীঃ লীঃ—”

রেলিং পার হবার পরে হঠাৎ একটা জায়গায় যমনীকে দাঁড় করালো কুন্দন  
সিং।—“উতার যাইয়ে। আব্ পায়দল এক-দো কিলোমিটার। খচ্চর নাহি  
যায়েগা। ডাণ্ডী, কাণ্ডী, কুচ্বি নাহি যায়েগা।” সত্যি সত্যি এইখানে সব ডাণ্ডী-  
কাণ্ডীর চড়ন্দারদের একেবারে পথে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হাঁটো। সরকারের  
বারণ আছে। এ পথে অস্তুর ওপরে নির্ভর করে ওঠা যাবে না হতে পারে, হামা  
টেনেও উঠতে হতে পারে। এটা যার যার নিজের ব্যাপার। কিন্তু আগে কেন  
বলেনি? হয়তো বুদ্ধ-বুদ্ধারা অনেকেই তাহলে আসতেন না। সারাপথ ডাণ্ডীতে  
বা কাণ্ডীতে যাবেন বলে রওনা হয়ে, তারপর পথ চলতে বাধা হওয়া এবং সবচেয়ে  
কঠোর সবচেয়ে কঠিন চড়াই অংশেই—এটা ব্রীচ অব কনট্রাক্ট। বুড়ো মানুষদের  
মুখের সেই অসহায় চেহারা ভোলবার নয়। এমন তো কথা ছিল না! এটা কী  
হলো? পারবো তো? জয় যমুনামাঈ, বাঁচিয়ে দিও মা।

কিন্তু মা বাঁচিয়ে আর দেয় কই! আমার নিজের ঘরে একটা অবাধ্য ছুটফটে  
পঞ্চদশী আছে। আমি কুন্দন সিংয়ের ম্যাটার-অব-ফ্যাক্ট স্বরে বলা পনেরো বছরের  
মেয়ের খাদে পড়ে যাওয়ার সংবাদে প্রস্তুত হতে গেলি। ভুলতে পারছি না,  
এ দুর্ঘটনা মা-বাবার চোখের সামনেই ঘটেছে। অথচ আটকাতে পারেননি। তাঁরা  
অগ্র বাকৈ তখন। পুণার্জান করে ঘরে ফিরবেন কোলের সন্তানকে যমুনায় বিসর্জন  
দিয়ে। যমুনোত্রীর পথশোভা একেবারে বিবর্ণ বিষাদ হয়ে গেল। কেবলই  
পিকোকে সামলাচ্ছি। সেও বড় স্বেচ্ছাপ্রবণ মেয়ে, বড়ই চঞ্চল। যমুনোত্রীকে  
মেয়ে উপহার দিয়ে যাবার কোনো ইচ্ছে নেই আমার।—“পিকো, খুব সাবধান।  
ঝুঁকে ফুল তুলবি না। আমার সামনে সামনে চলবি।”

কিন্তু এখন তো হটন! হাঁটব কি? পথ জুড়ে শুয়ে পড়েছেন প্রায় এক  
বিশাল পাঞ্জাবী বৃদ্ধ। তাঁকে ধরাধরি করে তিন-চারজন ঘোড়াওয়ালা মিলে  
ঘোড়া থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে দিয়েছে এই পিছল পাথুরে চড়াই পথে। তিনি  
কৈঁদে ফেলেছেন আর কেবলই বলছেন, “আমার ছেলে কই? আমার থলি  
কই?”—“মেয়ে বেটা, মেরা থৈলিয়া?” এঁকেই জানকীচটিতে দেখেছিলুম।  
ভারী শরীর, প্রায় আশি বছর বয়েস। হিসি করে ফেলেছেন দৈহিক স্ট্রেনে  
এবং প্রাণভয়ে। ঘোড়ার সঙ্গে কোনো আত্মীয়-বন্ধু নেই। সহিসটি খুবই দুট্ট।  
খুব ধমকাচ্ছে এবং রুক্ষ ব্যবহার করছে। যেহেতু একেই গ্রাম্য, তায় জরাবিশ্রান্ত  
এবং অবস্থাপন্ন নিশ্চয়ই নন—তা হলে ডাণ্ডী নিতেন। এই বয়েসে কেউ (এই

রকম রাস্তায়) খচ্চরে ওঠে? পিকোলো তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। আমরা তাঁকে হাত ধরে পথ থেকে তুললুম।—“চলুন মাস্ট্র, আমাদের ধরে ধরে চলুন—কোনো ভয় নেই।” দুই হাতে পিকো তাঁকে জড়িয়ে ধরল (নিজেই পায়ের টাটানি ব্যাখায় ভাল করে পা-টাও ফেলতে পারছে না) আর আমি তাঁর ডান হাতটা শক্ত করে ধরলুম। হাঁফে, ভদ্রভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলতেও জানি না, তারপর তিন রুগীর অপূর্ব প্রসেশান যেমন-তেমন করে এগিয়ে চলল ট্যারা-বাকা হয়ে যমুনোত্রী অভিমুখে। প্রথমটা উনি খুনখুন করে কাঁদছিলেন। ক্রমশ থামলেন, অল্প অল্প কথাও বললেন। ছেলে নিচে। হেঁটে উঠেছে দুটি নাতিও। থলিটি খচ্চরের গলায় বাঁধা। সে ব্যাটা আগে চলে গেছে। তাতেই সর্বস্ব। এখন উঠতে হাঁটতে পেরে ওঁর সেই যথাসর্বস্ব বিষয়ে উদ্বেগ হচ্ছে।—“ভাববেন না মাস্ট্র, এরা চোর নয়, থলি ঠিকই থাকবে।” আশ্বস্ত হয়ে উনি পা ঠিকমতন ফেলবার চেষ্টা করতে থাকেন। জলন্ধরের এক গ্রামে ওঁদের বাড়ি। ছেলের সঙ্গে চারধাম করতে বেরিয়েছেন। যমুনোত্রী প্রথম ধাম।—“এমন জানলে আসতাম না। মরে যাবো আমি ঠিকই, নিশ্চয়ই মরে যাবো। কেউ বলেনি এত হাঁটতে হবে, কেউ বলেনি ঘোড়া এত ভয়ংকর—” বলতে বলতে প্রায় কেঁদেই ফেলছেন। অনেক কষ্টে শিশুর মতো ওঁকে তুলিয়ে তালিয়ে হাঁটি। পথশ্রমে বাক্যলাপ আপনি বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের ঘোড়াগুলারা যে যার ঘোড়া নিয়ে সবাই অনেক এগিয়ে গেছে, কারুর টিকি দেখা যাচ্ছে না। কেবল ওঁর ঘোড়াগুলারা যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। খেঁচায় নয়, অস্ত্রান্ত ঘোড়াগুলাদের চাপে। এক এক সময় পথ খুবই খারাপ যেখানে, তখন এসে সাহায্য করছে ওঁকে। পথটাও যেন ফুরোতে চায় না। যদিও আমার এটাই ভাল লাগছে। গাছপালা পথ পাথর বর্না আর ওদিকে পাহাড়ের গায়ে চার-চারটে ধবধবে গ্লেশিয়ার—চোখ মেলে তবু দেখতে পাচ্ছি। খচ্চরে চড়লে মন এতই একাগ্র, কেবল মাথার ওপরের পাথর সামনের মানুষ আর নিচের রাস্তাটি ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না। অথচ টের পাচ্ছি—যেতেছে বহিরা জ্বসময়।

একসময় হামাগুড়ি সত্যিই প্রায় দিতে হল, বুষ্টি-পিচ্ছল পথ, সিঁড়ির মতো বড় বড় পাথর সাজানো, কখনো বা বর্নার ভিতর দিয়ে যাওয়া, আমার মাথায় ভাঙ্কল-কোটো হুড, পিকোর রেনকোটের ঘোমটা, ছাতা রঞ্জনের কাছে। রঞ্জনকে আর দেখিনি। ব্র্যাণ্ডি, গ্লুকোজও রঞ্জনের কাছে। অতএব বুঝাকে সাহায্য করার উপায় নেই। আবার ঠেলেদুলে অতি কষ্টে দুর্গাশ্রীহরি সংকটনাশিনি বলে তো মাস্ট্রকে তাঁর খচ্চরে তুলে দেওয়া হলো। খচ্চর বিনীতভাবে গলায় তাঁর থলি

ঝুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল। খলি দেখেই অনেকটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন মহিলা।  
 ঠুকে রঙনা করে আমরাও উঠে পড়ি। “উঠে পড়া” অত সোজা নয়। আমার  
 প্রত্যেক বারই মনে হয়েছে—এই শেষ, আর নয়। দুই পায়ের ডিমে বিশ্রী কাল-  
 সিটে পড়েছে, জানি না কিসের ফাঁদ। সমানে চিম্টি কেটে যাচ্ছে ঐ একটা স্পটে।  
 আর ঘণ্টাখানেক। চার ঘণ্টা হয়ে গেছে। নামছেন এমন হলুদ পাগড়ী বাঁধা  
 একটি দেহাতী বৃদ্ধকে যেই বলেছি “যমুনোত্রী মার্ককী জয়” (ঠিক কলকাতার বিসর্জন-  
 পার্টির সুরে), উনি ফোকলা হেসে বললেন, “বাস্ আব্ তো জায়দা তকলিফ নেহি  
 হোগা—আ গয়ে হেঁ আপ।” আমার গলার সুরে নিশ্চয় ক্লান্তি ছিল। জয়-  
 ধ্বনিতেই লুকিয়ে ছিল প্রশ্ন।—“আরো কতো দূর?”

২৮

### এক লড়কি মিলে গা ?

কি যে আরাম পেলুম ওই আশ্বাসে! চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছেছি তাহলে!  
 হঠাৎ দেখি সুরথ সিং—সুরথ সিংই তো? আমাদের গাড়ির ড্রাইভার—নেমে  
 আসছে।

“সুরথ সিং?” আমি চৈঁচাই।

“হা বিবিজী। হো গয়া আশ্বান হামারা।”

“ইতনা জলদি পছঁচ গয়া?”

“মায় তো পাহাড়ী হ? পাকদণ্ডীসে চলা আয়া। দেড়ঘণ্টে মে পৌঁছা।  
 গাড়িকো দেখনেবালা রাথকেই আয়া হাম। বারিষ আ গয়া, আপ জলদি যাইয়ে!  
 যমুনা মুশকিল হোগা।” কেননা বৃষ্টি হচ্ছে। পথ পিছল হচ্ছে। ফেরার পথ  
 আরো পিছল হবে। যেন অন্ধকারের আগে নিশ্চয় ফিরি। সুরথ সিংয়ের হাতে  
 লাঠি নেই, তবু কত স্বচ্ছন্দ! রঞ্জনেরও হাতে লাঠি নেই—ওর খুবই উঠতে অসুবিধা  
 হচ্ছে এজন্তো। লাঠিটা মস্ত ভরসা। অনেকখানি সাহায্য করে। জানকীচটিতে  
 ওর জন্তো একটা লাঠি চাইতে গিয়ে কী হেনস্থা! যেই বলেছি “মেরা ভাইকে লিয়ে  
 এক লাকড়ি মিলেগা ভাই?” দোকানদারের চক্ষুস্থির। পিকো হেসেই গড়াগড়ি।  
 বাপার কি? আবার বলি।—“এক লড়কি!” এবার রঞ্জন তাড়াতাড়ি শুধরে  
 দেয়, “লড়কি নেহি,—লাকড়ি, লাকড়ি! লড়কি নেই চাইয়ে—লাকড়ি চাই,  
 লাকড়ি! ষ্টিক! লাঠি!”

“ওঃ লাকড়ি? কুছ পেড়সে তোড় লো না আপ? লাকড়ি নিচেসে লানা থা।  
 ইধর নাহি মিলতা।”

হাঁটবার সময়ে টের পাচ্ছিলুম, লাঠি থাকলে কী কাজই দিত। গঙ্গোত্রীতে লাঠি নিয়ে নেব। তিন কিলোমিটার হাঁটতে হবে—যদি শেষতক যাই। যমুনোত্রী যেতে গায়ে হাতে পায়ে যে ব্যথা হয়েছে এরই মধ্যে, পরে আর কোথাওই খচ্চরে উঠব না। এটা নিশ্চিত। অতএব কেদার যাব না।

২৯

### যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা ?

যমুনোত্রীর পথ যেখানে শেষ হয় সেখানটা আরো সরু, খুব পিছল, পাথুরে এবং কাদাময়, নোংরা। ঘোড়া থেকে নামলুম যেখানে (অর্থাৎ খচ্চর থেকে), সেখানে ফের সেই পশুর মলমূত্রের বাড়াবাড়ি এবং তার মধ্যে বর্ষার জলস্রোত—হেঁটে পেরিয়ে খুব সরু একটা গলি দিয়ে যেতে হয়। সব উঠেছি, হঠাৎ একটা ঘোড়া একজন গ্রাম্য জাঁঠ বুড়োকে ধাক্কা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াগুলারা ধমকে উঠল, “কী, চোখে দেখতে পাও না ? অন্ধ নাকি ? মরবে একদিন, শালা বেওকুফ !” বুড়ো ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ গড়গড় করে পিছলে পাহাড়ের গা বেয়ে পড়ে গেল। আমি চোখ বুজেই ফেলতুম—তার আগেই দেখি খানিক নিচেই একটা চত্বর মতো, তাতে এক বুড়ী জাঁঠনী ছুটে এসে বুড়োকে জাপ্টে ধরে ফেলল। নইলে ওটুকু চত্বর পার হয়ে, ওপাশে খাদের মধ্যে পড়ে যাওয়া এমন কিছু কঠিন ছিল না। দুই বুড়ো-বুড়ীর মাথা গা ঢেকে বিরাট বড় বড় ছুটি লাল নীল প্লাস্টিকের শীট কাদায় লুটোচ্ছে, তারই ওপর পা পড়ে হড়কে গেছে। খুবই বিপজ্জনক বর্ণাতি।

যমুনোত্রীতে পৌঁছে মনে হল, কেন এলুম ? এই জন্তু আশা ? এই কুশী অপবিত্র নোংরা, মলমূত্র-জর্জরিত কর্দমাক্ত জায়গায় ? পাহাড়ের ওপরে আকাশ কত পবিত্র, কত বীজাণুশূন্য, কত শুদ্ধ। আর মাটি এত অশুদ্ধ এত অপবিত্র এত রোগবাহাইয়ের আড়ত হবে ? একদিকে একটা ধর্মশালার দেয়াল। অতৃদিকে ছ’ ইঞ্চি কাদার ওপর প্লাস্টিক বিছিয়ে ত্রিপলচাকা চা-জিলিপি-পুরী-হালুয়ার দোকান। মাঝখান দিয়ে সরু যাতায়াতের গলিপথ। ডালায় করে পুজোর নৈবেদ্য বিক্রী হচ্ছে—৫০, ৭০, ১১০, ২১০ দেখলুম। মিসেস মুখার্জী বলেছেন তাঁর স্বামীর নামে পুজো দিতে। ৫০০ সঙ্গে দিয়েও দিয়েছেন। পুজো কী করে দেয় কে জানে ! একটা ১১০ থালা কিনে আমি পিকোকে দিই। বলি, “যা, শিখে আয় দিকি কী করে পুজো দিতে হয় !” দোকানী বলে, “ছি ছি, এত দিনেও নিজেকে শিখলে না ?” তাড়াতাড়ি বলে দেয়, “থালাটাও যেন পুজোয় দিও না, ওটা আমাকে ফেরত দিও কিন্তু।” হয় মলিন অ্যালুমিনিয়ামের কাঁসি, নয় নোংরা

এনামেলের প্লেটে পুজো সাজানো একটু সিঁদুর, একপাতা প্লাস্টিকের টিপ, একটা বিশি চুলের কিতে, একটা ছোট আয়না, কাচের চুড়ি এক জোড়া, একটা পুঁতির মালা, কিছু বাতাসা-এলাচদানা, তুলসী-ধূপ এই ২৫। জিনিস যত কমবে দামও তত কমবে। নৈবেদ্যের ছিরি দেখেও খারাপ লাগলো খুব।

—মন্দির কই ?

—ওই পেছনে। প্রথম তো কুণ্ডে যান। সপ্তকুণ্ড। স্নানটা সাকন। চাল, আলু এনেছেন ? রুমালে বেঁধে কুণ্ডে ডুবিয়ে নিন, আলুভাতে ভাত খেতে পারবেন। আমরা এনেছি। ও বাবা, ঐ জলেই স্নান ! ভাতেভাত হয়ে যাবো যে !

—না না, ওটা স্পেশাল কুণ্ড। ওতে স্নান নয়। স্নানের আলাদা তিন-চারটে কুণ্ড আছে। অনেকগুলি বাঙালী এখানে। এঁদের পথেও দেখেছি। খচ্চরে চড়ে বিচ্ছিরি পথটা পার হচ্ছেন জোরে জোরে হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ নাম জপ করতে করতে। মহিলারা সবাই সাধারণ করে স্ত্রী তাঁতের শাড়ি পরেছেন, কিন্তু আমার মতো ঠ্যাং বেরিয়ে পড়ছে না কারুরই। সবাই নিচে পা-ঢাকা লম্বা গেঞ্জির আঙুরওয়ার পরেছেন আঁক রাখতে। ঘোড়ার ব্যাপারটার জন্ত পূর্ব-প্রস্তুতি ছিল। ওঁদের কেউ শিখিয়ে রেখেছিল।

এইসব কথাবার্তা শুনছি চায়ের দোকানে বসে। মুম্বদ্বারে রুষ্টি নেমেছে। দোকানে বসার জায়গা নেই। আর সবাই দাঁড়িয়ে। ছুটিমাত্র চেয়ার ছিল টিনের—আমি আর পিকো প্রথমেই পেয়ে গেছি। এত ক্লান্ত ছিলাম আর যমুনোত্রী এতই হতাশ করেছে যে চেয়ার ছেড়ে উঠতেই ইচ্ছে করছে না। যদিও বয়স্ক কিছু লোক দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছেন। হঠাৎ দেখি সেই পাঞ্জাবী বৃদ্ধা। এসে পৌঁছেছেন তাহলে ? তাড়াতাড়ি তাঁকে চেয়ার ছেড়ে দিই। মেঝেতে বসার জায়গা নেই। সবটা কাদাম্ব কাদাম্ব লেপে গেছে। ইতিমধ্যে রঞ্জনও এসে যায়। হাতে একটা ভাঙা গাছের ডাল ল্যাকপ্যাক করছে।

“এই যে দিদি, এই নাও লড়কী।”

চা-জিলিপি-পুরী-হালুয়া দারুণ জমল। চায়ে ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে খাই। বৃদ্ধাকেও খাওয়াই। “দাবাই দিয়া ? চায়মে কুছ দাবাই ডালা ? অ্যায়সা লাগতা হ্যায় কিঁউ ?” বলে নাক ভুরু কুঁচকোতে কুঁচকোতে উনি চা খেয়ে নিলেন। এরপর গ্লুকোজের প্যাকেট খোলা হল। রঞ্জন কোনটাই খায়নি। বৃদ্ধাকে গ্লুকোজ খাওয়ানো এবং সঙ্গে পথের জন্ত দেওয়া হল। ইতিমধ্যে নাতি ছুটি এসে গেছে। নাতি দেখে ঠাম্মার ফোকলা মুখে কী হাসি ! ছেলের জন্তে অপেক্ষা করে আছেন। আমরা কুণ্ড দেখতে চললাম।



### ছন্দে ছন্দে হুলি আনন্দে

এক যুহুর্তও ভালো লাগছে না এখানে। যদিও এখানে যমুনা-শিশুর খেলাধুলা সতি বড় চমৎকার। গ্রেসিয়ার থেকে নামছে তুহিনশীতল বকঝকে নীল ধারায় উন্নত গর্জিত প্রপাত। তার মধ্যে মধ্যে উষ্ণ শ্রোত—সপ্তকুণ্ডের সালকার স্ত্রিংয়ের ধারা পাশেপাশেই ছুটছে, গরম, তাতে হাত-মুখ ধুচ্ছেন ক্রান্ত যাত্রীরা। বৃষ্টির পরে এই শিখর হঠাৎ-হঠাৎ কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। গাঢ় মেঘের চাদরে হুঁহাত দূরেও কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চারটে মস্ত গ্রেসিয়ার সমেত হিমালয় পর্বত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। বাপ রে, এভাবে ঐ ভয়াবহ পথ দিয়ে নামবো কেমন করে! মর্গভেদী হাওয়ার মধ্যেই উষ্ণকুণ্ডে বহু মানুষ স্নান করছেন। নারী পুরুষ শিশু। আমি অঞ্জলিতে জল নিয়ে মাথায় দিলুম। নমো বিষ্ণু। স্নানের জগ্য প্রস্তুত নই, উৎসাহও নেই। পিকোরও প্রস্তুতি নেই। উৎসাহ থাকলেও তাই তার স্নান হল না। কেবল অপ্রস্তুত অবস্থাতেই রঞ্জন নেয়ে ফেলল। কুন্দন সিং চায়ের দোকান থেকে তোয়ালে ভাড়া করে এনে দিল। মেয়েদের পোশাক বদলের ঘরটির নেই। ভিজ্ঞে কাপড়ে বেশ খানিকটা গিয়ে একটা দেয়ালের পাশে মেয়েরা কোনো-রকমে কাপড় পরছেন। আবাবস্থার চূড়ান্ত। হঠাৎ শুনি গিটকিরি লাগিয়ে গলা ছেড়ে কেউ গাইছেন—“ছন্দে ছন্দে হুলি আনন্দে আমি বনফুল গো—” এক পঞ্চাশোখর ভদ্রলোক। সত্তমাত, পরনে গামছা, শীতের চোটে গলায় গান বেরিয়েছে। বাজালী না হলে এরকম জমাবে কে!

মন্দিরও দেখবার মতো নয়। একটা বসবার চাতাল পর্যন্ত নেই। এত কষ্ট করে প্রাণ হাতে নিয়ে এই যে ছুটে আসছে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে বিশ্বাসী মানুষ, তাদের বিশ্রামের কোনো ব্যবস্থা নেই। বসবার পর্যন্ত ঠাই নেই। তারা এসে একটু জুড়োবে কোথায়? একটু গা এলাবে কোথায়? দুটো খাবে যে রেঁধেবেড়ে তারই বা জায়গা কই? ঐ এক কালীকণ্ঠীওয়ালার ধরমশালাই আছে।

বিশ্বপ্রকৃতি যমুনোত্রীকে যতদূর সাধা স্বন্দর, স্বাস্থ্যকর করেছেন। আমার দেশের মানুষ তাকে তার সাধ্যমতন অস্বন্দর, অস্বাস্থ্যকর করেছে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে দেখেছি নৈসর্গিক রহস্যবিষ্মল কোনো স্বন্দর জায়গাকে, হোক তা পর্বত-চূড়া বা সমুদ্রতীর, পশ্চিমী মানুষ মান্নবের ভোগের উপর্যুক্ত করে তোলে। পারলে সেখানে সরাইখানা খোলে, নিদেনপক্ষে গুঁড়িখানা বসায়। পাবলিক টয়লেট বসায়। নিসর্গ দৃশ্য ভাল করে দেখবে বলে বাইনোকুলারও বসায়। সম্ভব হলে

(ট্রেকিং / স্কীইং / স্নইমিং / বোটিং) খেলাধুলোর বন্দোবস্তও থাকে। আর আমরা? সেই একই জায়গাকে ঈশ্বরের ভোগের ঠাই করি। মন্দির স্থাপনা করি। সেই ভাবেই আমাদের আনন্দ উপভোগের ব্যবস্থা করি। মনটাকে উর্ধ্ব তুলে শরীরের সুখ স্বস্তি নয়, চিন্তের আনন্দ, শান্তির দিকে তাকাই। কত তফাত দুটো সভ্যতায়। এইটে ভেবে এতদিন আমার গর্ব হতো।

যমুনোত্রীতে এসে বুঝলুম আমরা নখর দেহধারী, সভ্যতা-শাসিত মর্ত্যবাসী। আমাদের পরিষ্কার টয়লেটের খুব জরুরী দরকার। পাঁচ ঘণ্টা খুঁজলে, অথবা আট ঘণ্টা পদব্রজে এই পর্বতশৃঙ্গ অভিযানের পরে শরীর বিশ্রাম চায়, বসতে চায়, একটু স্বস্তি চায়। বেশিরভাগই আসেন ভক্তিপ্ৰাণ বুড়োমাতুল। তাঁদের অপরিমীম ক্লান্তির অপনোদন ঠিক ভাবে হয় না। এই মন্দিরের দর্শনের সুখ নেই। অনতি-বিলম্বেই উত্তরপ্রদেশ সরকারের উচিত পথে টিকে দেবার এবং ভক্তদের ব্যবস্থা করা। বিশেষত যেখানে ভাণ্ডী কাণ্ডী ঘোড়ার যাত্রীদের বিনা নোটিশে পদব্রজে পর্বতারোহণ করাচ্ছেন, সেই অংশে। ঐ দুটি শাদা ক্যানভাসের ক্ষুদ্র খোপের চেয়ে টের বেশি সংখ্যক ও বেশি উন্নত পার্মানেন্ট বাথরুমের আশু প্রয়োজন এবং যথেষ্ট মেথর চাই। পাবলিক কনভিনিয়েন্সের কোনোই সুবিধা নেই যমুনোত্রীতে। ছোট্ট জায়গা, বিস্তার লোক, খাড়া পাহাড়, পথহীন। বনবাদাড়েও যাওয়া যায় না। নদীর পাড় উন্মুক্ত। লোকে করবেটা কী? সরকারের উচিত যমুনোত্রীতে একটা ট্যুরিস্ট রেন্ট হাউস জাতীয় বিশ্রামস্থল করা। নিদেনপক্ষে বিড়লা শেঠজী তো এদিকে তাকাতে পারেন? অথচ এই অঞ্চল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের দ্বারা সুরক্ষিত। মোটর রাস্তাগুলি বি. এস. একের তৈরি। এক্ষুণি কেন্দ্রীয় সরকার মহারাজ ইচ্ছে করলেই যমুনোত্রীর রাস্তা উন্নয়ন সম্ভব। মিলিটারি লাগিয়ে যমুনোত্রীর ওখানে একটি সিমেন্টের নাটমন্দির গোছের চাতাল অন্তত বানিয়ে দিতে পারেন, যেখানে ক্লান্ত সাধুসন্ন্যাসীরা এবং যাত্রীরা ঝড় বৃষ্টি বরফ রোদ্দুরের হাত থেকে বাঁচতে পারবেন। কী অসামান্য পথশ্রম সহ করে গ্রাম্য বৃদ্ধবৃদ্ধাদের এই তীর্থযাত্রা! চোখে না দেখলে টেরই পেলুম না, এ ব্যাপার যে আজও ঘটে।

যমুনোত্রীই হয়তো বা একমাত্র জায়গা, যেখানে “কৃচ্ছসাধন” শব্দের অর্থবোধ হয়। অথচ যাত্রাশেষে তীর্থের প্রার্থিত শান্তির স্বাদ আমি অন্তত পাইনি। অত্নদের কথা জানি না। তাঁদের মূল্যবোধের থেকে হয়ত আজ আমি দূরে চলে এসেছি। আমার যতটা অসহ লাগছে, শ্রীহীন, প্রীতিহীন, ভক্তিহীন ব্যবসাসর্বস্ব একটা অস্বাস্থ্যকর দমবন্ধ পরিবেশ মনে হচ্ছে, তাঁদের তেমন মনে না হতেও পারে। অন্ধ-বিশ্বাসের আকিম তাঁদের থাইয়ে রেখেছি আমরা।

তবুও, ওঁরা নিশ্চয়ই বিশ্রামাগার, শৌচাগার, স্নানের জন্ম ঢাকা ঘরের দাবী করতে পারেন। না পেয়ে না পেয়ে ওঁরা চাইতে ভুলে গেছেন। গ্রামে যেমন কষ্ট করে বাঁচেন সেই ভাবেই মানিয়ে নিচ্ছেন। জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে আধাআধি ভাগ করে নিচ্ছেন তীর্থযাত্রার অভিজ্ঞতা। 'যেদিকে বেশিটা যায় যাক। ভয় কি? উত্তরাথও মৃত্যু হলে সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্গ। এই তো মহাপ্রস্থানের সেই পথ। কাশীতে মরলে তবু তারকব্রহ্ম গুনতে হয় কানে, তবে মুক্তি হয়। এখানে ও-সবেরও নাকি দরকার নেই। এহ বাহু। এখানকার শুদ্ধ বায়ুই কানে তারকব্রহ্ম গুনিয়ে দেয়।

৩১

### “সব চেয়ে ভালো পা-গাড়ি”

ফেরবার পথে আমরা হেঁটেই নামলুম জানকীচটি পর্যন্ত। লাকড়ি না থাক, আমার লড়কি ছিল সঙ্গে, রঞ্জন আগে আগে একা একা নেমেছে। এই হেঁটে নামার সময়ে আমি পথের সৌন্দর্য দু'চোখে পান, লেহন ও চর্বণ করতে করতে এসেছি। এখন তা স্মৃতিতে চোখে রূপান্তরিত।

জানকীচটিতে এসে বেজায় থিড়ে। আমাদের ঘোড়াগুলারা আগেই হাজির। রবীন্দ্র সিং একটা ছোট হোটেলে বসে 'ডালরোটি' খাচ্ছে। দেখে আমরাও সেখানে যাই। চমৎকার ডালফ্রাই, নরম রুটি, আর গরম আলুর কোল। এবং, চা। আঃ! দারুণ! থেতে থেতে রঞ্জন বলল, তার এবার বাহন চাই। জুতো পরে পায়ের একটা লম্বা নখ ওর একটা আঙুলে ঢুকে গেছে, ভীষণ ব্যথা করছে। ঘোড়া জুটলোও জানকীচটি থেকে, (খচ্চর না, ঘোড়াই) গোটা ত্রিশেক টাকাতে।

খচ্চর থেকে নামলেই আরাম। পথে একবার চা থেতে থেমেছি, চা নয় নামাই উদ্দেশ্য। জায়গাটির কোনো নাম নেই। চটি নয়, পথযাত্রীদের জন্ম চা, পকৌড়ার দোকান। কিছু গাছপালা, পাথর-টাথর আছে। বড় পাথর খুঁজে যেখানেই বসতে চেষ্টা করি হাঁ করে কুন্দন সিং বলে, “বোসো না, বোসো না, ওখানে ঘোড়ায় পিশাব করেছে।” ধুন্তোর, ঘোড়াদের কি মন্দ স্বভাব রে বাবা! শেষে দাঁড়িয়েই চা খাচ্ছি। হঠাৎ দেখি সেই গৌঁজেল সাধুটি এবার নামছেন। যথারীতি কন্ধে হাতে বসে আছেন। আমি দৌড়ে কাছে যাই।

“সাধুজী? আপ কাঁহাসে আয়ে হে?”

“মালুম নহী।”

“কিধর যায়েঙ্গে আপ?”

“মালুম নহী।”

মিষ্টি করে হাসলেন, কঙ্কেতে মুখ দিয়ে চোখ বুজে ফেললেন। আরেকজন সাধু চা খাচ্ছেন।

“সাধুজী, আপ কাঁহাসে আয়ে হেঁ?”

“মাদরাসেসে।”

“কিধর যানা হ্যায়?”

“গঙ্গোত্রীধাম।”

“আপ কিধর ঠাহরতে হেঁ?”

হাত উলটে হাসলেন। হাতে বালতি আর পুঁটলি। আজকাল সাধুদের সাজবদল হয়েছে। ধাতুর তৈরি কমণ্ডলু দেখা গেল না একটাও। ছ’একজনের হাতে লাউয়ের কমণ্ডলু অবশ্য আছে। একজন কৌকড়াচুল স্মার্ট গেরুয়াধারী সাধুকে মাঝে মাঝেই দেখেছি লাঠি হাতে লাকিয়ে লাকিয়ে আমাদের পেরিয়ে যাচ্ছেন। এবারেও দেখি তিনি নেমে যাচ্ছেন। গায়ে নীল প্রাক্টিকের রেনকোট। সঙ্গে অল্পরূপ রেনকোট শোভিত চেলা।

চৌচালুম, “সাধুজী, আপ কাঁহাসে আতে হেঁ?”

“দেওবর থেকে।” বলে এক লাফে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মোটেই এতক্ষণ টের পাইনি তিনি বাঙালী। গৈরিক আর জটাঙ্গুটের মধ্যে কে মাদ্রাজী কে বিহারী কে বাঙালী বোঝার কোনো উপায় নেই। ভাষাও সবাই ভাঙা হিন্দি। সাধুরা অবিশি একদম বাইরে এক, আর একদম ভিতরে এক—মাঝখানে নানান ভেদ-বিভেদ। মঠ-মন্দিরে বড় ক্ষমতার লোভ, কাড়াকাড়ি, দলাদলি। দেখেছি তো। ভগবান নিশ্চয়ই শত হস্তেন দূরে থাকেন যাবতীয় ধর্মের মঠ-মন্দির থেকে। কিন্তু উত্তরাখণ্ডের এই শীতের মধ্যে ঘাম ছোটানো রাস্তায় সাধুদের বিষয়ে অভিজ্ঞতা একেবারে আলাদা। এখনও পর্যন্ত কেউ ভিক্ষে চায়নি। শতচ্ছিন্ন বস্ত্রে যাত্রীরা উঠছেন, প্রায় বস্ত্রহীন সাধুরা উঠছেন, কারুর কিছুই চাইবার নেই। মালুয়ের কাছে হাত পাতবার নেই। অগ্ন্যাগ্ন তীর্থের চেয়ে অনেক আলাদা। সায়নচটিতে যে পাণ্ডাকে দেখলুম, তার ছেলে যমুনোত্রীতে মন্দিরে হয়তো পূজো দেন, কিন্তু পাণ্ডার অত্যাচার নেই। নিজেই তো পিকো গিয়ে পূজারীর হাতে পূজো দিয়ে এলুমিস্টার মুখার্জীর নামে। একমুঠো ফুটকড়াই ভাজা গ্যাকডায় বেঁধে প্রসাদ দিয়ে বাকী সব কিছু নিয়ে নিয়েছে মন্দিরে। বুঝলুম, রি-সাইক্লিং হয়ে আবার দোকানেই ফিরবে। যেটুকু মন্দিরের সঙ্গে যোগ, সেইটুকু নিতেই আছে অসাধুতা, ব্যবসা বাণিজ্য, অধর্মীয় আচার। আশ্চর্য!

## নৌকর হায়

—“ভোক লাগা, বেরা?”—“নহী।” সারাপথ এত যত্ন করছিল কুন্দন সিং রবীন্দ্র সিংকে, পিকো জিজ্ঞেস করলে, “তোমার বাবা?” রবীন্দ্র সিং ঘেমার সঙ্গে বললে, “ও? বাবা কেন হবে? ওকে আমি চিনিই না। নৌকর হায়।” কুন্দন সিং তখন আমাকে বলছে—“রবীন্দ্র সিং কখনো যমুনাত্রী যায়নি তাই ভাবলাম নাহাকরু লায়েঙ্গে। এই প্রথম ট্রিপ, বাচ্চা ছেলে। ঘোড়া সামলাতে পারবে কিনা কে জানে তাই ওকে যমুনীর সঙ্গে দিচ্ছি। যমুনীর কোনো ঘোড়াওলা লাগে না। মোহনের বয়স অল্প, ওর সঙ্গে আমি আছি।” এতে আমিও খুশি কেন না মোহনের পিঠেই আমার মোহিনীটি বসে আছেন।

রবীন্দ্র সিং রঞ্জনের সেই গুরুমহারাজের ভাইপো। ওদের নানা ধরনের ব্যবসা, হোটেল আছে, কার্টের গুদাম আছে, ঘোড়া খচর আছে আর আছে অহংকার। রবীন্দ্র ক্লাস সেভেনে পড়ে, কুন্দন সিং স্পষ্টতই তার খচর শাস্ত্রের গুরু। পদে পদে শেখাচ্ছে কখন লাগাম আলগা করবে কখন কষে ধরবে, কখন ডাইনে ছুটতে হয় কখন বাঁয়ে, কখন জানোয়ারকে জল খেতে দেবে কখন দেবে না। অথচ রবীন্দ্র সিংয়ের কাছে তার পরিচয়—“নৌকর হায়”।

একটি মানুষকে হঠাৎ সামনে দেখে ভয়ানক অবাক হয়ে গেলুম। একটু আগেই কুন্দন সিং এক খচরওয়ালাকে বকেছে—পিঠে বেশি বেশি মাল চাপিয়েছে বলে—“জানবরকো মারু ডালগা, ক্যা? জরাসা দিল্ লগা কর দেখ লো তো—উসকা কিতনা তক্লিফ হো রহা?” এই মানুষটির পিঠে তার চারগুণ বেশি মাল। সে বেকে আধখানা। দ-এর মতো হয়ে হাঁটছে। এত মালপত্র একজন কুলির নেওয়া উচিতই হয়নি। তিনজন কুলির মাল। মানুষের এত অপমান! যেন ক্রীত-দাসদের যুগের নকল দৃশ্য দেখছি—এ আমার সহ্য হয় না। রঞ্জনের ঘোড়া অত্যন্ত টিমতেতালায় ঝুঁড়িয়ে গড়িয়ে পেছনে পেছনে আসছে। আমাদের খচরগুলি ঘরে ফেরার উল্লাসে দ্রুত পায়ে পথ অতিক্রম করছে। হল্পমানচটি থেকে আরো চার কিলোমিটার ওদের বাড়ি।

“কুলিটা অত বেশি মাল বইছে, কত বেশি টাকা ও পাবে, কুন্দন সিং?”

“কত আর পাবে? এই আড়াইশো মতন! ভালই পাবে বলে মনে হচ্ছে ঐ পাহাড়প্রমাণ মাল দেখে। ঠিকসা খানাভি নহী খাতা, একরোজ মর যায়েগা শালা বুদ্ধু।” ওর পুরো চেহারাটাই বলছে, “নৌকর হায়”।

### পদ্ম লঙ্ঘনতে গিরিম্

আমরা যখন নেমে এলুম, দেখি রোগা একটি সাধু উঠছেন তখন—তঁার চোখের দৃষ্টির তীব্রতা মনে থাকার মত। একটিমাত্র পা। হুঁহাতে একটি দীর্ঘ লাঠি ধয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে যাচ্ছেন। অনায়াসে। কোথা থেকে আসছে এই শক্তি? হুঁপায়ে এবং ছুঁপায়েও যে আরোহণ কঠোর ক্রুদ্ধ, এর চলার ধরনে তা মনেই হোলো না। আমি আর পিকোলো হুঁজনেই কিছুক্ষণের জ্ঞান কথা বলতে পারলুম না আর।

হুমানগঙ্গার কাছেই হুমান মন্দির হচ্ছে। তাঁবু পেতে কিছু সন্ন্যাসী বসে আছেন ধুনি জ্বলে। খচর থামিয়ে মুখে চিনি-প্রসাদ ধরে দিলেন। আগে খচরকে খাওয়াছেন।—“আ বেটা, বহুৎ পরেশানি ছয়া তুঝাকো?” তার পরে সন্ন্যাসীকে। তারপর থালাটি পাতছেন। সাধুর মাথায় মাংসিক্যাপ, পায়ে হাণ্টার জুতো। হিউয়েন সাং-এর মত দেখাচ্ছে। যমুনোদ্রী যাত্রায় এষ্ট প্রথম থালা। মন্দির নির্মাণের চাঁদা। পুণ্যার্জন করে ফেরার পথে এঁদের কেউ বিমুখ করতে পারছে না। শেষে ঐটুকু কার্পণ্যের জ্ঞান না পুণ্যে খুঁত পড়ে যায়।

যখন আমরা বরকোটে পৌঁছোলুম, নড়তে চড়তে কষ্ট হচ্ছে। হুমানচটিতে আর না থেমে সোজা বরকোটে। সেই বাঙালী ছেলে দুটি বলেছিল ১৫-তে ডবল বেডওয়ালা ঘর আর ৫-তে গরম গরম মাংস ভাত পাওয়া যায় বরকোটে।

### অত্মত্যাগনের সন্ধান

সূর্যাস্তে উদ্ভাসিত শান্ত স্থলী বরকোটে পৌঁছে দেখি ট্যুরিস্ট লজটি বন্ধ। স্ট্রাইক চলছে। ওদেরই একজন সঙ্গে এসে একটি হোটেল দেখিয়ে দিল। গাড়ি থামলেই পিকো খুব খুশি হয়। যতক্ষণ গাড়ি চলে পিকোর মেজাজও ক্রমশ পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করে। যতই গা গুলোয়, মাথাও তত গরম হয়। বর্নায় বর্নায় তোয়ালে ভিজিয়ে তার মাথা ঠাণ্ডা করতে করতে ভয়ে ভয়ে যাওয়া হচ্ছে। যমুনোদ্রী থেকে বরকোটে আসার পথে স্নোভিউ যতবারই দেখি, অমনি “ঐ ত্যাগ ত্যাগ” করে আমি টেঁচিয়ে উঠি। পিকো বিরক্ত হয়ে বলে—“আমাকে নিজে নিজে দেখতে দাও তো? অত টেঁচামেচির কী আছে?” স্বভাবই যে আমার আহ্লাদে টেঁচামেচি করা। “কিছু” থাক বা না থাক। আমার বাবার মতন।

বরকোটের হোটেলটা মন্দ নয়। দোতলায় জোড়াখাটুলা ঘর। একটা নেয়ারের খাটিয়া দিয়ে দিল রঞ্জনের জগে। কুড়ি টাকা সব মিলিয়ে। পানের গরম জল নিলে বালতি প্রতি দু'টাকা। তিনটে লেপ দিয়ে দিল, দু'টাকা করে। চা একটু দামী। ষাট পয়সা। যমুনোত্রীতে সস্তর। জানলা আছে পর পর তিনটে। খুলে দেখি হিমালয়ের ছায়ামূর্তি চাঁদের আলোতে স্থির হয়ে আছে। জানলাবন্ধ করতে ইচ্ছে করল না। বরকোটে খুব বেশি ঠাণ্ডা নেই। মশারিও অবশ্য নেই। তবে মাছির উপদ্রবটাই দেখা গেল উত্তরাখণ্ডে বেশি। মশা নেই তেমন। ঝুপ করে বাতি নিবে গেল। অমনি চেঁচাই।—“রঞ্জন, ভালো করে মোমবাতি নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখে নে বাবা ঘরে আবার টারানটুলা মাকড়সা আছে কিনা?”

“টারানটুলা কেবল আফ্রিকায় হয় মা। এখানে কেমন করে আসবে?”

“কিন্তু এসেছিল তো। হুমানচটিতে আসেনি কি?”

“সেটা টারানটুলা কে বললে?”

“যা হোক একটা নাম দিতে হবে তো?”

ঘরে পোকামাকড় ছিল না। বিজলীও মিনিট পনেরের মধ্যে ফিরে এল। হোটেলের নিচেই খাবারের দোকানে ডালফ্রাই মাংস রুটি দই খেতে তিনজনের কুড়ি টাকা লাগলো—এবং চা।

খচ্চর পিকোকে একটুও কাহিল করতে পারেনি। কিন্তু রঞ্জনের আর আমার মারা গায়ে ব্যথা। রঞ্জন বেরলো অশ্রুতাজনের সন্ধানে। পিকোকেও বললুম ঘুরে আয় ফাঁকা হাওয়ায়। আমার তো নড়ার শক্তি নেই। ওরা এসে বলল দোকানে অশ্রুতাজন তো আছেই, ক্যাসেট টেপও আছে। লতা, হেমন্ত, মেহদী হাসান, গুলামালি। ‘আর যাব না আর যাব না যমুনায় জল আনিতে’।

শুধু যমুনা কেন? অশ্বপুষ্ঠে কোথাও যাব না। কেদারনাথ আউট হয়ে গেলেন। ঐ চোদ্দ কিলোমিটার হেঁটে-ওঠা আমার সাধ্য নয়। ডাণ্ডী চড়তে রুচিতে বাধে। কাণ্ডীর প্রশ্ন নেই। অতএব কেদার হল না। কুরুমাধন না করলে তীর্থভ্রমণ হয় না, তা কুছ দিয়েই শুরু হল যাত্রা। চারধাম হল না, তিনধাম।

সাহেবরা এত আরামের ব্যবস্থা করে রাখে, যে আরামে ডুবে বসে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য নিয়ে মুগ্ধ হবার স্বেচ্ছা হয়। হয়তো ওরা থোলসটার আরামের ব্যবস্থা করে বলেই আত্মার দিকে আপনি নজর গিয়ে পড়ে। আমরা থোলসটার কথা না ভেবে শুধু আত্মার কথাই ভাবছি—ফলে থোলস বলে—“আমাকে দেখ”—বলে সবটা মন টেনে নেয়। অধ্যাত্মর দিকে আর যেতেই দেখ না। মেটেরিয়াল কম্ফর্টস মোটেই ইম্মেটেরিয়াল নয়, প্রাথমিক পরিচয়ে শরীরধারী জীব তো আমরা।

### ব্রহ্মখাল, ধরাসু ড়ুন্ডা

বরকোটের ভোরবেলা মোরগের ডাকে ঘুম ভাঙলো। ঘরে বসেই পর্বতের সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করলাম। যতবার দেখার সৌভাগ্য হয়, ততবারই ধন্য বোধ করি। হোটেলে একজন পাঁড়েজী আছেন, খাটিয়া থেকে বেড-টী পর্যন্ত তিনিই সাপ্লাই করেন, গরম জল এল। অন্ধকূপ বাথরুমে স্নান সেরে ফের গরম ভাত, মাংস, ভিণ্ডিকা সবজি, ডালফ্রাই, দই খেয়ে রওনা হয়ে পড়ি।

বরকোট থেকে প্রচুর ঝাউবনের মধ্য দিয়ে পথ। আর একটু পেরিয়েই অপরূপ স্নো-রেঞ্জ দেখা যায়। বেশ অনেকক্ষণ। বরকোট থেকে প্রায় ব্রহ্মখাল পর্যন্ত এই ঝাউবন-ঘেরা পথ। মাঝে-মাঝে আশ্চর্য সুন্দর ঝর্ণা।

সারাটা পথ রাস্তায় শুধু সাধুদের হাঁটতে দেখেছি। হিমালয় সত্যিই সাধু-মন্ডির স্থান।

মোটরের রাস্তা বেয়ে সমানেই একা একা ধাঁরা হাঁটছেন, তাঁদের বগলে একটু-খানি কব্বলের পুঁটলি, হাতে একটি ঝুলন্ত জলপাত্র। লোটাকম্বল। কমণ্ডলুকে রিপ্রেস করেছে অ্যালুমিনিয়ামের 'হারা'। তোমরা সাধুরাই আমাদের পথসঙ্গী। যদিও আমরা তোমাদের পথসঙ্গী নই। যদিও তোমরা আমাদের দিকে ঘেঁরা করেও কিরে তাকাবে না, জানি এই নীলপর্দাওয়া শাদা গাড়ির সঙ্গে মিলিটারি ট্রাক আর ঝড়ঝড়ে বাসের কোনো প্রভেদ নেই, তোমাদের কাছে সবই এক, সবই এহ বাহ। তবু, তোমরা জানো না এই যে ঝাউবন, এই যে ঝর্ণা, তোমরাই এদের আলাদা করেছে, জ্যোতির্ময় করেছে। এই তোমাদের গৈরিকের ছোওয়া লেগেই এই সব গ্লেশিয়ার আলসের আর আন্দেজের ধবধবে গ্লেশিয়ারের চেয়ে অনেক বেশি স্তব্ধ। আমার চোখের বাইরেই শুধু থেকো না। এসো ভেতরে এসো। এই গাড়ি, এই আরাম, এই পর্দা, এ আমার নয়। এ আমার গায়ে ফুটেছে, তোমরা জানো না তোমরা জানো না। আমারও আছে তোমাদের মতোই লোটাকম্বল, আছে জটাজুট। পূর্বাশ্রমের পরিচয় বিসর্জন দিয়ে আমিও এখন নতুন জন্মে—। কেবল একটু সময়ের অপেক্ষা। দেখা হবে। একদিন সমানে সমানে দেখা হবে। এমনি মেঘের আলোছায়া ভরা ঝাউবনের পথে, এমনি ঝর্ণার ধারে। দেখা হবে। এ তো তারই প্রস্তুতি। সবাই তো লালাবাবুর মতো ডাক শুনতে পায় না। আর কেউ কেউ ডাকাডাকি শুনেও কানে হাত চাপা দিয়ে থাকে।

একটা প্রচণ্ড ঝর্ণায় বাচ্চা পাহাড়ী ছেলেরা স্নান করছে। হঠাৎ দেখি ঝর্ণা



বেয়ে পাথরে পা রেখে রেখে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছেন এক সন্ন্যাসী। হাতে জলপাত্র। শুদ্ধতার আশায়। এই বর্ণা বেয়ে ওঠাই আমাদের একমাত্র উপায়। উৎসের সন্ধানে ওঠা।

বাউবনের ছায়ায় মাটিতে পথের ধারে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সুখী গের্জেলরা। চোখ উদাস, গাড়িতে, গাছে, মেঘে উড়ে বসছে কি বসছে না।

উত্তরাখণ্ডে এসে ইস্ট ইউরোপ আর রুশদেশের সঙ্গে একটা বড় মিল চোখে পড়ল। দেওয়ালগুলি ফাঁকা। কোথাও কোন বিজ্ঞাপন নেই। একমাত্র সরকারি বিজ্ঞাপন “দো ইয়া তিন” ছাড়া।

এইখানে অবশ্য মালুম হয় স্থানমাহাত্ম্যটি। ওদেশে দশ ছেলের মা সোনার মেডেল পায়। একটু ভুল হলো—ছিল, হাতে লেখা বিজ্ঞাপন ছিল বটে একটা। প্রত্যেক গ্রামেই কোনো না কোনো দেয়ালে হয় পূর্ণবিড়ি নয় তো পাবনাবিড়ির বিজ্ঞাপন। হঠাৎ ডুনডা গ্রামে একটি দোকানে দেখি “জেন্টেলম্যানস টেলারিং শপ্”—এ বসে বসে পায়ে সেলাইকল চালাতে চালাতে ট্রানজিস্টার শুনছে একটি ছেলে, দেয়ালে মস্তবড় অমিতাভ বচ্চন গোমড়ামুখে চেয়ে আছেন। এই প্রথম ট্রানজিস্টার, বোম্বাইচিত্র। সেলাম ডুনডা!

ধরাস্তর কাছ থেকেই নদী পাথরে পাথরে ধবধবে শাদা, ফুটন্ত দুধের মতো উথলোচ্ছে। বাবা-মার সঙ্গে যখন ইন্টারলাকেন গিয়েছিলুম, ট্রেনের ধারে ধারে ঠিক এমনি একটা দুধশাদা বর্ণা নদী ছুটছিল। আমার সঙ্গে মনে মনে তার সখিস্ব হয়ে গিয়েছিল। একসময়ে ইন্টারলাকেন এসে গেল। ট্রেন থেকে আমি নেমে এলুম। উন্নত নদী ছুটেই চলল। বৃকের মধ্যে মন-কেমন-করা নিয়ে চললুম। হোটলে পৌছে ঘরের জানলা খুলেই—কী দেখি? আমার জানলার নিচে দিয়েই হাসতে হাসতে ছুটে যাচ্ছে আমারই সেই প্রিয় সখী—ফুটন্ত দুধের নদীটি! এতটা আনন্দ জীবনে কবার হয়? হঠাৎ শাদা নদী দেখে সেই কথা মনে পড়ে গেল!

৩৬

### বেরিয়ে পড়লুম ভগবানের নাম করে

উত্তরকাশী নামটা আমাকে চিরকাল টেনেছে। উত্তরকাশী, গুপ্তকাশী, যোশীমঠ—নামগুলোই যেন গৈরিক অক্ষরে লেখা। উত্তরকাশীর গৈরিকা গঙ্গা হ্রদীকেশের স্বচ্ছ তরুণীটির চেয়ে বহুগুণ বেশি চঞ্চলা, বরকোট থেকে ধরাস্ত, ধরাস্ত থেকে ভাগীরথীকে ধরে ফেলে উত্তরকাশী।

ডুনডার পর মাতলিগ্রামের মস্ত সৈন্স শিবির সঙ্গেও ভাগীরথী তীরের অসহ

সৌন্দর্য নষ্ট করতে পারেনি। উত্তরকাশী ট্যুরিস্ট লজে একটা বাজে ঘর পেলুম। বাজারের মধ্যে বাস স্টেশনের গায়েই ট্যুরিস্ট লজ। জায়গাটির নিসর্গশোভার মূল্য শূন্য, কিন্তু স্থবিধে অনেক। যাত্রা বাসের যাত্রী তাঁদের হাঁটতে হবে না। উখীমঠের দিকে রাস্তাটা যত উঠে যাচ্ছে, গঙ্গার তীরে একের পর এক সাধুর আশ্রম। পুরাণের গল্পে এই উখীমঠেই উষা-অনিরুদ্ধর ভালোবাসা গড়ে উঠেছিল। অনেক বয়স্ক বাঙালী যাত্রী দেখলুম, যে যার গুরুদেবের আশ্রমে বেড়াতে এসেছেন। উত্তরকাশীই তাঁদের গন্তব্য, চারধাম নয়। একজন সাধুকে বিশ্বনাথ মন্দিরের পথ জিজ্ঞেস করলুম। তিনি ইংরিজিতে উত্তর দিলেন। নিজেই কামাখ্যা থেকে এসেছেন। অসমীয়া! উত্তরকাশী চেনেন না। উত্তরকাশীতেও বিশ্বনাথ মন্দির আছে। আমরা গেলুম মিস্টার মুখার্জীর নামে পুজো দিতে। মিসেস মুখার্জী তার দিয়েছেন। বিশ্বনাথ মন্দিরটি ভেঙে গিয়েছিল, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেশ শান্তিপূর্ণ। অনাড়ম্বর। জনমানবহীন ধূপ ধুনো ফুলের গন্ধগুলা বড় উঠোন, ইদারা, বেলগাছ, টগরফুল; করবীফুলের গাছ। ভারী সুন্দর অতি সাধারণ। না আছে ইতিহাসের গৌরব, না শিল্পের দম্ব, কেবল দেবতাটুকুই তার সর্বস্ব।

আমি মন্দিরের মধ্যে যাচ্ছি না। রঞ্জনকে বললুম, “যা, পুজোটা তুই দিয়ে আয়।” এক বৃদ্ধা বসেছিলেন সিঁড়িতে। বললেন, “বেটি, কোথা থেকে আসছো? যাবে কোথায়?” চারধামযাত্রী শুনে বললেন, “গোমুখে যেও না যেন। খুব কষ্ট হবে। আমার নাতি কালই ফিরেছে, পা ফুলে নীল। প্রচণ্ড বরফে পা জমে যাচ্ছে। বেটি, গোমুখ নাহি যানা। এবার ওদিকে যাও—সঙ্কটমোচনের মন্দিরে পুজো দিয়ে এস। তাঁর কাছে যা চাইবে তাই মিলবে।” ওদিকে যে আরেকটাও মন্দির আছে, বুঝিনি। ভিতরে গিয়ে দেখি মস্ত হস্তমান মন্দির। সঙ্কটমোচনের মন্ত্র লেখা দেয়ালে। কাশীতেও সঙ্কটমোচনের মন্দির দেখেছি, নোঁকো থেকে নেমে। ভারী সুন্দর সে মন্দির। বিশ্বনাথ মন্দির থেকে বেরুতে যাব, দেখি সেই দেওঘরের বাবাজী ঢুকছেন। সঙ্গে চারজন সোয়েটার ট্রাউজার পরিহিত যুবক বাঙালী চেলা।—“এই যে, দেওঘরের বাবাজী!” মস্তিষ্ক কিছু ভাববার আগেই আমার জিব কাজ করে।—“কবে এলেন?”—“আজই!” বলেই বাবাজী চলে যাচ্ছিলেন। আমি আবার চেপে ধরি। “গঙ্গোত্রীতে কি যাচ্ছেন? কেদার বতী?”—“নিশ্চয়ই। আপনারা?”—“আমি তো ভাবছি ফিরে যাব কিনা? সোজা বতীনথ হয়ে বাড়ি। যমুনোত্রীতে বড় কষ্ট হয়েছে।” অবাক হয়ে বাবাজী বললেন, “সে কি? ফিরে যাবেন কেন? গঙ্গোত্রীতে কোনো কষ্ট

নেই। পুরো রাস্তা বাস পাবেন। মাঝে তিন কিলোমিটার কিছুতেই বাগ মানাতে পারেনি। সেটুকুই হাঁটা। কষ্ট হয় না। আর কেদারনাথ না গিয়ে যাত্রা সম্পূর্ণ হয় কখনো? কেদারের পথ যমুনোত্রীর চেয়ে ভাল। বেরিয়ে পড়ুন তো ভগবানের নাম করে, কিছু হবে না। ঠিকই পেরে যাবেন।” বলেই তিনি পালালেন।

সন্ধ্যাবেলায় তারপর গঙ্গার একটি বাঁধের ওপরে বসে বসে চা ডালমুট বিস্কুট খাচ্ছিলুম। স্বরথ সিং একটা সময়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে গেলাসে করে জল এনে হাতে দিল—“গঙ্গামায়ী।” স্বচ্ছ তুহিনশীতল। চোখে মুখে মাধব দিলাম। বাঁধের নীচে বড় বড় পাথরে ঘুরে ঘুরে যে উদ্দাম, উত্তাল জলশ্রোত ছুটছে, তার রং কিন্তু গেরুয়া। স্বর্ষের অন্তগমনটি দেখা হল না, পাহাড়ের পিছনে ঘটে গেল। জলের রংয়ে তার ছায়া ধরা পড়ল এইমাত্র—যেন তাম্রপত্রের মত আকাশ আর গঙ্গা।

৩৭

### মরণ বলে আমি তোমার জীবনত্তরী বাই

রাত্রে দেখি ট্যুরিস্ট লজে একদল বঙ্গসন্তান। যমুনোত্রীতে এদের সঙ্গেই দেখা হয়েছিল। কবে এলেন? কোথায় যাচ্ছেন? ইত্যাদির পরেই তাঁরা বললেন, “জানেন তো সেদিন কী কাণ্ডটা হলো! আপনারা তো অনেক আগেই চলে এলেন। রুষ্টিতে পথের সে যে কী অবস্থা!”

মহোৎসাহে এক মহিলা বললেন, “অ্যাক্সিডেন্ট। বিরা-ট অ্যাক্সিডেন্ট। সেই তো রুষ্টি শুরু হল, আমাদের ফিরতে রাত্রি হয়ে গেল। বেশ অন্ধকার। কী কষ্টেই যে ফিরেছি! তারই মধ্যে একজন পাঞ্জাবী মহিলা ঘোড়াহৃদ, সহিসহৃদ, খাদের মধ্যে পড়েই গেছেন। আমি তাঁকে দেখিনি, তবে দুটি ছোট ছোট ছেলে বড়িকে খুঁজছিলো দেখলাম। তাদের নাকি ঠাকুমা। তাইতে জানলুম। কী কেলেকারি ভাবুন! পরপর দুদিন। আগের দিনই একটা বাচ্চা মেয়ে গেছে। এদিন গেল ফের এই মহিলা। তা, বয়েস হয়েছিল যথেষ্ট, শুনলাম। ভালই গেছে, উত্তরাখণ্ডে মরলে নিশ্চিত স্বর্গবাস। সঙ্গে নাকি ছেলেও আছে।”

পাছে পিকোলো গুনতে পায়, আমি খবরটা চেপে গেলুম।

“এমন জানলে কখনো আসতুম না, আসতুম না! মরবো। আমি এ যাত্রায় নিশ্চয় মরবো। আমার ছেলে? আমার ধলে?”

এখন তো আমার পর্বতশিখরে নেই। তবে বৃকের মধ্যে এত অসম্ভব চাপ

লাগছে কেন ? এই কি উচিত, হে বিরাট উদার হিমালয় ? একটি কচি প্রাণ, একটি দরিদ্র প্রাণ, একটি ভীকু প্রাণ কেড়ে নিয়ে তোমার কী উপকারটা হল ? থাক। তীর্থ তীর্থ বৃথা ভ্রমণে আর যাবো না। মন তো কেবলই ধাক্কা খাচ্ছে। লোভী যমুনা, তোমাকে মা বলে ডাকবো না।

৩৮

### ম্যাগনেটিক ফীল্ড

তবুও খেতে গেলুম ক্যান্টিনে। পিকোকে না নিয়েই। ও শুনেছে কিনা বুঝছি না, শুয়ে পড়েছে। বলছে মাথা ধরে আছে। রুটি, ভিড়িকা সবজী, ডাল-জলিয়ার চিরাচরিত থানা অর্ডার দিয়ে বসে আছি। ওদিকের টেবিলে দুটি মার্কিনী যুবতী তর্ক করছে। পরনে সালোয়ার কামিজ। কিন্তু হিপি বলে মনে হয় না। খাওয়া শেষে ওদের কাছে গিয়ে বসলুম। অস্টিন আর হান্না ওদের নাম। আমেরিকার মধ্য পশ্চিম থেকে এসেছে। অস্টিন কাজ করত প্যানঅ্যামে। সে কুমারী, প্যানঅ্যামে ছাঁটাই হয়েছে। হয় ১৮ মাস দেশবিদেশে ঘুরে বেড়ানোর দুটি টিকিট নয়তো কিছু টাকা ওদের ক্ষতিপূরণ দিচ্ছিল, ও নিয়েছে দুটি টিকিট।

দুই বোনে বেরিয়েছে। হান্না আর্টিস্ট। বিয়ে করেছে ৬/৭ বছর। স্বামী জাপানী ছাত্র। সে শুধুই নামেমাত্র অধ্যয়ন করে যাচ্ছে। পড়াশুনো আর শেষই করে না। চাকরি-বাকরি ও করে না। কিছুই করে না। হান্না এবারে ডিভোর্স চেয়েছে। তাতেও সে রাজী নয়। তাহলে আমেরিকার ভিসা নিয়ে গুগুগোল হবে। থাবেই বা কী উপায়ে ? ওর কোনোই উপার্জন নেই। তাই হান্না ছুটিতে বেরিয়েছে। ঘোর ঈশ্বরবিশ্বাসী। হান্না হিন্দু। নানান বিভূতিতেও সে বিশ্বাস করে। মার্কিন দেশেই হিন্দু গুরুজী পেয়ে সে হিন্দু হয়েছে। কিন্তু তার জাপানি স্বামী হিন্দু হয়নি। সে বৌদ্ধও নয়। সে ক্যাথলিক। ক্যাথলিকরা ডিভোর্স দেয় না। জাপানি ক্যাথলিক তো আরও খারাপ !

অস্টিন ঘোরতর মার্কিনী যুবতী। হিন্দু কৃষ্ণান সে কিছুই নয়। ধর্মকে সে 'সঙ্গম' করে। কিন্তু অস্টিন ডিভোর্স-টিভোর্স পছন্দ করে না। "আমি চাই সংসার, সন্তান, স্টেবিলিটি। এমন একজন পাত্র চাই, যে বেশী ব্রিলিয়ান্ট নয়, নেহাৎ সাধারণ। সৎ। বুদ্ধিমান। তার জীবনে আমিই হবো সবার আগে। প্রধান মাছ। নান্দার ওয়ান ইন হিজ লাইফ। ডোন্ট ইউ ওয়ান্ট টু বি নান্দার ওয়ান ইন সামওয়ান্স লাইফ ?"

অস্তরের কানে ঘণ্টাধ্বনির মতন আজও লেগে আছে অস্টিনের হঠাৎ করিয়ে দেওয়া কঠিন সত্যের আতিটুকু। কে চায় না? কে না চায় জগতে আর একজন মানুষের জীবনে সবার আগে আসতে? প্রথম নামটি হয়ে ওঠার মহা সৌভাগ্য অর্জন করতে? সম্ভানের মা হলে অবশ্য কিছু দিনের জন্য এ সৌভাগ্য ঘটিয়ে দেন প্রকৃতি। কিন্তু ঐ। কিছুদিনের জন্যে। তারপর সম্ভানের জীবনে প্রথম নামটি অণু কিছুই। অণু কাকর।

“আমি বাপু স্বামী ত্যাগ করতে পারতাম না হান্নার মতো। ছেলেটা দোষ তো করেনি কিছু। কেবল বোরিং হয়ে গেছে। তার বেলায় হিন্দুয়ানা কোথায় গেল? হিন্দুরা কি স্বামীকে ত্যাগ করতে বলে?” অস্টিন তেরছা চোখে দিদিিকে শাসায়। আর্টিস্ট দিদিটি পরমা সুন্দরী। দীর্ঘ পেলব, লতানে শরীরে উদাস ছুটি বড় বড় নীল ফুলের মতো চোখ সপল্লবে ফুটে রয়েছে। “আমি স্বামী-সম্ভান নিয়ে সংসার করতে চাই, এদিকে বরই খুঁজে পাই না। হান্না সম্যাস নিতে চায়। সংসার গুর দু’চক্ষের বিষ। অথচ ওরই ঘরে স্বামী আছে। জ্বাখো তো মজাটা!”

“তা তুমিই হান্নার স্বামীকে বিয়ে করে ফেললে পারো?”

“এটা অবশ্য স্ট্রাইক করেনি আগে। আমার আবার ওসব জাপানী-টাপানীর প্রতি প্রণয় নেই কিনা। আমি অল্-অ্যামেরিকান মেয়ে, অল্-অ্যামেরিকান ছেলের কথাই ভাবি। এবার এটা ভেবে দেখতে হবে। অবশ্য হান্নার বরকেও আমি ঠিকই চাকরি করিয়ে ছাড়তুম, যদি সে ব্যাটা আমার বর হত!”

“আনন্দময়ী মাকে চেনো?” হান্না হঠাৎ বলল।

“আলাপ হয়েছিল। কেন বলো তো?”

“ওঁর ম্যাগনেটিক ফীল্ড সৃষ্টির ক্ষমতার কথা জানো?”

“ঠিক বুঝলাম না।”

“ওঁর সমাধিস্থলে ম্যাগনেটিক ফীল্ড তৈরি হয়েছে। আমরা কিছুতেই সরে আসতে পারছিলাম না, পা ছোটো যেন কেউ জোর করে আটকে রেখেছিল মাটিতে। আমি আবার যেতে চাই কন্থলে। ওখানে থাকতে চাই। মা আনন্দময়ীকে তুমি দেখেছো? তুমি কী ভাগ্যবতী!”

ওদের ভাঃ ত্রিগুণা সেনের ঠিকানা দিয়ে বললুম কন্থলে কোন দরকার হলে যোগাযোগ করতে পারে।

## জাঠ, গুর্জর, গাঢ়োয়ালী

উত্তরকাশী থেকে যাত্রা সোজা হিমালয়ের শিখর অভিমুখে। লংকাচটির পথ কিন্তু হতুমানচটির মতো নয়। নগরী—বরকোট হয়ে রাণাটি যমুনোত্রীর পর্বতের পায়ের কাছে পৌঁছে দেয় আমাদের, ভাটওয়াড়ী গাঙ্গনানী হয়ে লংকাচটিতে পৌঁছে দেওয়া পথটি তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। এ পথে গ্রাম, বন, ঝর্ণা, নদী সবই ঢের বেশী বেশী। এবং স্নো-ভিউও। পথের একপাশে প্রবল কলোচ্ছ্বাসে গভীর খাদ কেটে ভাগীরথী বয়ে যাচ্ছেন। পিকোলো বললে, “মা, ফেনিল ধবধবে জল ছুটে যাচ্ছে, মনে হয় যেন হিমালয়ের শাদা ভেড়ার পাল যাচ্ছে—তাই না?” সত্যি যখন জাঠেরা তিন-চারশো ধবধবে ভেড়া নিয়ে মোটর রাস্তা দিয়ে যায়, সঙ্গে নেকড়েবাহের মতো কুকুর, তখন পথটাকে এমন উন্নত কল্লোলিত তটিনীর মতোই দেখায় বটে। (অবশ্য নদীর নাম এখন ভাগীরথী) দেবপ্রয়াগে পৌঁছে অলকানন্দার সঙ্গে মিলন হবার পরে তার নাম হবে গঙ্গা। গঙ্গার নাম কী একটা? যা আছুরে মেয়ে আমাদের!

পাহাড়ের গায়ে গায়ে লুকোনো আর খোলামেলা হাজারটা গাঢ়োয়ালী গ্রাম। প্রায় পাহাড়ে সিঁড়ির মতো জমি কেটে কেটে নানারকম শস্য চাষ হচ্ছে—‘টেরাস্’ শস্য ক্ষেত্র, কোথাও কোথাও রুম চাষও হয়—পাহাড়ের খাড়াই গা বেয়ে আশ্চর্য চুষকী উপায়ে ছাগল ভেড়া এমনকি মহিষও চরছে। আর পথে হাঁটছেন কারা? সাধুরা।

ভাগীরথী স্রোতকে বেধে ফেলে তৈরী হয়েছে মানেরী বাঁধ। এখনও কাজ চলছে। তার ফলেই হয়তো দেখতে পেয়েছি ভাগীরথীতে চওড়া বিস্তীর্ণ চড়ার পর চড়া ভেসে উঠেছে। মানেরী হাইড্রো প্রজেক্ট পার হয়ে রাস্তা চলল। প্রজেক্টের ভিড়ভাট্টা ভরা কলোনী পেরিয়েই দেখি এক বিরাট মহিষের মৃতদেহ পথের আধখানা জুড়ে। সেখানে শকুনিদের মেলা। ছুগন্ধের রেশ চলন্ত গাড়িতেও দুকে এল।

এত কাছে এতগুলি মাহুষের বাস। তারা এই দূষিত পরিবেশে কাজ করছে। নারাদিন বাস যাচ্ছে, ট্রাক যাচ্ছে মিলিটারির (গঙ্গোত্রী বর্ডার ফোর্সের দ্বারা প্রোটেক্টেড এরিয়া)—মৃত পশুটার একটা গতিও হচ্ছে না? জাতীয় চরিত্র এখানে স্থম্পষ্ট। এত শীতেও যখন পচ ধরছে, বেশ কদিনের ব্যাপার নিশ্চয়। তখন বুঝিনি যে দুদিন পরে গঙ্গোত্রী থেকে ফেরবার সময়েও আবার সেই মৃত

মহিষ, সেই তৃপ্ত শকুনিরা আমাদের স্বাগত জানাবে উত্তরকাশীতে। আরো তীব্র উৎকট পচনের গন্ধে। অথচ বিজ্ঞানই এখানে দেবতা, এই মানেরীতে। এ তো যমুনোত্রী তীর্থের পর্বতশিখরে তুষার নদী নয়। এই আমাদের জাতীয় চরিত্র। পাবলিক হেলথ বিষয়ে পরিপূর্ণ অচেতনতা, এবং সর্ববিষয়ে দীর্ঘস্থিততা। এখানে, কে জানে, হয়তো জাতপাতের ব্যাপারও আছে। মৃত পশু সরানোর যোগ্য জাতের কেউই হয়তো এদিকে বাস করে না। অতএব থাকুক পড়ে।

মানেরী পার হয়ে ভাটওয়াড়ী, তারপরে গান্ধনানী। আশ্চর্য্য দুধ-সমুদ্রের মতো কল্লোলিত পাহাড়ী ভেড়ায় আর ছাগলে মাঝে মাঝেই রাস্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কী সুন্দর দেখতে! এত দেশ দেখেছি—অনেক রকমের গরু ভেড়া দেখা আছে, আমেরিকার তো তার ক্যাটল সম্পদের গর্বে মাটিতে পা পড়ে না। কিন্তু এমন হিমালয়ের ছাগলের মতো সুন্দর ছাগল আমি কখনো দেখিনি। ধবধবে সিন্ধের মতো দীর্ঘ লোমে ঢাকা শরীর, গোলাপী খরগোশের মতো চোখ। দেখে লজ্জা হয়েছিল—এই জিনিস আমি কেটেকুটে রেঁধেবেড়ে খাই, আমার মনে হল, আর মাংস খাব না। যাঃ! এত সুন্দর জীবকে মেরে ফেলি! কিন্তু এ সদিচ্ছা রাখতে পারিনি। রসনা হৃদয়ের চেয়ে প্রবল। এখানকার ভেড়াও বড় রূপবান, লাবণ্যময় প্রাণী। স্কটল্যান্ডের সবুজ পাহাড়ে চরে বেড়ানো ভেড়াদের স্বাস্থ্য ঈর্ষণীয়, কিন্তু এত রূপ তাদেরও নেই। প্রায়ই গাড়ি থেমে থাকছে। দু-তিনটি রাখাল ছেলে দু-তিনশো ছাগল ভেড়া নিয়ে চরাতে যাচ্ছে। ধবধবে শাদা ছাগলগুলোর দীর্ঘ লোমে ভরা শরীর।—“জাঠ। সব জাঠ। কেউ গাড়োয়ালী নয়—” বলে সুরথ সিং। “জাঠেরা জানোয়ার পোষে, আর কসাইদের কাছে বেচে দেয়। এই সব নিয়ে যাচ্ছে মিলিটারি ক্যাম্প বেচবে।” গাড়োয়ালবাসীরা জাঠদের খুব ভাল চোখে দেখে বলে মনে হয় না। “গাড়োয়ালীরা কী করে?”—“চাষবাস করে। ভেড়াও অবশ্য পোষে। পশম বানায়। ছাগলও যে পোষে না তা নয়, তবে কেবল দুধ খাবার জন্ত। কসাইদের কাছে বেচবার জন্ত নয়।”

এক সময়ে কিছু অদ্ভুত পুরোনো নেপালী পাঞ্জামার মতো প্রচুর কুঁচি দেওয়া মালোয়ার, শার্ট উড়নি পরা কিছু সুন্দরী গেল ঘোড়ায় চেপে। বেশ কিছু মাল-পতুর সমেত।

—ওরা কারা? জাঠ?

—না না, জাঠ কেন হবে, ওরা তো গুর্জর।

—মানে?

—জাঠেরা যেমন পাহাড়ী নয়, তাদের নাক চোখ আলাদা। গুর্জররাও

পাহাড়ী নয়। তারা সেই বহু দূর দেশের মানুষ। কাশ্মীরের ওপাশের উপত্যকার জংলী লোক। মুসলমান। মহিষ চরায়। দুধ বেচে। গুর্জররা মোটে গ্রামের ভেতরেই থাকে না, ওরা জাঁঠদের মতো নয়। ওরা বনের মধ্যে বাস করে। তাঁবুতে। “জানবর লোগোকো সাধ সাধ রহতা।” শীতে নিচের দিকে নামতে শুরু করে। জানোয়ারদের নিয়ে হৃষীকেশের সরকারি সংরক্ষিত অরণ্যে চলে যায়। অত্যাশ্রয় বনবাদাড়ে জীবজন্তুরা নির্ভয় হতে পারে না।

৪০

### ইন্দর সিং

ভাটওয়াড়ীর পর গান্ধনানীর কিছু আগে অবশেষে একটা ছোট চায়ের দোকান দেখা গেল। গাড়ি থামিয়ে নামলুম। সকাল বেলাই বেরিয়ে পড়েছি, চা পর্যন্ত না খেয়ে। ছোট্ট কাঠের ঘরে কাঠের উত্তুন জ্বলছে। একজন বৃদ্ধ গাঢ়োয়ালী চা তৈরী করছে। আমি আর হরথ সিং ঘরের মধ্যে বসলুম। ছোট্টরা বাইরের পাথরের ওপরে বসে ভাগীরথীর শোভা নিরীক্ষণ করছে।

ঘরটা ছোট্ট। একদিকে কাঠকুটো জমা করা। অতৃদিকে পাটাতনে বসে আছে ইন্দর সিং। তাকের ওপর ডিম, বিস্কুট, ছোট্ট ছোট্ট পাউকাট, চা চিনি। ছুটো বেকি পাতা। একটাতে আমি, অতৃটায় হরথ সিং। স্বথহুঃথের কথা হচ্ছে দুই পাহাড়ী বৃদ্ধে।

ইন্দর সিংদের গ্রামের জাঁঠ-গাঢ়োয়ালী জল-চল একটু-আধটু থাকলেও, বিয়েথা একেবারেই হয় না। গুর্জরদের সঙ্গে জল-চলও নেই। গুর্জররা তো কোনো গ্রামেরই বাসিন্দা নয়। গ্রীষ্মে থাকে গন্ধোজীরও পিছনের গহন বনে। শীতে নেমে যায় সেই হৃষীকেশের জঙ্গলে। জংলী আদমি সব। ওদের সঙ্গে জল-চল থাকবে কি করে? ওরা না জানে রাঁধতে, ঝুপুড়ি মতন বানিয়ে, কি তাঁবু খাটিয়ে মাথা গুঁজে থাকে। না জানে চাষবাস করতে, না রাঁধতে-বাড়তে। পোড়া ঝটি, পোড়া মাংস খায়। মেয়েরা পর্যন্ত যখন-তখন যেখানে-সেখানে আগুন জেলে রাঁধতে বসে যায়। রান্নাঘরের আকুও নেই। ওরা যা তা।

পাহাড়ীরা নিজেদের জাত নিয়ে খুবই গর্বিত দেখলাম, বিয়ুই হোক বা ছেত্রীই হোক, ওরাই পাহাড়ী যোদ্ধার জাত, রাজপুত্রের জাত। আর জাঁঠরা? জানবর পালনেবালা জাত হয়। আর গুর্জর তো জংলী লোগ। রকরকে স্টীলের গ্লাসে ভর্তি চমৎকার দুধ-চা এল। রুমালে জড়িয়ে গেলাস ধরতে হল।

ছোট্টখাটো ফোকলা দাঁত, ছানি পড়া চোখ, কুলুর টুপি মাথায় ইন্দর সিং



বারবার বললো, “আমার এখানে তো যাত্রীরা কেউ থামে না। কোন্ঠি নেহা; কোন্ঠি নেহাী রুখতা। সবাই সামনে দিয়ে চলে যায়। বাস যায়, ট্রাক যায়, মোটর যায়। কেউ কোনোদিন থামেনি। আজ পর্যন্ত নয়। তোমরাই প্রথম। যাত্রীরা সবাই ভাটওয়াড়ী বা গান্ধনানীতে চা খায়। এত গাড়ি যায় আমি কেবলই ভাবি, কে থামবে? কেউ কি থামবে না? আমার কত ভাগ্য যে আজ তোমরা থামলে। সারা জীবনই এটার কথা কল্পনা করেছি।” চায়ের দাম নিল পঞ্চাশ। দশ পয়সা কম। কারা এই দোকানে আসে? কেবল পাহাড়ী রাখালরাই! আমি ইন্দরকে কথা দিলুম, ফেরার পথেও থামব, চা খেয়ে যাবো। ইন্দর সিংয়ের দোকানে। তার নাতিরা এখন ভেড়া চরাচ্ছে ঐ ৩/৪টে যা আছে। আর ছেলেরা ক্ষেতে চাষবাস করছে। বুড়টা হয়েছে ঠাকুরদাদা, তাই এখানে চায়ের দোকান খুলে চুপচাপ বসে আছে। যথালভ! “গন্ধোত্রী গিয়েছে? ইন্দর সিং?”

“নাঃ। কায়সে যানা? গরীব আদমী।”

৪১

বর্ণা! বর্ণা!

গান্ধনানীর পর থেকে পথটা সত্যি খুব অদ্ভুত। কাঁচা রাস্তা তো বটেই, ছড়ি পাথর ধুলো কাদা আর বর্ণার পরে বর্ণা। এত বর্ণা আমি জীবনে আর একবারই দেখেছি, একটা বস্তায় আটকে যাওয়া ট্রেন থেকে। ফেদার রিভার ক্যানিয়নে যখন প্রচণ্ড বর্ষণে বিশালকায় রেড-উড-ট্রীদের শিকড়স্বল্প উপড়ে রাস্তার ওপরে টেনে আনছিল এই সব নবজাত জলপ্রপাতের মরণশ্রোত। কিন্তু এখানকার বর্ণার জাত আলাদা। এরাই এইসব পাহাড়ী গ্রামের প্রাণধারা। গাড়িকে প্রায়ই নিয়ে যেতে হচ্ছে বর্ণার ওপর দিয়ে, খুব সাবধানে, যাতে পিছলে পড়ে না যাই। প্রত্যেকটা বাক ঘুরতে হচ্ছে ভীষণ যত্নের সঙ্গে, প্রত্যেকটাই ব্লাইণ্ড করনার। এবং প্রায়ই ইউ-বেন্ড, হেয়ার পিন বেন্ড। উন্টোদিক থেকে মন্ত বরাহের মতো প্রায়ই চলে আসছে “যাত্রা” চিহ্নিত বাস। ট্যাক্সি চোখে পড়ল ছুটি-একটি। প্রাইভেট একটিও না। একটি জায়গায় বা পাশে চণ্ডা, চমৎকার ভাগীরথী নদী—সেই উন্নত পার্বত্য মূর্তি নেই—মাঝে চড়া, গ্রামের মেয়েরা তামা-পেতলের কলসীতে জল ভরছে।

আমরা প্রত্যেক বর্ণায় থামছি আর ক্লাঞ্জে খাবার জল ভরছি। বর্ণার জল ফ্রিজের মতো ঠাণ্ডা আর কি মিষ্টি! একটাও অস্থচ্ছ, অমিষ্ট বর্ণার জল দেখিনি।

থামবার প্রধান কারণ অবিশ্বাস নয়। ইঞ্জিন। উত্তরকাশী ছাড়বার পরেই আমাদের গাড়ির একটা তেষ্ঠা রোগ হয়েছে। কেবলই তার জল শুকিয়ে যাচ্ছে, ইঞ্জিন গরম হয়ে যাচ্ছে। এ রাস্তা যে জীপগাড়ির। আয়েসী অ্যাডাসাডারের রাস্তা তো এ নয়? তার স্নায়ুতে চাপ পড়ছে এত চড়াই ভাঙতে। মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি ঝর্ণায় ব্যাডিয়েটারে জল ঢালছি, আর দুটো বোতলে জল ভরে নিচ্ছি। পিকোর গা গুলোনো সেরে গিয়েছে। এই পথ যথেষ্ট ঠাণ্ডা, খোলা মেলা। বারবার থামতে হচ্ছে, নামতে হচ্ছে, ঝর্ণা-চর্ণার সঙ্গে মাথামাখি হচ্ছে, ভাববিনিময় হচ্ছে, এসব পিকোর খুব পছন্দ। মনের স্থখে ছুটোছুটি, জল ঘাঁটাঘাঁটি করছে স্বরথ সিং আর রঞ্জনের সঙ্গে। আমিও করছি না এমন বলতে পারি না।

পথটির সৌন্দর্য ঠিক বর্ণনা করতে পারবো না। প্রাণ জুড়ানো। ভাগীরথীর উৎস সন্ধান গেলে পথ এমনটাই হওয়ার কথা। তবে এই মুহূর্তে খুব বিপজ্জনক হয়ে রয়েছে। যে কোন ঝর্ণায়, যে কোনো বাক, গাড়ি পিছলে যেতে পারে। উন্নত বাসের সঙ্গে ধাক্কা লাগতে পারে। বর্ডার কোর্সের লোকেরা রাস্তা মেরামতির কাজ করছে।

৪২

### কে তুমি?

পথের ধারে হঠাৎ দেখি বিরাট, স্বগোল, একটি শাদা গ্লোবের মতো বস্তু। কি সুন্দর, কতো বড়ো খেত পাথর! এখানে পাথরের নানারকম রং—কমলা, শাদা, ধূসর, কালো—দুদিকে কালো মধ্যে কমলা, শাদা কালো লাল কতরকমের স্ফটিকের মতো প্রস্ফুট—পিকো আর রঞ্জন চেষ্টাচ্ছে—“মেটামরফিক রক্ ফর্মেশন”, “স্ট্র্যাটিকোয়েড রক্”, ভূগোলে পড়া পাতি-ভূতত্ত্ব। আমি দুয়েকবার “ফসিল! ফসিল!” বলে চেষ্টায়েও পাতা পেলুম না তবে এতবড় খেতপাথরের চাই একটাও দেখিনি। রঞ্জনের চেষ্টানি শুনে হাসিমুখে স্বরথ সিং বলল, “উয়ো তো পথল্ নহি হয়। বরফ্ থণ্ড্ হয়। আইস। স্নো থা, জম্ কর্ আইস বন্ গয়া হোগা।” ও হরি, এই রোদের মধ্যে ঝকঝক করে পথের ধারে গোলচে হয়ে বসে আছেন। আপনি তবে তুষার বাবু! এই প্রথম স্নো-র নৈকট্যে এসে দুই বাঙ্গাল, স্বরথ সিংয়ের দুই “বাবা” গুঁর “বেবি” মহা উত্তেজিত। কিন্তু হয়! গাড়ি থামলো না। “গুঁর বহোং মিলেগা। বদ্রীমে বরফকা উপরসে চল্না হয়। কেদারমে বরফসে পায়দল যানা। ইয়ে তো কুছ বি নেহি!”

## লংকাকাণ্ড

লংকাই পৌঁছে গেলুম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই। এখানেই মোটররাস্তা শেষ। ট্রেকিং শুরু। তিন কিলোমিটার পরে “ভৈরবঘাটি” শিখরে পৌঁছে ফের মোটর রাস্তা মিলবে। মিলিটারিদের তৈরী রাস্তা। গঙ্গোত্রীর ওপারেই মিলিটারি ঘাটি—ভারত তিব্বত বর্ডার। ভৈরবঘাটিতে জীপগাড়ি আর বাস থাকবে। এই মাত্র তিন কিলোমিটার রাস্তা মোটরবল করা যায়নি। একটা ব্রীজ তৈরী হচ্ছে যমুনার মাথায়—সেটা শেষ হয়ে গেলেই আর সমস্যা থাকবে না। সোজা মিলিটারি ট্রাক চলে যাবে ভৈরবঘাটি পর্যন্ত। সেই সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের বাসও।

যাত্রীদের জগ্ন লংকাতে ‘হাট’ আর ‘স্টেট’ আছে বলেছে ইউ পি ট্যুরিজমের গাইডবই। সেখানেই রাডে থাকবো ঠিক করেছি। এটা এক বিশাল বাস স্ট্যাণ্ড। বিশ-পঁচিশটা বাস দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন কোম্পানির, কিছু রেগুলার পাবলিক ট্রান্সপোর্টের, কিছু রিজার্ভ ট্যুরিস্ট কোম্পানির। প্রত্যেকটিরই শিয়রে লেবেল আঁটা “যাত্রা”—ইংরিজিতে হিন্দিতে। মাথার ওপরে বুকে পিঠে লেখা—“যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী-কেদারনাথ-বদ্রীনাথ।”

সারাপথ এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। ভেতরে আকুল কিছু পুণ্যার্থী মুখচ্ছবি।—অধিকাংশই দেহাতী। কিছু বঙ্গসন্তান।

রঞ্জন বললে, “আগে চল থেয়ে নিই।” পিকো থাকার ব্যবস্থাটা করে আসতে গেল। এসে বলল, “তীব্র ভেতরটা দেখা হয়নি। তবে বাথরুম নেই, ঐ ক্যানভাস—‘মুজাগার’ ইত্যাদি ছাড়া। আর কুটির বলতে টিনের বিস্কুটের বাক্সের মতন কয়েকটা ঘর। বাথরুম আছে। ঘোর অন্ধকার কিউবিক্লে, একটা গর্ত! অফিসার লাঞ্চ খেতে ব্যস্ত, কথা বলবেন না এখন।”—“চল তবে আমরাও থেয়ে নিই।” লংকা-চটিতে খাবারের দোকানের সমুদ্র—সেখানে একধারে খাণ্ড অগুধারে কাঠের পাটাতনে শতরক্ষি পাতা। আর লেপ-তোষক ডাই করা। খেতে পেলেই বোধ হয় যাত্রীরা গুতোও চায় এখানে। গরীব দেহাতী যাত্রীরা রাডে এখানেই আশ্রয় পায়, বোধ হয় দু’তিন টাকায় লেপ-তোষক ভাড়া করে।

বেঞ্চি পেতে খেতে বসলুম। দোকানী খুবই যত্নআত্তি করল। নিমু? হরা মিচা? পান্নড়? আচার? ঘিউ? পাঁচ টাকায় এক শো ঘি দিয়ে ভালক্রাই করে দেব কি? শেষে দেখা গেল, হুন আর জল ছাড়া প্রত্যেকটা এঞ্জটাই এক

রূপাইয়া, আচার দো রূপাইয়া! রঞ্জন সর্বত্র জিলিপি খাচ্ছে। আমি আর পিকো খাচ্ছি না, কেউ টিকে নিইনি কলেরার। কেবল ওকে হিংসে করছি। আর, “খাসনি, খাসনি” বলছি।

রোদ বাঁ বাঁ। বাসন্ট্যাণ্ডের একধারে গাছতলায় ছায়া ছায়া খানিকটা জায়গা। তীর্থযাত্রী মানুষেরা সেখানে সংসার পেতেছেন। তিনপাথরের অনেক উত্থন জলছে, বিভিন্ন সংসারের হাঁড়ি চড়েছে, গরম ভাতের গন্ধ বেরুচ্ছে। যাত্রীরা খাওয়া-দাওয়া করছেন। বিছানাও পাতা হয়েছে এখানে ওখানে। বাচ্চা ঘুম পাড়ানো হচ্ছে। রঙের মেলা বসেছে—উজ্জল নীল, হলুদ, বেগুনী, খয়েরী। দেখে মনে হয় দলে দলে পিকনিক পার্টি, ওপাশে সেই ক্ষুদ্রে ক্যানভাস ঘেরা ছুটি শোঁচাগার আর মৃত্যুলায়, মহিলা, পুরুষ। যথেষ্ট মোটেই নয়, মানুষের তুলনায়।

চার-পাঁচটা মানুষ লাঠিহাতে ফিরে এলো। দেখে মনে হল বাঙালী—জিজ্ঞেস করি, “থুব ক্লান্তিকর কি?”

হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, “নাঃ, থুব বেশি নয়। যাবার সময়ে তত কষ্ট নেই, তবে ফেরবার সময়ে একটু বেশি চড়াই মনে হয়। একদিনেই ছুঁবার যাতায়াত না করলে সেটুকুও হত না।”

“রাত্রে রইলেন না কেন?”

“এখানেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, তা ছাড়া বাস ধরতে হবে তিনটির সময়। এখনই রান্না-বান্না আছে—”

“কী করে রাখবেন? উত্থন বানিয়ে?”

“না না, স্টোভ কিনে ফেলেছি। প্রথম প্রথম বাইরেই খাচ্ছিলুম। বড় বেশি খরচ—দিনে পায় পায়সন দশটাকা, চারজনে চল্লিশ টাকা পড়ে যাচ্ছে। শেষে স্টোভ, হাঁড়ি, কেরোসিন, চাল ডাল আলু পেঁয়াজ ত্বন তেল কিনে ফেললুম। খিচুড়ি-ডিমভাজা দিব্যি চালাচ্ছি, দশটাকাতে হয়ে যাচ্ছে। এখনও কেদারবদ্রী বাকী, বুঝলেন না? খরচের দিকটা তো দেখতে হবে?” আমি মন দিয়ে শুনি। পিকো প্রচণ্ড বোবুড হচ্ছে। ‘খরচের দিকটা’ ওকে তো দেখতে হয় না, এ প্রশঙ্গ ওর অচেনা।

“মা, অফিসে বলেছিল আফটার লাঞ্চ খোঁজ নিতে।”

না, গঙ্গোত্রীতেই থাকবো ভাবছি, লংকাতে নয়। এখনটা সুবিধের হবে না, একদিনে ছুঁবার যাতায়াত না করলেই তো ভালো। গঙ্গোত্রী নাকি যমুনোত্রীর

মতো নয়। চমৎকার মন্দির আছে বড় চত্বরওলা, গঙ্গার ঘাট আছে প্রাণ জুড়োনো, মুনিঋষিদের আশ্রম আছে। ধরমশালা, ট্যুরিস্টলজ, বাসস্থানের অভাব নেই। অফিসার বললেন “এখানে বুকিং নিশ্চয়োজন। ওখানে গিয়েই জায়গা পাবেন। তাছাড়া এখান থেকে খবর দেবার উপায়ও নেই। যাবার সময়ে লাঠি ভাড়া করতে ভুলবেন না যেন। অনেক চড়াই উৎরাই আছে।”

রঞ্জনের সঙ্গে সুরথ সিং লাঠি আনতে গেল। ওর মন ভালো নেই। গঙ্গোত্রীতে স্নান হবে না। লংকা অনেক দূর। এখানে গাড়ি ছেড়ে যেতে পারবে না বেচারী।

88

### রামশরণ

অফিস থেকে বেরিয়ে গাছতলা দিয়ে যেতে যেতে দেখি কঞ্চল মুড়ে একজন তীর্থযাত্রী শুয়ে। তার পাশে বসে এক মধ্যবয়সিনী দেহাতী নারী খুনখুন করে কাঁদছেন। অস্থখ করেছে?

“কী হয়েছে, মার্জি?” মার্জি আর কোনো উত্তর দেন না। ওড়নায় মুখ ঢেকে খুব মৃদুস্বরে কাঁদেন। এই সময়ে একজন বৃদ্ধা আর একটি বালিকার উদয় হল। বৃদ্ধা বললেন, “উস্কা রামশরণ হো গয়া, বেটি।”

“ক্যা হয়া!”

“রামশরণ। রামজীকা পাস্ চলা গয়া উয়ো।” শাস্ত কণ্ঠস্বর।

মাথায় বাজ পড়লো আমার। মৃতদেহ? মৃতদেহ আগলে বসে আছেন এই মহিলা? এই দূর বিদেশে?

“কাঁহাসে আয়ে হেঁ?”

“গাঁওসে—রাজস্থানসে—”

“মাথমে ওর কোঙ্গি—?”

“হাঁ হ্যায়, মাথমে তিস্ আদমি হ্যায়, উস্কে দেশওয়ালে। সব গঙ্গামার্জিকে পাস নাহানে গয়া। ইস্কে ভাই হ্যায় না? ইস্ লিয়ে ইয়ে জানহী সকা। ইস্কে গঙ্গোত্রী দরশন বি নাহি হয়া। বিচার। তক্দীর।”

“কল্ জাউঙ্গী,” কাঁদতে কাঁদতেই হঠাৎ মহিলা বলেন। একটু চমকে যাই।

কী হয়েছিল? দাস্তবমি? জর? হঠাৎ দেখি একটু দূরেই দাস্ত পড়ে আছে। মাছি ভনভন।

মুহূর্তেই বৃকের মধ্যে লাফিয়ে উঠলো ভয়। অমনি নিজের মেয়েটিকে কোলে

টেনে নিয়েছি আর বলেছি—“পিকো রে পালা ! কলেরাও হতে পারে ! আর এখানে এক মিনিট নয় । চল—খানায় থবর দিই গে ।”

যেতে যেতে শুনি বালিকাটি কিছু জিজ্ঞেস করছে । কান্না থামিয়ে মৃত ব্যক্তির বোন তাকে বুঝিয়ে বলছেন পুঁটলির কোনখানে আটা পাওয়া যাবে, কোনখানে ঘিউ, কোথায় শক্কর—এই সব শুনে পিকোটা কেমন উদ্ভ্রান্ত হয়ে গেল । এই প্রকট মৃত্যু আগলে বসে মহিলা কী করে ঘি-আটা-চিনির কথা ভাবছেন ? কিন্তু আমি অবাক হইনি । শুধু মৃত্যু আগলে থাকলেই তো হবে না ? জীবনটাও তো আগলাতে হবে ! ঐ বাচ্চাটা খাবে তো ? এখন যে সবার ‘খানা পকানেকো টাইম’ !

সদাশিব পুলিশ বললে, কুছ দিক্ত নেহী । যদি পোড়াতে চায়, লাকড়ি লা দুংগা, যদি ঘরে নিয়ে যেতে চায় সাক্ষিকট দুংগা । ইয়ে তো হামেশাই হোতা হ্যায় । হব্ব রোজ কোর্দি ন কোর্দি মরতা ইধরমে আ কর ।

তবু যাত্রী আসবে, যদিও পথ দুর্গম, যদিও রোজই কেউ মরছে এখানে পৌঁছে । তথাপি আসা কেন ? তীর্থভ্রমণ কিসের আশায় ? আশা একটিই । চিরস্থির, স্থিরস্থির আশা । অহনি অহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্ শেবাঃ স্থিরস্থমিচ্ছন্তি । এর পরে আর আশ্চর্য কী ?

৪৫

### জাহ্নবী-যমুনা

হাঁটা পথের রাস্তাটা অনন্তস্থল । যমুনোত্রীর পথের মতো নয়, অনেক চওড়া । গঙ্গা অনেক কাছাকাছি, যমুনার মতো অতো গভীর খাদ নয়, গঙ্গার সঙ্গে চেনাশুনা হয় সহজে । রূপসীও সে অগ্র ধরনে । সারাটা পথ কতো বর্ণা বরছে, গঙ্গার স্রোতের সঙ্গে এসে মিলছে । প্রথমে খানিকটা উৎরাই । তারপর সিঁড়ির মতো চড়াই । পথে অনেকখানি রাস্তা কাঠের রেলিং ঘেরা । বেশ মনের আনন্দে চলেছি । ভাগ্যিস খচ্চর নেই এখানে ! প্রথম কিলোমিটার যখন ফুরালো, কী উল্লাস আমার মনে, পরিশ্রম অবশ্য হল পাঁচ কিলোমিটার হাঁটার মতন । হাঁপানিকে প্রশ্রয় না দিয়ে, খুব আস্তে আস্তে হাঁটছি । পথে দলকে দল মাছুষ ‘জয় গঙ্গামাদে’ বলে হাতে জলপাত্র নিয়ে ফিরছেন । মাথায় পুঁটলি । কোলে শিশু, হাতে জলপাত্র । স্ত্রী, পুরুষ উভয়েরই । যমুনোত্রীর মতো বগ্ন নয় গঙ্গোত্রী—যমুনোত্রীর বগ্নতা যদি হয় সাবলাইম, গঙ্গোত্রীর সভ্যতা তাহলে বিউটিফুল ।

এ পথে রাখাল বালিকা বাছুর নিয়ে হাঁটে । পথে ভাঙীর উৎপাত নেই । খচ্চরও

নেই ভেবেছিলুম। কিন্তু কার্যত তা হল না। সারা পথটা খচ্চরের মোকাবিলা করতে করতে যেতে হল। এই খচ্চরগুলি হিমালয় পর্বতের উপযুক্তই বটে। মিলিটারি মিউল এরা, ভারত সরকারের সেবায় নিযুক্ত। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে যে কোনো উচ্চবংশীয় অশ্বকে হার মানাতে পারে। “অশ্বতর” মানে “অশ্বের চেয়েও অশ্ব” যদি হত, তাহলে এরা সেই সংজ্ঞা পাবার যোগ্যতা রাখে। কী বিশালদেহ, তেজোদৃপ্ত, তেলচক্চকে চামড়া দলাই মলাই করা চেহারা। কে বলবে, এরাও খচ্চর। খচ্চর যারা গালি হিসেবে ব্যবহার শুরু করেছিল তারা নিশ্চয় এদের দেখেনি। ভালো ঘোড়ার সম্ভ্রান্ত স্বাস্থ্য ঔজ্জ্বল্য এবং খচ্চরের পার্বত্য কুশলতার এক অসামান্য সমন্বয় এরা। একটি সিঁড়িপথে একশো কুড়িটি খচ্চর নামলেন। সব যাত্রীরাই যাত্রা স্থগিত রেখে, পাহাড় বেঁধে দাঁড়িয়ে এই অপূর্ব খচ্চর মিছিলকে গার্ড অব অনার দিতে লাগলুম। তাঁদের প্রত্যেকের পিঠে কামান বাধা। তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে দু’তিনজন করে সেবক জোয়ান ছুটছেন। মুগ্ধনয়নে এই দৃশ্যের ছবি তুলব বলে আমি প্রস্তুত, হঠাৎ মেয়ে ছুটে এসে বললে, “লেন্সের ঢাকাটা বন্ধ।” লেন্সের ঢাকনি খুলে ফের ক্যামেরা তাক করেছি, এবার পিঠে ঢোকা পড়ল। ফিরে দেখি এক গুরুগম্ভীর মিলিটারি অফিসার। “মিলিটারির ছবি তুলতে হয় না, সিগ্টার”।

“এমন কি তার খচ্চরেরও না?”

হেসে ফেলে অফিসার বলেন, “না, এমন কি খচ্চরেরও নয়। এটা মিলিটারি অপারেশন।”

“অ।”

বর্ডার থেকে যখন কোনো রেজিমেন্ট বদলি হয়ে যায় তারা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র সমেত চলে যায়। পরবর্তী রেজিমেন্ট তাদের নিজেদের কামান-টামান সঙ্গে করে আনবে। আমার এটা খুব আশ্চর্য মনে হল। এই পার্বত্য অঞ্চলে, কঠিন পথে এত কষ্ট করে বারংবার কামান ওঠানো নাবানো কি একান্তই আবশ্যিক? এতে কেবল জন্তুগুলিরই কষ্ট হচ্ছে তা নয়, মানুষের কষ্টও কম নয়। সিঁড়ি ভাঙতে খচ্চররা ভয় পায়। সেই তাদের সিঁড়ি ভাঙানোর চেষ্টায় কি মানুষেরই কম কষ্ট হচ্ছে? ভীত, অনিচ্ছুক জীবগুলিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে হচ্ছে পিঠে ভারী কামান বয়ে। শেষদিকে ৪/৫টি কামান এলো মানুষ-বাহিত হয়ে। চারজন করে জোয়ান স্ট্রেচার বহনের মতো কামান বহন করে ছুটছে। মুখে ছাদ-পেটাইয়ের কি রাস্তা-পেটাই কুলিদের মতো ছড়ার গান শুনেই বুঝেছি তাদের প্রচণ্ড পরিশ্রম হচ্ছে। ঘর্মাক্ত মুখগুলি নেহাৎ কচি। ভৈরবঘাটের সৈন্যশিবির থেকে আসছে এরা।

গঙ্গাযমুনার সঙ্গম বলে একটি জায়গায় লেখা আছে। সেখানে দুই রঙের দুটি নদী প্রচণ্ড বেগে এসে মিশছে। একটি নীল অগ্নিটি গেরুয়া। দুটি রং স্পষ্ট আলাদা। এই নদীর পাথরগুলির গড়নও খুব অন্তর্যত। বিরাট গোলাকার। ইংরিজিতে যাকে “বোল্ডার” বলে তাই। যমুনা যথারীতি গভীর শোজাহুজি খাদ তৈরী করে বয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড বেগে—ভাগীরথীর তীরটা আরেকটু ছড়ানো। সঙ্গমের কাছে নামা যায়, পাথরে গিয়ে বসা যায়। একটি পরিবার শিশুসমেত ওখানে বসে খাওয়াদাওয়া করছেন দেখা গেল। যমুনার ছধারে প্রায় পাঁচ-ছ’ হাজার ফিটের খাড়া পাথুরে দেওয়াল উঠে গেছে, ঠিক যেন কোনো কেল্লার পরিখা।

৪৬

### হৃদয়ে তোমার দয়্য

ভৈরবঘাট যত কাছে আসে, পিকো ততই দেহাতীদের দেখাদেখি পাকদণ্ডী বেয়ে উঠতে চায়। আমি যমুনোত্রীর গল্ল শুনে এসেছি, আমি তো ওকে কিছুতেই পাকদণ্ডী বাইতে দেব না। অত্যন্ত বিরক্ত ও বিমর্ষ হয়েই পিকো শেষ পথটুকু অতিক্রম করল।

পৌঁছুতে পেরে আমার কী গর্ব! তিন কিলোমিটার যে পারে, তেরো কিলোমিটারও সে পারে। তবে টাইম লাগবে তিন যদি দেড় ঘণ্টা হয়, তেরো তবে সাত আট ঘণ্টা? নাঃ, ধামতে হবে। বেশ, দশ ঘণ্টা? যমুনোত্রীটা হেঁটে উঠলেই ঠিক হোত। এত কষ্ট হোত না। দেখাটাও সুসম্পূর্ণ হয়নি। চোখের ভেতর মনটা ছিল না।

ভৈরবঘাটতে পৌঁছে দেখি সেই বাঙালী দলটির একজন বৃদ্ধ বসে আছেন। “মেসোমশাই, বেশ তো এত আগে একা একা উঠে এসেছেন, দলের বাকীরা কই?”

একথা শুনে তিনি খুব খুশি—“ভেবেছিলুম পারবোই না, তা কার্যত দেখছি আমি ফার্স্ট হয়েচি।”

আমরা চা খাবো। মেসোমশাইকেও খাওয়ালুম। একসঙ্গে বসে গল্প করছি, কেননা এখন কোনো বাস নেই। জীপ দশ-বারোজন লোক চায়। ষাট টাকা ভাড়া, ও বারোজন মানুষ না হলে ছাড়বে না। ঠিক আছে, বাকি বাঙালীরা চলে আসুন, তারপর ব্যবস্থা নিশ্চয় হবে। আরেকজন বৃদ্ধ এসে গেলেন ওঁদের দলের। অল্পবয়সীদের চিহ্ন নেই। চা খেতে খেতে গল্প হোলো। মেসোমশায়ের প্রবল বাত। এককালে বাতে পঙ্গু ছিলেন। এখন সত্যি সত্যিই পর্বত লঙ্ঘন



করছেন। বিনা কষ্টে। আর অগ্নজনের (কাকাবাবু?) একটা অ্যান্ড্রিডেন্ট হয়ে হিপজয়েন্ট পুরো ভাঙা। একটি লৌহশলাকা ঢুকিয়ে অস্থি ছুট গাঁথা আছে। কলকাতায় বেশিদূর হাঁটা বা দোতলা বাসে চড়া তাঁর বারণ। তিনিই খচ্চরে চড়ে যমুনোত্রী করে এসেছেন। এখন পদব্রজে গঙ্গোত্রী।

“তিনি দয়া না করলে হয় না।”

“তাঁর দয়া থাকলে সবই হয়।”

হাসিমুখে পাকা দাড়ি নেড়ে চকচকে টাক নিয়ে কাকাবাবু আর মেসোমশাই ঈশ্বরকে সার্টিফিকেট দিলেন। মনে মনে বলি, “আমার যা হাঁপানি, তবু এই আমিও তো পেরে যাচ্ছি!”

একটু বাদেই তাঁদের দলবল এসে পড়ে। ভৈরবঘাটিতে ভৈরবমন্দির আছে। সেখানে গিয়ে গুঁরা ছবি তুলতে লাগলেন। গুঁদের সঙ্গে একটি তরুণ ব্রহ্মচারী আছেন। তিনিই পথপ্রদর্শক। অনেকবার এপথে এসেছেন। তাঁর তো সমগ্র উৎসাহ দেখলুম তাঁর দলের তরুণী ছাত্রীটির প্রতিই অনন্ত-নিবন্ধ। এটা খেয়াল করেছে রঞ্জন। (সেও হয়তো ছাত্রীটির প্রতি উৎসাহিত বোধ করতে গিয়েছিল!) তাঁরা বাসের খোঁজ নিচ্ছিলেন। আমি জীপের কথা তাঁদের বললুম। এবং ঠাই চাইলুম। মেসোমশাই পিকোকে “নাতনী” ডাকছেন এবং চা খেয়ে খুব খুশি। তাঁর খুব ইচ্ছে ছিল একসঙ্গে যাওয়ার।

“কেন জায়গা হবে না? যদি হও স্বজন, তেঁতুলপাতায় ন’জন, সবাই মিলেই যাবো।”

কিন্তু গুঁর দলটি মেসোমশায়ের “সৌজন্যপূর্ণ” কথা শুনলো না। তাঁরা জানালেন জায়গা নেই—জীপ ভর্তি হয়ে গেছে। গুঁরাই যথেষ্ট সংখ্যক। “দুঃখিত ভাই” বলে মিষ্টি হেসে গুঁরা চলে গেলেন। বাস-স্টেশন তখনও ফাঁকা। মরীয়া হয়ে মেসোমশাই বলে ফেললেন, “এরা আমাদের আগে এসেছে, কতক্ষণ দাঁড়াবে? নাতনীকে অন্তত আমি কোলে নিয়ে যাই—”

পিকো রাজী হল না।

### বাস-বাসনা

পিকো গেল না। তক্ষুনি উল্টোদিক থেকে বাস এসে দাঁড়াল। কুলকুল তার করে চতুর্দিক দিয়ে শতধারায় মাছুষ ঝরে ঝরে পড়তে লাগলো। ঝরতে ঝরতে বাস খালি হতে না হতেই মাছুষ আরেক দিক থেকে চড়ছে (ছুটো দরজা আছে)। রঞ্জন এসে বলল, “তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো—জীপ আর নেই।”

দৌড়ে গিয়ে আমি আর পিকো উঠে পড়ি। ড্রাইভারের পাশের সরু সীটে অনেক মালপত্র নিয়ে এক মহিলা। তাকে ঠেলেরুলে মাল সরিয়ে আমি বসে পড়ি। পিকোকে গিয়ারবাক্সের ওপর তুলে বসাই। মিনিবাসে ওখানে তো সীট পর্যন্ত সঁটে দেয় আজকাল! রঞ্জন ছাদে গিয়ে উঠলো। রঞ্জনের কাঁধেই প্রধানত আছে রাকস্যাকটি। কখনো বা পিকোর কাঁধেও থাকছে। সেটা নামিয়ে ভেতরে নিয়ে নিয়েছি।

খানিক পরে বাসের মধ্যে সার্ভিন মাছের টিন ঠামার মতন শূচীভেগ অবস্থা হল। ঠিক এই সময়ে পেছনে একটা করুণ আর্তি কানে এল—“দিদি! ছাদ থেকে নামিয়ে দিয়েছে।”

রঞ্জন সারারাত্তা বাসের শেষ সীটের সামনে দাঁড়িয়েছিল, বাসের পশ্চাদ্বর্তী পথ দেখতে দেখতে এসেছে। আমরা একদম সামনের কাচ দিয়ে পরিষ্কার বিপুল তুষার মেঠলি ভগীরথ পর্যন্ত এবং তাঁর আশেপাশের সব শুভ্র চূড়াগুলি দেখতে দেখতে এসেছি। স্বচ্ছনীল আকাশের গায়ে ঝকঝকে রূপোলি শিখরমালা। সবুজ বনে ঢাকা উপত্যকা। আর সেই অবিরাম বর্ণা, বর্ণা। তফাৎ এই, ইচ্ছেমতন বাস থামে না—। বর্ণার জল স্পর্শ করা, পান করা যায় না আর বাস যেন উন্নত হাতীর মতো দাপিয়ে ছুটছে। মোড় নিচ্ছে কী স্টাইলে—যেন সে বাসই নয়, মোটরবাইক!

আমার প্লেনে যেতে সবচেয়ে খারাপ লাগে। কিছুই দেখা হয় না। তার চেয়ে ট্রেন ভালো। কিন্তু ট্রেনও বাঁধা লাইনে যায়। তার চেয়ে বাস ভালো। বেশ গাছপালার ভেতর দিয়ে, বনজঙ্গল ভেদ করে, জীবজন্তুর চোখে আলো ফেলে, নদী-বর্ণার গা ঘেঁষে কিংবা জল ছুঁয়েই বাস ছোটে। তার চেয়েও গাড়ি ভালো, কেননা তার কন্ট্রোল নিজেরই হাতে। ইচ্ছেমতন থামা যায়, যা খুশি ছোঁয়া যায়। একটা বইতে পড়েছিলুম যে গাড়ির চেয়েও মোটরবাইক ভালো। সেখানে পা বাড়ালেই মাটি, আর তোমার চারিপাশে আলো হাওয়া বৃষ্টির সর্বাঙ্গীন

স্পর্শ। কিন্তু যেটি সবার চেয়ে ভালো, সারা হিমালয় জুড়ে সাধুরা সেটাই করে দেখাচ্ছেন। পায়ে হাঁটা। গঙ্গোত্রীর এই তিন কিলোমিটারের জগ্গে আমি সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। যমুনোত্রীতেও অবশ্য ফেরার পথে হেঁটে নেমেছিলুম জানকী চটি অবধি। সাত কিলোমিটার। ভালো লাগা বলতে যেটুকু সেই জগ্গেই। কিন্তু ওই বৃষ্টি কান্দা এবং তার পূর্ববর্তী অপ্রিয় অভিজ্ঞতায় সেই যাত্রার পরিপূর্ণ রসাস্বাদন ঘটেনি। আজ আকাশে বকবকে অথচ অহুষ্ণ রোদ, গায়ে শীতের তাজা বাতাস, চারদিকে উজ্জ্বল হাসিমুখের শোভাযাত্রা, সেদিনকার মতো অত ক্লান্ত, বিষন্ন মুখের সারি নেই—আজ গঙ্গোত্রী অগ্নি স্বাদ দিয়েছে। হিমালয়ের বাস-যাত্রাটিও মন্দ হলো না। মাত্র সাড়ে তিন টাকা ভাড়া। তিনজনের সাড়ে দশ। জীপে না গিয়েই ভালো হলো। এদের সঙ্গে, এই জনতা যাত্রীদের সঙ্গে ‘যাত্রা’ হলো। এটা না হলে এ-যাত্রা সম্পূর্ণ হতো না।

৪৮

### কাহারে হেরিলাম! আহা!

গঙ্গোত্রীতে নেমে আমরা দেখি, ভাল ট্যুরিস্ট লজটি নদীর ওপারে। ব্রিজ পার হয়ে। দণ্ডীস্বামীর আশ্রমের পাশে। ওখানে অ্যাটাচড বাথ আছে। যদি দু’তিন-দিন থাকতে হয় তবে ওটাই ভাল। কিন্তু একবেলার জগ্গে যদি ওখানে উঠি তবে যাতায়াতেই প্রচুর সময় এবং শ্রম ব্যয়িত হবে। গঙ্গামন্দির অনেক দূরে। চললুম দ্বিতীয় ট্যুরিস্ট লজে। সেটি মন্দিরের পাশেই। প্রথমেই তো মন্দিরে ঢুকেছি। সত্যি মনজুড়োনো মন্দির। প্রাঙ্গণটি পরিচ্ছন্ন, চারদিকে ছোট ছোট অনেক মন্দির, তাদের সামনে বারান্দা আছে, বসার জায়গা আছে, যাত্রীরা পুঁটলি বোচকা নিয়ে বসে আছে মন্দিরপ্রাঙ্গণে। যমুনোত্রীতে এসব নেই। এ-মন্দিরে গঙ্গাদেবীর প্রতিমা।

বেরিয়ে এসেছি, ভাবছি ট্যুরিস্ট লজটি কোন্দিকে, অকস্মাৎ কানে এলো—  
“নবনীতা মাসী!”

স্বপ্ন? মায়া? না মতিভ্রম?

“নবনীতা মাসী! এই যে, ওপরে!”

ওপরে চোখ তুলে দেখি সামনেই কিছুটা ওপরে একটি হোটেল জাতীয় আস্তানা। তারই চত্বর থেকে বুক পড়ে আমাকে ডাকছে খুব মিষ্টি একটা গলা।—“কে রে তুই? আমি দেখতে পাচ্ছি না।” তখন আঁধার নামতে শুরু করেছে আর মেয়েটা আলোর বিপরীতে।

“আমি তো ঘুচাই!”

“ঘুচাই? তুই এখানে?”

“তুমি এখানে? আমি তো মা’র সঙ্গে এসেছি। এই ট্যুরিস্ট লজে আছি।”

“ও, ঐটেই ট্যুরিস্ট লজ বুকি? আমিও ওখানেই থাকবো। দাঁড়া, আসছি।”

সেখানে লাঠি হাতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মতো কানঢাকা টুপি-মাথায়—কে? কবিতাদি! হ্যা, পাঠক, হ্যা। বিশ্বাস হচ্ছে না তো? কবি কবিতা সিংহ, শরীরে। নবনীতার সামনে। সপ্তকণ্ঠা। দুজনেই একসঙ্গে গঙ্গোত্রীধামে গিয়ে হাজির? বললেই হোলো? এতক্ষণ তবু সব ঠিকঠাকই হচ্ছিলো, এবারে গল্প বানানো শুরু। এই ভাবছেন তো? তুল করছেন, গল্প নয় সত্যি। তুললে হবে না, এটা গোড়া থেকেই ম্যাজিকট্রিপ। গুপী গাইন! তাই এরকম হোলো। কবিতাদি, পুতুল, ঘুচাই, সমরেন্দ্র—মহাখুশি স্বগোত্রের মানুষ পেয়ে। আমিও খুব খুশি। পিকো-ঘুচাইতে মুহূর্তে শ্রামদেশী যমজ হয়ে গেল! সমরেন্দ্র আর পুতুলের সঙ্গে জুড়ে গেল রঞ্জন। এই ট্যুরিস্ট লজেই উঠেছেন আমাদের তেঁতুল-পাতার নি-সঙ্গীর। মেসোমশাই আমাকে দেখে যতখানি খুশি—ততটাই লজ্জিত—“যাক—তোমরা এসে পড়েছো! ইয়ে, জাখো, আমি তো বুড়োমানুষ, আমার কোনো হাত ছিল না—”

আমি জানি। বুড়োমানুষদের এক ফোঁটাও কোনো হাত-না থাকার দিনেই আমিও বুড়ো হবো।—“মেসোমশাই, আপনি কিছু ভাববেন না। আমাদের কোনোই অসুবিধে হয়নি।”

“ঠিক তো মা? যাক!”

নিচের বাজারটা ছোট্ট, সেখানে অল্পই দু’চারটি চা-জিলিপি-পকৌড়ার দোকান, চা খেতে গিয়ে আবার দেখা শশিগু দেওঘরের বাবাজীর সঙ্গে। ব্রহ্মচারীর সঙ্গে তাঁর চেনাশুনো আছে দেখা গেল। সম্ভবত গুরুভাই। একটা গ্র্যাণ্ড রি-ইউনিয়ন চলতে লাগলো। চা এবং গঙ্গাজলের মধ্যে বসে।

সন্ধ্যায় গঙ্গামন্দিরে আরতি দর্শন করলুম প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে। বড়ো ভালো লাগলো। অবাক হয়ে দেখলুম এবং কানে শুনলুম, এখানেও সেই বিরাট দক্ষিণ ভারতীয় ভৈপু (এই কি তুর্ঘ?) বাজছে, কর্ণাটকের মন্দিরে যা শুনে প্রথম মুগ্ধ হয়েছিলুম।

বজ্রীনাথের মন্দিরে শুনেছি কেবালার নাথুদ্রি ব্রাহ্মণ পূজারী হন। এই এক

আশ্চর্য নিয়মে দক্ষিণ সমুদ্রকে গাঁথা হয়েছে উত্তরের তুহিন শিখরের সঙ্গে। এই গঙ্গোত্রীতেও তো দেখছি দক্ষিণী বাজনা বাজছে। কে বলে ভারতবর্ষ এক দেশ নয় ?

৪৯

### মহাদেবের জটা

অঙ্গনেই অনেক সাধুসন্ন্যাসীর আড্ডা। ধূনিটুনি জলছে, গাঁজাটাজা চলছে। দক্ষিণে সিঁড়ি নেমেছে ছোট্ট ভগীরথ মন্দিরে, সেইখানেই নাকি প্রথম গঙ্গাদেবী উৎসারিত হয়েছিলেন। এদের মতে ছ'হাজার বছর আগে। এখন গ্রেসিয়ার সরে গেছে বিশ কিলোমিটার দূরে। ভগীরথ পর্বতের গ্রেসিয়ার থেকে নেমেছে গঙ্গা। শুনেছি তুষার নদীরা হাজার বছরে মাত্র এক ইঞ্চি মতন সরেন। সেই হিসেবে সময়টা হাজার হাজার বছর আগে হবার কথা। এই সিঁড়ি থেমেছে গঙ্গা-তীরে। তারপর উপলকীর্ণ বালির পথ গেছে জলধারার কাছ পর্যন্ত। আরতির বাজনা থেমে যাবার পরে নৈশব্দ্যে অন্ধকার যেন ঘনতর হোলো। গঙ্গার কল-ধ্বনি মস্তুর। পায়ে পায়ে এগোলুম জলের দিকে। প্রচণ্ড শীতল বাতাস দিচ্ছে—এগোনো সমীচীন মনে হোলো না। অসুস্থ হলে অগ্নদের মহামুশকিলে ফেলবো। হেঁটে হেঁটে লংকাচটিতে ফেরা বাকি। গঙ্গাতীর থেকে ফিরে এসে ট্যুরিস্ট লজ্জেই থেয়ে নিয়ে বালকনিতে দাঁড়িয়েছি। পিছনের পর্বতের বিপুল ছায়ার দিকে তাকিয়েই হঠাৎ স্পষ্ট দেখলুম শিবের মাথায় চাঁদ। হিমালয়ের বিরাট অন্ধকার ছায়াশরীরের মাথায় এক অসম্পূর্ণ রূপোর তৈরি চাঁদ উঠছে। মুহূর্তেই পুরাণের চিত্রকল্পটির সত্যতা চোখের উপর প্রমাণিত হয়ে গেল। ছায়ার নীচেই গঙ্গার বিকবিক্ কুলুকুলু।—“নদী, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ? মহাদেবের জটা হইতে।”

ওই তো মহাদেবের জটা। জটাজুটধারী চন্দ্রমৌলি দেবাদিদেব। এই স্থির, নির্মল প্রাপ্তির অহুভূতি নিয়ে শুতে গেলুম। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, আর বেশিক্ষণ বাইরে দাঁড়ানো অসম্ভব।

শুতে গেলুম, কিন্তু ঘুম আসে না। ছোট্ট ঘর, তিনজন লোক, ঠিক উত্তর কাশীর সেই ট্যুরিস্ট লজের মতোই। কেবল আরো ছোট ঘর। লণ্ঠন দিয়ে গেছে। সেটা কমিয়ে কোণে রেখেছি। একটাই জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল একটা ঊঁচু পাথরের তৈরি দেয়াল। প্রচণ্ড শীত। সে জানলাও বন্ধ করে দিতে হয়েছে। ছাদে আর দেওয়ালের মধ্যে যথেষ্ট বড় বড় ফাঁক আছে, দম আটকে

মরবো না। রঞ্জন হঠাৎ বেদম হাঁচতে এবং ঠকঠক কাঁপতে শুরু করলো। ক্রমশ দুটো কঞ্চল প্রাঙ্গ দুটো পুলোভার। পায়ে মোজা, কানে মাথায় উলের মাফলার। তবুও ঠকঠক। উঠে এবার বিলিতি ওভারকোট চাপালো। তবুও দাঁতে দাঁতে মিউজিক। এটা স্ট্রেট ব্র্যাণ্ডের কেস! ওপরে উল চড়িয়ে কিছু হবে না, ভেতরে অ্যালকোহল চড়িয়ে গরম করতে হবে। চটপট ব্র্যাণ্ডি গিলিয়ে ঝটপট কঞ্চলের তলায় গোর দিলুম খরখর-কম্পিত রঞ্জনকে। তার পালা চুকলো। এবার পিকোলো। উঠলো। মাথায় কমফর্টার জড়ালো। শুলো। আবার উঠলো। গায়ে বড় কোটটি চড়ালো। শুলো। আবার যেই উঠেছে আমি বললুম, “দাঁড়া, এবারে গরম হওয়ার গুথুখটা খেয়ে ফ্যাল!” তারপরে আমিও যথাক্রমে কমফর্টার, কোট, গরম হয়ে ওঠার গুথুখ ইত্যাদি ইত্যাদি। অবশেষে রাত দেড়টা নাগাদ গঙ্গোত্রীদেবী দয়া করে তিনটি শীতকাতর হিমার্ত সন্ধ্যা বঙ্গমন্ডলকে নিদ্রাদেবীর উষ্ণ কোলে তুলে দিলেন।

৫০

### ইয়েতি!

প্রদিন অন্ধকার থাকতে থাকতে উঠেছি। পরিষ্কার বাথরুমে যাবার দুর্লভ পুণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু বাদ সাধছে পিকো স্টুপিড। পিকোলোর ধারণা, তার মহার্ঘ্য মা-জননীটিকে কোনো ইয়েতি কিম্বা রেপিস্ট খপ্প করে তুলে নিয়ে যাবে বলে ঘাপটি মেরে ওং পেতে আছে নিশ্চয়। পিকো সঙ্গে যাবার জন্তে জেদ ধরলো। সে পালোয়ান গেলে অবশ্যই দুষ্কৃতকারী প্রাণীরা পালাতে পথ পাবে না! শেষ পর্যন্ত মায়েতে-মায়েতে দোর খুলে গলিতে নামি। বাড়ির পিছনে বাথরুমের সারি। সেখানে গুটা কে? ইয়েতি নাকি! দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছে? ছেলে-টাকে চেনা-চেনাই লাগলো। এই লজের ক্যান্টিন চালায়।—“কী? চা ছয়া?”

“আবি কায়সে হোগা? চুলা তৈয়ার করতা ছায়।” তারই জিম্মায় পিকোকে সমর্পণ করি। আহা! ফিনাইলের সুবাস মনেপ্রাণে নটভৈরব বাজিয়ে দিলো। এই প্রথম!

আমি বেরতে পিকোলো গেল। সামনে ধ্যানস্থ শান্ত ভোরের হিমালয়। নীচে উত্তাল গৈরিক শোত। কাল রাত্রের সেই জ্যাস্ত ছবিটা মনে ভেসে এলো। কুয়াশাচ্ছন্ন তারাহীন আকাশে বদ্ধ অন্ধকার যেন কঠিন, ঘন ওজনদার ধাতব পদার্থ হয়ে উঠেছে—সেই পটভূমিতে আরো অন্ধকার, আরো ভারী পাথরের মূর্তির মতো হিমালয়ের একটি অংশ। যেন জটাজুটধারী শিবের সিলুয়েট—মাথার ওপরে চাঁদ। পায়ের কাছে চিক্‌চিক্‌ করছে গঙ্গা। সকালে সেই আকাশই নীলচে, বেগুনী, স্বচ্ছ,

কিনকিনে পাতলা, বাতাসে যেন থিরথির কাঁপছে, পাহাড়টি ফিটফাট সবুজ পরিচ্ছন্ন, দাড়ি কামানো তরুণের মতো, আর উত্তাল, পিঙ্গলা, কলস্বনা গঙ্গা নিজেই যেন শিবের জটার একটি গুচ্ছ।

পৃথিবীতে যে কোনো ব্যাপারেই প্রথম হতে পারলে যে বিমল আনন্দ হয়, সেটা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করে ঘরে ফিরে দেখি রঞ্জন বসে চা খাচ্ছে। এক পাহাড়ী বালক তাকে চা দিচ্ছে। সে পিকোকে দেখেই বলল, “আপকো ঘড়িকা ভাও কিতনা!” পিকোলো আমার দিকে প্রশ্নভরা দৃষ্টি মেললো। এই বিদেশী ইলেকট্রনিক ঘড়িটা আগে ওর বাবার ছিল। এর দাম আমি জানি না। এত সোয়েটার, কোটের হাতার নীচে ঘড়িটি আবিষ্কার করাও সহজ নয়। বাঃ। খোকার বেড়ে নজর আছে তো? অস্তুদৃষ্টি আর কাকে বলে!

“ঘড়িটা আমরা বেচবো না।”

“না না, সেজঙ্গে নয়। একজন আমাকে এই রকমই একটা ঘড়ি বিক্রী করতে চায়। দামটা জেনে নিতে চাইছি। সে বলছে সাড়ে তিনশো। নেপাল সে লায়া। আফ্রিকান, ইয়া জাপানীজ হোণা।”

“এই রকম চারটি বোতাম আছে? স্টীলের ঘড়ি তো? প্লাস্টিক বডি নয় তো? সাড়ে তিনশো খারাপ নয়। অ্যালার্ম আছে কি? আমার ঘড়িতে তিন রকমের অ্যালার্ম আছে, অ্যালার্ম এনোগ্রাফ আছে, স্টপওয়াচ আছে, ডেট আছে, ডে আছে।”

“অ্যা, এত সব আছে? মিউজিকাল অ্যালার্মও আছে?”

“এবারে ঘড়িটা চুরি যাবেই।” রঞ্জন ফিসফিস করে জানালো, “পিকো যা গুণকীর্তন শুরু করেছে! ঘড়িটা সাবধানে রাখতে বলব।”

“মিউজিক নেই, অ্যালার্ম আছে।”

“আমরাটা ভালো করে আগে দেখে আসতে হবে। আর চা চাই? আরতি দেখতে যাবেন না? শুরু হয়ে গেছে এতক্ষণে।”

“নিশ্চয়ই যাবো!” মন্দিরে ছুটলুম। চা চুলোয় যাক। ছুটলো রঞ্জনও। পিকোটা পাশ ফিরে ঘুমোতে লাগলো।

৫১

### গঙ্গাভুলসী

বাজারে গিয়ে মিস্টার মুখার্জীর নামে পূজোর থালা কিনে এনে পূজো দিলুম গঙ্গামন্দিরে। বিশ্বাস করে দেওয়া পরের টাকা সঙ্গে এনেছি, বাবা, সর্বত্র সন্ধ্যাবহার

করে যাই। বিশ্বনাথে, সঙ্কটমোচনেও পুজো দিতে ভুলিনি। গঙ্গাদেবীর নৈবেদ্যটিও স্বন্দর। দিব্য পিতলরঙা আয়না-বসানো ছোট্ট সিঁদুরকোঁটোভর্তি সিঁদুর (প্লাস্টিকের দায়সারা টিপ নয়), দিব্য একজোড়া নীল কাচের চুড়ি, চুলের সোনালি ট্যাসল, এলাচদানা, মটরভাজা, ধূপ আর গঙ্গাতুলসীপাতা। পুষ্পবিহীন পুজো। কোথাও ফুল নেই। পথে ফুল ফুটতেও দেখিনি। এদেশে নাকি তুলসী-গাছ হয় না, এটিই তার বদলি খাটে—কাজ-চালানো পবিত্র উদ্ভিদ। গঙ্গাতুলসীকে কিন্তু আমার খুব চেনা-চেনা লাগলো। তারপর গন্ধ শুঁকেই নিঃসন্দেহ। ও হরি! তুমি তো আমার মুসরৌ পাহাড়ের গায়ে আবিকার করা সেই আগাছা, যাতে ফুল নেই, কিন্তু পাতাতেই মিষ্টি স্বাস। পিকোর গা-গুলোনো সারাতে তোমায় ব্যবহার করেছিলুম। এখানে এসে তুমিই পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গাতুলসী হয়েছে? তা ভালো। কবিতাদি কয়েকটি শিকড়স্বল্প চারা তুলে সঙ্গে এনেছিলেন, জানি না তারা কলকাতার মাটিতে বসে গেছে কিনা। আমি ভায়ারির পাতায় যেটিকে ভরে এনেছিলুম, সে তেমনই আছে।

মন্দিরে পুজো দেবার পর সবাই দেখছি ভালিসহ গঙ্গায় যাচ্ছে, সেখানেও পুজো দিচ্ছে, গঙ্গাতুলসীর পাতা জলে ভাসিয়ে আসছে। আমিও চললুম। রঞ্জন স্বল্প। নদীর ধারে ভোরবেলা ভয়াবহ ঠাণ্ডা। স্বন্দর বালি-বিছানো সরু পায়ে-চলা পথটি মন্দিরপ্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এগিয়ে নদীতীরের বড় বড় পাথরের ভিড়ে হারিয়ে গেছে।

বাইরে পাঁচিলের ধারেই মস্ত ধুনি জালিয়ে বেশ কয়েকজন মস্তান সাধু আড্ডা গেড়েছেন। কুম্ভমেলাতে এমনি একটা দলের মধ্যে আমি ঢুকে বসে পড়েছিলুম। পেতলের বাটিভর্তি দুধ-চা দিয়েছিলেন সাধু আমাকে, কিন্তু হাতে হাতে যে কঙ্কোটি ঘুরছিল তার টার্ন আসেনি আমার। রঞ্জন বললে মহোৎসাহে, “কঙ্কের টার্ন মেয়েদের দেয় না। আমাকে দেবে। দেখবে?”

“দেখে কাজ নেই ভাই। অমনিই বিশ্বাস করছি।”

নদীতীরে পাণ্ডুরা যাত্রীদের পুজো করতে সাহায্য করছেন। যাগযজ্ঞ, তর্পণ, পিণ্ডদান, নানা রকমের ধর্মীয় কার্যকলাপ চলছে। আর চলছে এই কাকভোরে ঐ হাড়-হিম-করা উদ্দাম বেপরোয়া শ্রোতে ঘটি ডুবিয়ে ভয়ে ভয়ে মত্ত পড়তে পড়তে পুণ্যমান। জলে নেমে ডুব-টুব দেবার প্রশ্ন নেই এদিকটাতে। প্রচণ্ড ঘূর্ণি, দুবার শ্রোত। ভাগীরথী অগভীর, পার্বত্য নদীজলে হাঁটুও ডোবে না। কিন্তু পাথরে পদস্খলন ঘটলেই সিঁধা মানেরী ড্যাম। উত্তরকাশী। সেই মরা মহিষের অবস্থা হবে। কিংবা হয়তো মধ্যপথে যমুনা ভুলে নেবে, চলে যাবো সেই লালকেন্না,



তাজমহল, মথুরা, বৃন্দাবন। হয়তো আবার দেখা হবে জালন্ধরের ঠাকুমা আর তাঁর সহিসের সঙ্গে, সেই অদেখা পঞ্চদশীর সঙ্গে। স্থানমাহাত্ম্যে কতটা মনের উন্নতি হয় জানি না, তবে অধিকাংশ নারীরই দেখলুম বসন-ভূষণে আর রুচি নেই। এই ভূষণটির নাম লজ্জা। এদের হায়াহীনতায় আমার মতো বেহায়াও লজ্জা পাচ্ছে।

নাঃ, এখানে স্নান আমার পোষাবে না। একেই সোজা তুষার নদী থেকে বেরুনো বরফগলা পানি। যতই পবিত্র হোক, একবার বৃকে সর্দি বসলেই ব্যাস। একলা তো আসিনি যে অস্থখ করলে ভগবান দেখবেন। এখন ভগবান নিজে না এসে আমার মেয়েকে, ভাইকে ডেপুটি করে দেবেন। অতএব কমলাকান্তের উপদেশই ভালো, আপনারে আপনি রাখো, যেও না মন কারো ঘরে।—“চল্ রঞ্জন, আমরাও গঙ্গাতুলসী ভাসিয়ে আসি নদীর স্রোতে।” নমো গঙ্গা। নমো গঙ্গায়ৈ নমঃ।

তারপর আরেকটু এগোই। প্রথমে শুধু জলস্পর্শ করে বসা। তারপরে সাহস বাড়ি। তখন অঞ্জলিতে পুণ্যবারি গ্রহণ করে প্রথমে বাবাকে, তারপর শ্বশুর-মশাইকে জলাঞ্জলি দিই। তৃপ্ত হও, হে মৌগদ্যা-বংশোদ্ভূত দেবশর্মাঃ, তৃপ্ত হও, ওহে ধনুস্তরী গোত্রের সেনশর্মাঃ। তোমরা আমার অপটু হাতের এই নির্মল পবিত্র উদকে আরেকবার চিরতরে পরিতৃপ্ত হও। পিপাসামুক্ত হও। বাসনামুক্ত হয়ে এই বিচিত্র বিশ্ববীজের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হও তোমরা। আর স্মরণ করি তোমাদের, যাদের জল দেবার কেউ নেই। হে অভাগা আত্মারা, তোমরা আমার ভালোবাসার অর্ঘ্য গ্রহণ করো। আমার প্রদত্ত উদকে তোমাদের তৃষ্ণামোচন হোক, আত্মার শান্তি হোক।

এইটুকু, দু’মিনিটের মাত্র কথাবার্তা। বাবা, শ্বশুর অথবা এইসব নাম-না-জানা স্বজনহীন পরিজনদের সঙ্গে কথা কইতে ক’মুহূর্তই বা লেগেছে? হাত অসাড় হয়ে গেছে বরফজলে। এরা নাইছে কী করে? কী করে আবার, যে ভাবে পঙ্কতেও গিরি লঙ্ঘন করে, সেই উপায়ে।

৫২

### দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গড়ে

উচ্চৈঃশ্বরে সংস্কৃত মন্ত্র পড়তে পড়তে সত্তা নেয়ে ওঠা এক সাধু জলহুকু জটা ঝাঁকাতো ঝাঁকাতো কাঁপতে কাঁপতে এসে গঙ্গামন্দিরের চওড়া পাঁচিলের ওপরে উঠে বসলেন। রোদ উঠলেই এখানটায় রোদ পড়বে। সাধু শুরু করলেন ভজন গান।

মাথার কাঁকুনিটা আর থামলো না, গানের ছন্দে গ্রথিত হয়ে গেল।

আধফোটা সকালে হিমালয়ের খোলা হাওয়ায় গঙ্গার কলধ্বনির সঙ্গে ভাঙা পাঁচিলে তরুণ সন্ন্যাসীর ভোরালী ভজনের স্বর কানে রয়ে গেল।

সন্তোষাত তিনটি দেহাতী মানুষ নদীর ধারে ষড়যন্ত্রীর মতো উবু হয়ে বসেছে। বয়স্কাটি একটি বড় কোঁটো খুলে তিনটি ছোট কোঁটো বের করলেন, একটিতে প্রচুর কাঠের চোকলা, পাতলা এবং কুচোকুচো, একটিতে ঘি, আর একটাতে মেটে সিঁদুর। এছাড়া ধূপ, দেশলাই, একজোড়া কাচের চুড়ি। আর গঙ্গাতুলসী।

তিনটি ছোট ছুড়ি সাজিয়ে হোমের উজুন হলো, তাতেই ঐ ছুতোরের দোকান-কাঁট-দেয়া কাঠের চাঁচি ঢেলে তাতে ঘি দিয়ে আগুন ধরানো হলো। ছোট প্রদীপ বেকুলো সলতে সমেত, জ্বালানো হলো। নদীর তীরে প্রবল বাতাসে দীপ জলে রইল না। হোমাগ্নিও কেবল নিবে যায়। ধূপ জ্বললো, চিনির এলাচদানা বেকুলো আরেকটা খুদে কোঁটো থেকে, তিনজনের মাথা একত্র করে ভক্তিভরে দেহাতী উচ্চারণে মন্ত্রপাঠ হলো, স্বতাহতি দেওয়া হলো। বারে, এরা তো বেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ তীর্থ-পার্টি! ব্রাহ্মণ পাণ্ডা ছাড়াই দিব্যি পূজোপাঠ মায় যাগযজ্ঞাদি পর্বস্তু করে ফেলছে। দেহাত থেকেই বয়ে এনেছে পিকনিক-পূজোর ঘাবতীয় দরকারী সরঞ্জাম মায় মন্ত্রটি পর্যন্ত। এই পুতুলখেলার মতো মিনি-হোমানল জেলে মিনি-পূজো দেখতে খুব ভালো লাগছিলো।

সবটা দেখা হলো না। আমার সঙ্গে সঙ্গেই কোট প্যান্টলুন পরা এক ভদ্রলোক হাতে পূজোর ডালি নিয়ে পাণ্ডার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাতীরে আসছিলেন উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রপাঠ করতে করতে। এখানে এসে সেটা স্থগিত ছিল। আমি আর তাঁকে খেয়াল করিনি। হঠাৎ আবার প্রচণ্ড উৎসাহে দশদশে মন্ত্রপাঠ শুনে দেখি সেই ভদ্রলোক—পরনে শুধুই আঙুরওয়াড় আর পৈতে। সমস্ত পাট-পাট করে চুল ঝাঁচড়াতে ঝাঁচড়াতে প্রচণ্ড চোঁচামেচি অর্থাৎ মন্তোচ্চারণ করছেন, দান সমাপ্ত। ক্ষুরধার বাতাসে আমিই প্রায় পোশাকের মোড়কস্বকু নিহত হবার যোগাড়। ভক্ত ভদ্রলোক মন্ত্রের ঢাল-তলোয়ারে নিজেকে রক্ষা করছেন। ঐ ভাবে পূজোও বোধ হয় করেছেন, কে জানে? নাঃ, এলেম আছে। একেই কুজু বলে।

যেসব মহিলারা ‘স্ক্রিপ’ করছেন গঙ্গাতীরে (কিন্তু ‘টীজ’ করছেন না) তাঁদেরও আছে। ভক্তি এবং শক্তি। শিল্প-সাহিত্যে নারীদেহের গুণগান শুনে শুনে নিজেদের নাজানি কী একটা দারুণ ব্যাপার মনে হয়েছিল। এখানে একসঙ্গে এতগুলি এত বয়সের এত বৈচিত্র্যময় উন্মুক্ত নারীমাংস দেখতে দেখতে গা গুলিয়ে

উঠলো। অনেকেই যৌবনবতী, বয়স যাই হোক। কিন্তু এই প্রথম মনে হোলো, লজ্জা না থাকলে বোধ হয় রূপ ব্যর্থ হয়। সবাই এরা ধবধবে ফর্দা, বাঙালী চোখে তো ফর্দা মানেই ‘প্রকৃত সুন্দরী’। গঙ্গার ঘাটে আমি তর্পণ করতে যাই মহালয়ায়, অনেক বাঙালী বেদিং বিউটি দেখি, সেখানে এতটা অলজ্জা দেখিনি। উত্তর ভারতের চামড়ার জাতই অগ্ন। একটিও শ্রামল শরীর দেখলুম না। জামার নিচে বেশ মজার একরকম ভি-গলা হাতকাটা রঙিন স্ফুটী ফতুয়া পরে আছেন—যাত্রী-যাত্রিণী দুজনাই—পিরানের মতো তেরছা করে বুকে একটা খাপ। এবং দুটি পকেট। ফতুয়ার মধ্যেই, বুঝলুম, যাত্রার মালমশলা সর্বস্ব থাকে। বুকে ছুরি না বসালে সেন্সব পকেট কাটা যাবে না। যমুনোত্রীর বৃদ্ধা পাঞ্জাবী মহিলার পরনে একরকম ফতুয়া নিশ্চয়ই ছিল না। তাই “মেরে থৈলিয়া”!

রঞ্জন গেল কোথায়? সে তো গঙ্গারীয়ে নেই! খুঁজে পেতে দেখি রঞ্জন সেই ধুনি-জালানো সাধুদের আড্ডায়, নেমন্তলবাড়িতে কাঙালিতোজনের আশায় যেমন দাঁড়ায়, তেমনি দাঁড়িয়ে আছে একধারে। আগুনে গরম হচ্ছে, না গঙ্গিকায় কে জানে?—“চ ব্যাটা চ, বাড়ি যাই। চা-জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়ি।”

ঘুচাই আর পিকো ইতিমধ্যে উঠে নিজের মনে ঘুরছে। লাফাতে লাফাতে এসে বললে, “মোনীবাবার আশ্রমে গিয়েছিলুম মা! কোটো তুলেছি!” সবাই মিলে ব্যালকনিতে গিয়ে বসলুম ব্রেকফাস্ট খেতে। ভগীরথ পর্বতের বরফচূড়োটি দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে তার তুষার নদী, স্বর্ঘ উঠে গেছেন। কবিতাদির গলার রুদ্রাক্ষের মালাটি সারদামায়ের সাক্ষাৎ আশীর্বাদ-ধন্য—দেই গল্প শুনতে শুনতে আলু-পরটা আর চা খেতে খেতে নেমে যাবার জন্ত তৈরি হয়ে গেলুম। রঞ্জন ভয়ানক ‘তং’ করছিল—গোমুখ যাবেই। কাল রাত্রেই ঠক্কু কাঁপুনি এর মধ্যেই ভুলে গেছে। এ তো গঙ্গোত্রী। গোমুখ আরো বিশ কিলোমিটার উত্তরে, তুষার নদীর মধ্যে। কে তোকে যেতে দিচ্ছে? মরে যাবি তো রে ঐ আহ্লাদী-পেহ্লাদী শরীর নিয়ে। আসলে সমরেন্দ্র-পুতুলরা গিয়েছিল বলেই ওর এত দুঃখ। যেতে ওদের বেশ কষ্টই হয়েছে বললে। ঘুচাই, পিকো আর রঞ্জনকে বললুম, “বড় একটা জলপাত্র কিনে, বেশ করে গঙ্গোত্রীর নিরুন্মল পানি ভরে নে।” খানিক বাদে তারা ‘বাপুরে মারে’ করতে করতে জল নিয়ে ফিরল—“হাতে প্যারালিসিস হয়েছে”—“আট্টু হলেই আজ জলের মধ্যে পাত্র বিসর্জন হয়ে যাচ্ছিল”—“ওরে বাবা”র মধ্যেই কবিতাদি জানালেন, উনি ঐ জলে ছুদিন সশরীরে সবসঙ্গে চান করেছেন। ভিজ়ে কাপড়ে, এই বাতালে—! নাঃ, সারদামায়ের আশীর্বাদী রুদ্রাক্ষের ক্ষমতা আছে!

## ভাগীরথী

ঘুচাই আর পিকো আবার পালিয়েছে। গঙ্গোত্রীর ট্যুরিস্ট লজের কর্মকর্তা ছেলেটির বয়স বেশি না। সে খুব একটা ধর্মকর্মের জীবনে বিশ্বাসী বলে মনে হল না। তার খুব ফাঁকা, একা লাগে এখানে।—“এই তো মোটে ছ’মাসই লোকজন আসে, তারপর সব বন্ধ স্থানস্থান হয়ে যায়। একটা সিনেমা নেই, থিয়েটার নেই। উত্তরকাশীর আগে কোনো শহরই নেই। শহরে মাহুঘ টিকতে পারে এখানে? এখানে ঐ এক মাধু-সন্নিহিত আর মিলিটারি রেজিমেন্ট, এই দু’ধরনের সংসারত্যাগী ব্রহ্মচারীর পক্ষেই বাস করা সম্ভব। মন্দিরের দরজা বন্ধ হয় দীপাবলীতে। কেদার-বদ্রী গঙ্গাঘন্থনা, সব মন্দিরের। পুরো উত্তরাখণ্ডেরই দরজা বন্ধ হয়ে যায়, দীপ নিবে যায়, শঙ্খঘণ্টা স্তব্ধ হয়ে যায়। লজ বন্ধ করে আমরাও তখন উত্তরকাশীতে নেমে যাই। বেয়ারা, কুক এরা সবাই তো টেম্পোরারি। এদের তখন চাকরি যায়। আমি অবশ্য সরকারী চাকুরে। আমার চাকরি যায় না।”

ছেলেটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ বুঝতে পারলাম চা-ওলা ছোকরার দামী ঘড়ির জগ্ন অমন লোভ কেন। ছ’মাস পরেই ওর জীবনে তুষ্কার-যবনিকা নামবে। এর মধ্যে যা পারো, যতটা পারো, যোগাড় করে নাও। দুদিন বাদে ভাতও জুটবে কিনা ঠিক নেই। ট্যুরিস্ট লজের পাশেই কালীকথলী ওয়ালার ধর্মশালা। মাটির ঘুপচি ঘর। পাশাপাশি ৫/৬টা দরজা-জানলা আছে। সামনে ফালি বারান্দা। যাত্রী ভর্তি। ইলেকট্রিক আছে বলে মনে হোলো না। ওপাশে গ্রামের গৃহস্থবাড়ি। পিকোলো একটি বউয়ের সঙ্গে ভাব করলো। বউটি ওর সমবয়সীই হবে, নাম ভাগীরথী। এই গায়েরই মেয়ে। শাশুড়ীটি খুব তিরিফি। শাশুড়ী এসে পড়লেই ভাগীরথী ভয়ে আর কথাই বলছে না। একটা টাটকা টোম্যাটোর মতন মুখটা ভাগীরথীর, হাসিখুশি, স্বাস্থ্য-প্রাণে উজ্জ্বল। কোনোদিন উত্তরকাশীর চেয়ে দূরে যায়নি তাদের বাড়ির কেউ। কলকাতাকে কিন্তু সে নামে চেনে। গর্বের হাসি হেসে বলেছে—“উদ্ধার তুমলোগ গঙ্গাজী কো ভাগীরথী ক্যাহতা, না?” তার কাছে কলকাতার মানে, গঙ্গার যাত্রার শেষ ইন্সটিশান। গঙ্গাকে দিয়েই তার ভারতবর্ষের মাপজোক। আর নামের মাহাত্ম্য সে নিজেকেও পবিত্র আর বিশিষ্ট মনে করে। গল্প করতে করতেই সংসারের কাজ করছিল ভাগীরথী। তারই কাছে পিকো গুনল, এখানে হেলিকপ্টারে চড়ে ইন্দিরা গান্ধী এসেছিলেন। অমনি ঘুচাই আর পিকো ছুটলো হেলি-প্যাড দেখতে। যদি

এসে পড়ে কেউ ? বিরলার কি মিসেস গান্ধীর কি ধীরেন ব্রহ্মচারীর প্লেন ?

খানিক বাদেই আবার পাইপাই ছুটে ফিরে এল। কোথায় যেন সাধুদের ছবি তুলতে চেষ্টা করেছিল, তাঁরা চিমটে তুলে তেড়ে এসেছেন। ঘুচাইরা দুদিন দণ্ডী-স্বামীর ধর্মশালায় ছিল। প্রসাদ থেয়ে স্বহস্তে বাসন মেজেছে। এঁটো পেড়েছে। সেই নতুনত্ব খুব ভাল লেগেছে। পিকোর মহাভূখু। ধর্মশালায় থাকা হল না। যত বলি, বাড়ি গিয়ে রোজ-রোজই না হয় এঁটো পাড়িস বাসন মাজিস, চটে যায়। —“তোমার কেবল ইয়াকি।”

“আর তোমার কেবল গুন্স। আলবার্ট পিটো কাঁহাকা।”

“চলরে ঘুচাই, ওদিকটা ঘুরে আসি। ওখানে গঙ্গার তীরে একজন সাধু ঘুরে বেড়াচ্ছেন, গায়ে একটুকরো স্নতো পর্যন্ত নেই অথচ হাতে একটা লম্বা বাঁশ। তাতে নানান রং-বেরঙের কাপড়ের টুকরো আঁটা—কাপড়গুলো ঠাণ্ডা হাওয়ায় উড়ছে—দেখেছিস তাঁকে ?”

“না তো ! চল চল দেখি !” দুজনে মুহূর্তে হাওয়া।

৫৪

### শিবহৃষ্টস্বামী

খানিক পরে ঘুচাই আর পিকো ছুটতে ছুটতে এসে বললো, “কলম আছে ?”

“কী হবে ?”

“দরকার আছে। ঠিকানা লিখতে হবে।”

“একজন সাধুর সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হয়েছে তো !”

কলম নিয়ে লাকাতে লাকাতে আবার দুজনে পালালো। দুটো প্রজাপতির মতো নেচে বেড়াচ্ছে। ওপর থেকে দেখলে দুজনেই গঙ্গোত্রীতে কিছুটা বেমানান। ছোট করে ছাঁটা চুল, পরনে ব্লু জীনস আর সোয়েটার, আমাদের ছেলেবেলায় এরকম মাজপোশাককে বলত ‘ট্যাশ ফিরিঙ্গিয়ানা’। ঠিক দুই বোনের মতন দেখাচ্ছে। দুজনেরই চোখে মোটা কাচের ভারী চশমা আর পায়ে ফিঙিয়ের পাখার লঘুচাঞ্চল্য। মালপত্র গুছিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, মেয়েদের টিকি দেখা যাচ্ছে না। ট্যুরিস্ট লজের ছেলেটি বলছে, “আজই চলে যাচ্ছেন ? অথচ আগামী কাল ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের সেই তিথি। কালই বাৎসরিক গঙ্গাপূজার উৎসব। গঙ্গাদেবীর মন্দিরের মূর্তিকে নদীতে নিয়ে যাওয়া হবে শোভাযাত্রা করে। লোকে দূর দূর থেকে এই গঙ্গাসেবার পুণ্যস্থানের জন্মেই আসে। আপনি থেকেও চলে যাবেন ? দেখে যাবেন না ? স্নান করবেন না ?

“আজ কেউ গঙ্গোত্রীধাম ত্যাগ করে যায় ?”

কিন্তু কবিতাদি তো যাচ্ছেন। বাঙালীদের দলটিও আগেই নেমে গেছে।  
এঁরা কেউ কি জানেনও না কাল এত বড়ো উৎসব? কবিতাদি বললেন, “জানি  
বৈকি। কিন্তু কাল এখানে যে কী কাণ্ড হবে তা ধারণা করতে পারছো না।  
দেহাতী লোক শ’য়ে শ’য়ে আসবে। বাসে আর জায়গা থাকবে না ফেরার সময়ে। :  
তারাও তো সব ফিরবে? তাই আগেই—”

কবিতাদির ছেলে পুতুল বললো, “তাছাড়া খাবার-দাবারেরও অস্ববিধে হবে—  
ছোট জায়গা, যথেষ্ট কিছুই নেই—নোংরামিও হবে—নাইতে পারবেন না, প্রচণ্ড  
ভিড় হবে—ছোটখাটো কুস্তমেলার মতো।”

সমরেন্দ্র বললে, “আজ কেটে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। নতুন আর কী  
দেখবেন?”

আমি ওদের থাকতে বলছি না, বাসে জায়গা না পাওয়ার সমস্যাটা খুবই সত্য।  
কিন্তু আমাদের তো গুণ্ডিয়ার ম্যাজিকট্রিপ, ওসব ঝামেলা নেই। আমি তবে  
কেন থেকেই যাই না? একটা দিনের তো মামলা। কালই বরং বিকেলের মধ্যে  
নেমে যাবো। ভিড় তো কালই ভাঙবে না, যারা আসবে তারা তো কালই  
নামবে না?

পিকো আর ঘুচাইকে খুঁজতে মন্দিরে গিয়ে দেখি পাঁচিলের ওপরে বসে বসে  
ছুজনে এক গাড়ামাথা সাধুর সঙ্গে গল্প করছে। আমি যেতে পিকো ছুটে এসে  
বললে, “এই নাও, এই খামটা একটু রেখে দাও তো—” বলে একটা নোংরা মতন  
খাম আমাকে এগিয়ে দিয়েই পালালো।

ঘুচাই চোঁচিয়ে বললো, “ওতে আড়াই হাজার টাকা আছে—” বলে ফের গল্প  
করতে লাগলো।

আমি চোঁচাছি—“চলে আয় ঘুচাই—ওঠ, বাস চলে যাবে—” বলতে বলতে  
হঠাৎ কথাটা বোধগম্য হলো।—“ঘুচাই, কী বললি?”

“ওতে আড়াই হাজার টাকা আছে?”

“কার টাকা? কিসের টাকা?”

“পিকোর কাছে রাখতে দিয়েছে। ঐ যে ঐ সাধুর টাকা। বলেছে, কলকাতায়  
গিয়ে আবার ফেরত নেবে।”

“কেন? ও বাবা, ওসব হবে না। এফুনি ফেরত দাও। পরের ধন আমি  
যক্ষ হয়ে সামলাতে পারবো না বাপু! আমার নিজেরই সর্বস্ব হারিয়ে যায়।  
শেষকালে আড়াই হাজার টাকা নিজের পকেট থেকেই গচ্ছা দিতে হবে।” সাধুর

কাছাকাছি তেড়ে যাই খব্বুখব্বু করে। ইয়ার্কি নাকি ? কাছে গিয়ে দেখি গল্পটা হচ্ছে ইংরিজি ভাষাতে।

সারেব সাধু। ও, তুমি বুঝি কৃষ্ণকন্যাস ? “মাই নেম ইজ শিবখুষ্টস্বামী, আই আম আ ক্যাথলিক সন্ন্যাসী ইন লাভ উইথ হিন্দুইজম অ্যাণ্ড ইন্ডিয়া।”

“নমস্কার।”

খাস ইংরেজি উচ্চারণ। ওরে বাবা, একি মাল ? একে তোঁ সোজাহুজি সি আই এ কিছা কে জি বি কোনো প্লট-এই ফেলা যাচ্ছে না ? বেশি ঝামেলায় না গিয়ে আমি সোজাহুজি ‘পয়েন্টে’ চলে যাই—“সব আপনার টাকা ?”

“ঐ একরকম বলতে পারেন। টাকা কি কারুর হয়।”

“আমি এর দায়িত্ব নিতে পারব না।”

“দায়িত্ব তো আপনার নয়। আমি ওটা আপনার মেয়েকে দিয়েছি।”

“আমার মেয়ে ছোট, তার দায়িত্বটাও এখনও আমারই। ধরুন যদি এখন আমার মেয়ে হঠাৎ মরে যায় ? - হিন্দুধর্মে বলে অশ্লী মরতে হয়।”

“মরবে কেন ? বালাই ষাট ! বাচ্চা মেয়ে !”

“বেশ। ধরুন হয়তো আপনিই স্বর্গে গেলেন। আর টাকা ফেরত নিতে এলেনই না। তা হলেও তো ও শ্লী হয়ে মরবে।”

“শ্লী কেন ? ওকে তো আমি ঋণ দিইনি ?”

একমুখ হেসে সাধু বলেন, “ওটা তো ওকে আমার ‘দানম্’। দান নিলে শ্লী হবে কেন ?”

“‘দানম্’ মানে ? আমার মেয়ে হঠাৎ আপনার দান নিতেই বা যাবে কেন। আপনি কলকাতায় গিয়ে টাকাটা ফেরত নেবেন বলেই না ও রেখেছে।”

“তখন সেইটে হবে আমাকে ওর দানম্। ইচ্ছে না করলে নাও দিতে পারে। টাকাটা এখন তো ওরই সম্পত্তি। আমি দিয়ে দিয়েছি।”

“বেশ কথা। ওর সম্পত্তি। সেটা দিয়ে ও কী করবে ?”

“পিকোলো জানে। জানো না পিকোলো, টাকাটা দিয়ে কী করবে ? আশ্রম হবে। অনাথ শিশুদের জন্ম। ভারতবর্ষে গরীব লোকেরা বড় কষ্টে থাকে। আমি একটা জমি কিনতে চাই। ঐ টাকা সেই জগ্গে জমাচ্ছি। জমি কিনে আশ্রম করবো। অন্তরা বলল কী সব স্বীমে যেন টাকা বাড়ে। তাতে জমি কেনার সুবিধে হবে।”

এতক্ষণে বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছে সাধুকে। শিবখুষ্টস্বামী নাম ওকে দাক্ষিণাত্যের এক আশ্রমে দিয়েছে। সাধুর নাম খ্রিস্ট, ক্লাস সেভেনের পরে

এখানে ওখানে চাকরি করে বেড়িয়েছে। পনের বছর থেকে সে ঘরছাড়া। শেষে সাধু হয়ে গেছে। কিন্তু ক্যাথলিক ধর্ম তাকে শান্তি দেয় না, পাশ্চাত্য সভ্যতা তাকে তিষ্ঠতে দেয় না। তাই ভারতবর্ষ। হিন্দু ভারতবর্ষকেই সে বেছে নিয়েছে।

“সঙ্গে টাকা নিয়ে ঘুরবো না বলে হুদীকেশের এক চায়ের দোকানেও তিনশো ডলার জমা রেখে এসেছি। নেমে গিয়ে নেবো।”

“রসিদ আছে?”

“রসিদ?” আশ্চর্য সরল চোখে তাকালেন, নীলাক্ষ সন্ন্যাসী।—“না তো?”

“তবে গেছে। ও টাকা আর পাবেন না। গরিব লোক খরচ করে ফেলবে।”

“না না, ওদের দোকানে আমি রোজ চা খেতাম। ওরা খুব সৎ। টাকা মারা যাবে না।”

একগাল হাসলেন ফোকলা সাধু। না গলেই ভালো। কথা ঘোরাই।  
—“কবে ফিরবেন?”

“আর তো ফিরবো না? এবারে এখানে থাকবো বলেই এসেছি। জমি কিনবো। আশ্রম করবো। সেবা করবো দরিদ্রের।”

তারপর আমাদের বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ হল। কেদারনাথ যাবো না, গঙ্গোত্রী থেকে নেমে সোজাই বজ্রীনারায়ণে চলে যাবো শুনে শিবখুটস্বামী অত্যন্ত বিচলিত হলেন।—“সে কি? কেদারনাথে না গেলে হয়? কেদারনাথই সবচেয়ে সুন্দর।”

“এই গঙ্গোত্রীধামের চেয়েও? আরও সুন্দর হওয়া কি সম্ভব?”

“আরো সুন্দর। ইটস ওপেন-ও-পেন নট সো ক্লোজড—মনটা উদার হয়ে যায়। খোলা হয়ে যায়—কত বরফচূড়া কত তুষারনদী—না না, তোমরা অতি অবশ্যই কেদারনাথে যাবে। নইলে চারধাম সম্পূর্ণ হবে না।”

ক্যাথলিক সাধুর চারধাম সম্পূর্ণ করানোর উৎসাহে একটু অবাক না হয়ে পারি না। তারপরে বলি, “ছাথো সাধু, বড়ই কষ্ট পেয়েছি—প্রাচ্য মানসিক টেনশানে এবং গায়ে ব্যাথা। খচরে চড়ে এখনো সর্বঅঙ্গে কালশিটে। ওই অভিজ্ঞতাটি আমি আর দ্বিতীয়বার চাই না। আমি তো হেঁটে উঠতে পারবো না, হাঁপানী রুগী—তাই যাবোই না। বরং ওরা যায় যাবে, আমি গৌরীকুণ্ডে থাকবো।”

“কেন? তুমি ভাঙী নিয়ে যাবে। কষ্ট হবে না।”

“না সাধু। প্রথমত বড় বেশি খরচ। দ্বিতীয়ত, ওইভাবে যাবার ব্যয় আমার এখনো হয়নি। আমার লজ্জা করবে বুড়োদের মতন শুয়ে বসে যেতে।



তার চেয়ে না যাওয়া ভালো।”

“আরে ছি ছি! এটা কি রকম দার্জিক কথা হল? ভগবান দর্শনে যাবে, কী ভাবে যাচ্ছে, তাতে কী এসে যায়? ভগবানের কাছে যাবে, ঠিক যেভাবে তোমার শরীর সহজে যেতে পারবে, সেই ভাবেই যাও। স্বয়ং কেদারনাথকে বাদ দিয়ে টাকা-পয়সা নিয়েই বা তুমি কী করবে? ভাঙী নাও, কাঙী নাও। ঘোবনের গর্ব কোর না। ঈশ্বরের সমীপে বিনীত হয়ে, বিনম্র হয়ে যেতে হয়।”

হঠাৎ ভয়ঙ্কর লজ্জা করলো।—“বি হাসল, ভোণ্ট বি সো প্রাউড,” যেন বুকের ভেতরে হাতুড়ির ঘা মারলো। কী ভুল, কী ভুল করছিলুম! কত সহজে, কত প্রকাণ্ড একটা ভুল ধরিয়ে দিলেন শিবখুষ্টস্বামী।—নাঃ, যেতেই হবে কেদারে। “চারধাম” বলে বেরিয়েছি যখন! কেদারনাথ যাবো বরং ফেরার পথে। স্ট্রেন হলে হবে। তখন তো ঘরমুখো। আগে কেদার, পরে বদ্রী, এটাই যাত্রার রীতি।—“যদি আগে বদ্রীই চলে যাই? পরে কেদার গেলে কিছু হবে না তো?”

“হবে আবার কী? যখন যেখানে যাবে, সেটাই ঠিক সময়। চলে যাও। শুভযাত্রা। আবার দেখা হবে।”

“কলকাতায়।”

“অথবা অগ্ন্য।”

৫৫

### তৈঁতুলপাতায় ক'জন?

বাস স্টেশনে এসে দেখি, এক ভয়াবহ ব্যাপার চলছে। বাস আসছে বৈকে—ছাদের ওপরে ভর্তি পোটলাপুঁটলি আর মানুষ। কী প্রচণ্ড ভিড়। অনেকগুলো জীপও আছে—প্রত্যেকটা থেকেই মানুষ খসে খসে পড়ছে। বিশ-পচিশজন করে তুলছে। ছ'টাকা ভাড়া। সমরেন্দ্র, রঞ্জন, পুতুল ছোটোছুটি করতে লাগলো। বাসে ওঠার প্রস্ন নেই। দলে দলে মানুষ আসছে গঙ্গাদেশের জন্তে। একটা জীপ শেষ পর্যন্ত ঠিক করে ফেলল ছেলেরা।

“দৌড়ে এসে উঠে পড়ো এক্ষণি।”

আমরা ছুটে গেলুম, যেই উঠে বসেছি, তৈঁতুলপাতার স্বজন সেই বাঙালীদের ৪/৫ জন নারীপুরুষ দৌড়ে এলেন—“একটু জায়গা হবে আপনাদের জীপে?”

ওরা কোথাও উঠতে পারছেন না—বাকী ক'জন, মেসোমশাই সমেত, আগেই চলে গেছেন অগ্ন্য এক জীপে। আমরা আছি সাতজন—পুরো জীপ ভাড়া নিয়েছি। কবিতাদিদের সত্যি প্রচুর মালপত্র।—“নিশ্চয়ই, অবশ্যই। চলে

আছেন। যদি হও স্বজন, তেঁতুলপাতায় ন'জন।”

ওঁরা অলরেডি ন'জনই ছিলেন, তাই আমাদের আরো তিনজনকে ওঁদের জীপে আটেনি। কিন্তু আমরা তো কপালকুণ্ডলা পড়েছি, তুমি অধম বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন? অতএব গঙ্গামার্জির জয়ধ্বনি দিয়ে রওনা হয়ে গেলুম ভৈরবঘাটের দিকে। নোব্ল রিভেজের নৃশংস আনন্দের পাপে যদিবা একটুকুও পুণ্যসঞ্চয় করে থাকি, সবই ঘুচে গেল সন্দেহ নেই।

ভৈরবঘাটের ভৈরবমন্দিরে পিকো গেল একটা উকি মেয়ে আসতে, কবিতাদিরা তখন কুলি সংগ্রহে ব্যস্ত। ১১ টাকাতে একজন মালপত্র বয়ে নিয়ে যাবে লংকায়। মন্দিরের সামনে সাধুদের আখড়া। সেখানে সাধুবাবারা গঞ্জিকা সেবনে ব্যস্ত, ধুনি ঘিরে স্থখী-স্থখী মুখে বসে আছেন। পিকোকে দেখবামাত্র এক সাধু দৌড়ে মন্দিরে গিয়ে একটি বই খুলে তার ওপরে উপুড় হয়ে পড়লেন এবং জোরে জোরে ভাবগম্ভীর স্বরে কুমারসম্ভব পাঠ শুরু করে দিলেন—“তারপর শিব পার্বতীকে আলিঙ্গনপূর্বক বললেন,—‘হে পার্বতী—তোমার অঙ্গের অপরূপ সুরভি’—”

পিকোকে দেখেই তাঁর গাঁজা ছেড়ে উঠে কেন যে কুমারসম্ভব পড়বার গূঢ় ইচ্ছেটি হলো, কে তা বলতে পারে? পিকোকে বললুম, “গেঁজেল সাধুর ধ্যানভঙ্গ করেছিল, উমারই যোগ্য উত্তরসাধিকা তুই।”

এই উচ্চশ্রংসায় পিকো একটুও বিচলিত হল না। ষ্টোট উলটে—“সাধু না ছাই” বলে নাচতে নাচতে ঘুচাইয়ের সঙ্গে পাকদণ্ডী বেয়ে অত্যাশ্রপথে স্বেচ্ছাচারপূর্বক নামতে শুরু করে দিল। ছুদিকে ছুই মেয়েকে নিয়ে খুব আহ্লাদেই থানিকটা এগোলাম।

পথে হঠাৎ একজন সাধু ধমকে দাঁড়িয়ে বললেন, “আপনারা বাঙালী? কোথায় চললেন, কেদারবন্দী? ওখানে তো দারুণ অ্যাকসিডেন্ট।”

“সে কি? সে কি? কি রকম?”

“বাস্ থাদে পড়ে গেছে। ত্রিশ-চল্লিশজন যাত্রী খতম।” বেশ উৎসাহের সঙ্গেই সাধুটি জানালেন, যেন স্থবর।

“আপনি কি বাসে চড়েন না?”

“খুব কম।”

“এখন কোথা থেকে আসছেন?”

“যমুনোত্রী। পথে শুনে এলাম খবরটা।”

“আপনি কোথায় থাকেন?”

“থাকি না কোথাওই, ঘুরি তো! বছরে একবার করে উত্তরাখণ্ডে আসা আমাদের নিয়ম। এখানে তাই আসি প্রত্যেক বছর। অভ্যাস আর কি—ত্রিশ

বছর বাংলাদেশ ছাড়া।”—সাধুর বয়েসই ত্রিশ-বত্রিশের বেশি মনে হয় না।

“বাংলাদেশে কোথায় আপনার বাড়ি?”

“হাওড়া জেলা।”

পিকো বলে, “হাওড়া তো বাংলাদেশে নয়, পশ্চিমবঙ্গে।”

“তখন সবই বাংলাদেশ ছিল ভাই। আমার কাছে বাঙালীর চিরদিন যে মাটিতে জমিজমা, জন্ম, কর্ম, সেই মাটির নাম বাংলাদেশ। হাওড়া বাংলাদেশ, হুগলী বাংলাদেশ, কলকাতা বাংলাদেশ—বুঝলেন? বাঙালীর দেশ মানেই বাংলাদেশ—তাই না?—দেবেন নাকি, মা, গঙ্গাদেশের জন্তে সন্ন্যাসীকে কিছু দান?” প্রসারিত তালুতে ছোটো টাকা রাখি।—“জয় হোক মা, মঙ্গল হোক।”

এই যাত্রায় এই প্রথম ভিক্ষে। এতদূরে এসেও তীর্থে প্রথম ভিক্ষেদান বাঙালী সাধুকেই! ‘দান’ শব্দে স্নাত্ত করে মনে পড়ে গেল, গলায় ঝোলানো পার্শে আমার নিজস্ব সফলটুকুর সঙ্গে এখন আছে আরো একটা থাম—শিবখুঁইস্বামীর ‘দানম্’। যাবো, তোমার অত প্রিয় কেদারনাথে নিশ্চয় যাবো, স্বামীজী। দরকার হলে ডাঙী নিয়েও যাবো। অন্তত এটুকু বিনয় আমার শিক্ষা হোক।

৫৬

### পায়ে চলার পথের শেষে

হেঁটে হেঁটে হেঁটে চড়াই উৎরাই ভেঙে গঙ্গা-যমুনার হাত ধরে লংকায় এসে পৌঁছুই। পথে একবার দেহাতী এক যাত্রী হঠাৎ অনে—ক উচুতে ছুটি অদৃশ্যপ্রায় পর্বতচূড়ায় গভীর যমুনার খাদের ওপর খাড়া ছুটি পাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, “উয়ো বন্ বহা হ্যায় মিলিটারি পুল। যব খতম হো যায়গা ইন্ রাস্তে বি, বাস্, খতম্! সি-ধা আ যায়গী বাস্-মোটর, হব্ চীজ্। যাত্রা খতম্।”

আমারও মনে হল কথাটা ঠিক। এই এত সুন্দর, অসামান্য পথটি মিথ্যা হয়ে যাবে। এমন কি সাধুরাও এপথে যাবেন না, লোটা কঞ্চল নিয়ে মিলিটারি পুল দিয়ে শটকাটে চলে যাবেন ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে। এত চমৎকার নদী, বর্ণা, বন পাথরের জলছবি—সব আবার অনধিকৃত, বুনো হয়ে যাবে? ফিরে যাবে প্রকৃতির নিজস্ব তোরঙ্গে। অব্যবহারে অব্যবহারে আবার প্রথম দিনের মতো নতুন হয়ে উঠবে। একমাত্র প্রকৃতিতেই এটা সম্ভব। ভাগিস তুমি এখনও তৈরি হওনি ভৈরবীটির পুল, ভাগিস এখনও এই অলোকসামান্য পথে আমার অধিকার অক্ষুণ্ণ!

লংকায় পৌঁছে খবর নিলুম বাস-ড্রাইভারদের কাছে। না, সাধুজী পুরোপুরিই বঙ্গসন্ধান। ত্রিশ বছরে স্বভাব পালটায়নি কিছুই। কেদারবদ্রীতে কোনোই বাস্

পড়েনি ! অকারণ গুজব । হ্যাঁ, এগারোই একটা বাস পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু আটকে গেছে । কেউ মরেনি ।

দেখতে পেয়ে ছুটে এল সুরথ সিং ।—“নমস্ते । হমভি গঙ্গাজীমে নাহাকে আয়া ।”

“আরে, কখন গেলে ?”

কালই সে গেছে, স্নান করেছে এবং ফিরেও এসেছে । হেঁটে । আগাগোড়া । ভৈরবঘাটের বাসের জন্তে বসে না থেকে হেঁটেই মেরে দিয়েছে সাত সাত চোদ্দ কিলোমিটার । ওর কাছে নশ্তি । বাসের জন্তে বসে থাকলে হতই না স্নান !

কালকের সেই মৃতদেহের কী হলো ?

সে তো কালই পোড়ানো হয়ে গেছে । ইতিমধ্যে আরও তিনজন মারা গেছে ।—ইধর ইয়ে তো হামেশা কী বাত । যাত্রা কা পরেশানিসে বুড়টা লোগ গুজর যাতা ।”

কবিতাদিরা লাঞ্চে বসলেন, বাসের বুকিং পেয়ে গেছেন । আমরা রওনা হই উত্তরকাশী । পথে ইন্দর সিংয়ের কাছে চা খেয়ে যেতেই হবে । কথা দেওয়া আছে । এখন সমস্তা, দোকানটা খুঁজে পাওয়া নিয়ে । ছোট্ট একটা কাঠের ঘর, ভাগীরথীর তীরে । গাঙ্গনানীর পরে, ভাটওয়াড়ীর আগে পড়বে । চিনতে পারবো তো ? আমাদের বেজায় ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে, অর্থাৎ রঞ্জনের এবং আমার । কিন্তু পিকোলো ভয়ের চোটে কিছুতেই খেয়ে রওনা হবে না । ওর ধারণা খেলে গা গুলোবেই । আসার সময়ে খালি পেটে ছিলুম, ওর শরীরও তাতে খারাপ হয়নি । অতএব সবাই খালি পেটে রওনা হই । ডালমুট আর বিস্কুট ভরসা করে । একটা একটা করে যত চেনা ঝর্ণা পার হচ্ছি, যতই গঙ্গোত্রী পেছনে পড়ে যাচ্ছেন, ততই আমার মন খারাপ হচ্ছে । একসময়ে সেই বিশাল তুষারখণ্ড পার হয়ে যাই । ফেরার পথে সেই সব ঝর্ণাগুলো চেনা বন্ধুর মতো আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে । যাবার পথে এদের প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ পরিচয় হয়েছে । এবারেও খামছি, ইঞ্জিনে জল ভরছি, বোতলে জল ভরছি, মুখ ধুচ্ছি, স্নেহে জলকেলি করতে করতে এগোনো হচ্ছে । একসময়ে গাঙ্গনানী পেরিয়ে যাই, অপূর্ব স্নন্দর স্নো-ভিউ এখানেই শেষ । এরপরে হঠাৎ হঠাৎ একটু-আধটু । দয়া করে দর্শন দেয়া ।

৫৭

দিল্লনে ফির্ ইয়াদ কিয়া

পথের বাঁকে হঠাৎ দেখা গেল ইন্দর সিংয়ের দোকানঘর । অমনি কোরাস—

“খামো, খামো, সুরথ সিং ? এই তো !”

স্বরথ সিং নিজেও দেখেছে। আমরা নামবার আগেই দৌড়ে বেরিয়ে এসেছে ইন্দর সিং। ফোকলামুখের সেই অভাবিত আনন্দের জ্যোতির তুলনা আমি দিতে পারবো না। আমাদের মুখেও নিশ্চয় তার কিছুটা প্রতিবিম্বিত ছিল।...“সচমুচ ইয়াদ রাখা? সচমুচ আয়া আপলোগ? ফিরুভি আ গয়া? হম্ তো কালসে হরু গাড়িকো দেখ্ রহা থা। মায়নে সোচা কি ভুল গয়া হোগা। ইত্না দূর যানা হ্যায়, দোবারা রুখেঙ্গে নহী।”

ভুলবো কেন? ভোলা যায় নাকি? পিকোলো, রঞ্জন, স্বরথ সিং আমাদের প্রত্যেকেরই আলাদা করে মনে আছে, তোমার কাছে কথা দিয়ে গেছি। জীবনে ক’টা কথাই বা রাখা যায়, ইন্দর সিং? বেশি করে দুধ দিয়ে খুব ঘত্তে চা তৈরি করলো ইন্দর সিং, গরম গেলাস হাতে ধরতে পারবো না বলে কাপের মধ্যে গেলাস ভরে রুশদেশের কায়দায় চা পরিবেশন করলো, দু’প্যাকেট গ্লুকোজ বিস্কুট দিল! প্রথমে তো দামই নেবে না একটার—“বেবিকো দিয়া”—, অতিকষ্টে স্বরথ সিং তাকে রাজী করালো। এবার রওনা। ভাটওয়াড়ীতে লাঞ্চ খেয়ে উত্তরকানী।

গাড়িতে তুলে দিয়ে ইন্দর সিং বললো, “বিবিজী, হম্ ক্যা বোলেগা, দিল্ ভরু গয়া হম্‌কো, জিন্দেগী ভরু ইয়াদ্ রহেগা ইস্ দিন—”

দিল্ ভরে গেছে আমাদেরও। আমাদেরও মনে থাকবে, ইন্দর সিং, জিন্দেগী ভর। তোমার আদর, তোমার খুশি, তোমার এই পাহাড়, গঙ্গা। জিন্দেগী ভর ভুলব না যমুনার প্রলয়প্রবাহ। ভাগীরথী, তোমাকেও মনে থাকবে, শিবখুস্তস্বামী, তোমাকেও, মেসোমশাই, কুন্দন সিং, দেওঘরের বাবাজী ভুলবো না কাউকেই! বাবাজী সেদিন “ভগবানের নাম করে বেরিয়ে পড়ুন” না বললে গঙ্গোত্রীতে আসাই হত না আমার। গাছের তলায় কঞ্চল জড়ানো হে রামশরণাশ্রিত পথিক, তোমাকেও মনে থাকবে। আর দূর জলন্ধরের গ্রামের পথরাস্তা ঠাকুমা, তোমার শেষ অখারোহণে আমরা সঙ্গী রইলুম না।

গাড়ি ছুটেছে ভাটওয়াড়ী হয়ে উত্তরকানী। কাল সকালেই রওনা হবো বঙ্গী-নারায়ণের পথে, সেই সর্ব আশ্চর্য প্রয়াগের সারি যে পথে অপেক্ষা করে রয়েছে আমার জন্তে। মন্দাকিনী, নন্দাকিনী, পিন্ডার, অলকানন্দা—একদিকে স্বপ্নচারিণী নদীরা সবাই, আর অতৃদিকে কল্লনার দেশবর রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, দেবপ্রয়াগ—যেন স্বপ্নের মধ্যে সোনার ঘণ্টা বাজাচ্ছে—স্বপ্ন সফল হবার দিন তো হবে শুরু।

॥ প্রথম পর্ব শেষ ॥

## দ্বিতীয় পর্ব

১

### শ্বেত সন্ত কথ্য

স্নেহের পিকোলো,

তোমাদের কথা আমার খুব মনে হয়। গত বছরটা আমি গঙ্গোত্রীতেই কাটালুম। ভূর্জবাসায় চীরবাসায়, গোমুখে বাস করেছি। অপূর্ব! লালবাবার আশ্রমেও ছিলাম। কই, এই গ্রীষ্মে তোমরা তো আর এদিকে এলে না? যাত্রীদের মুখে ছোট ছোট মেয়ে দেখলেই আমি তোমাদের কথা ভাবছিলাম।

জানো পিকোলো, একটা খুব দুঃখের কথা, তোমার মায়ের ভবিষ্যৎবাণীই মিলে গেল। হৃষীকেশে যে চায়ের দোকানে আমি তিনশো ডলার জমা রেখেছিলাম, ওরা সে টাকা আমাকে ফিরিয়ে দেয়নি। আমি অনেক করে চেয়েছিলাম, অথচ সেই টাকাটা আমার প্রয়োজনের সময়ে আর পাইনি। প্রথমে তারা আমাকে চিনতেই পারছিল না। তারপর বলল, “সেই টাকাটা কি আপনি আমাদের দান করে দেননি? আমরা তো দান মনে করে খরচ করে ফেলেছি। আর হাতে টাকা নেই, ফেরত দিতে পারবো না।” আমার খুব মন খারাপ। এত সহজে যে মানুষ মানুষকে ঠকায় তোমাদের দেশে, তা বুঝতে পারিনি। এতে আমার খুব ক্ষতি হয়েছে। আমার মানুষকে বিশ্বাস চলে গেছে। এখন সবাইকে সন্দেহ হয়। সবাইকে ধান্দাবাজ ও মিথ্যাবাদী মনে হয়। এতে আমার টাকাকড়ি কতো রক্ষা পাচ্ছে জানি না, তবে মনের শান্তি রক্ষা পাচ্ছে না। তোমরা কেমন আছো? পড়াশুনো কেমন হচ্ছে? স্নেহ শুভেচ্ছা নিও। ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন। ইতি শিবখুঁস্বামী।

পুনশ্চ : তোমরা কি কেদারনাথে ও বদ্রীনাথে গিয়েছিলে? অপূর্ব নয়? তবে গোমুখ আরো অপূর্ব। তোমরা পরের বার অতি অবশ্যই গোমুখ দর্শন করে যাবে। ঠাণ্ডার জুতো, পোশাক নিয়ে এসো। আমি এখনও দরিদ্রদের আশ্রম তৈরির কথা ভাবছি। সরকার নানা বাধা দিচ্ছেন। মিলিটারি ইত্যাদিরও অসুবিধে আছে। গঙ্গোত্রীতে বা বদ্রীনাথে সম্ভব নয়। আমার সমতলে থাকতে ইচ্ছে নেই। হিমালয়ের কোলেই আমি আশ্রয় নিতে চাই। তোমাদের সঙ্গে আশ্রম তৈরি বিষয়ে কথাবার্তা বলতে হবে। এখানে ভারতীয় সাধুদের অসুবিধে

নেই। আমার যেহেতু ব্রিটিশ পাসপোর্ট এবং অঞ্চলটি খুব সঙ্কটময় বলে সরকারী ভাবে চিহ্নিত, সেহেতু বিদেশী সাধুদের ভালো চোখে দেখা হয় না। সাধুদের তো এমনিতেই অসাধু মনে করা হয় (সবচেয়ে সহজ ছদ্মবেশ বলে), আর বিদেশী সাধু হলেই তাদের চরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। চরদের পক্ষে যে সাধু সেজে বিচরণ করাই কাজের শ্রেষ্ঠ উপায় তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা বিদেশী হবে কেন? বিদেশী শত্রুরা তো দেশী চরই নিয়োগ করবে। কিন্তু এতটা তলিয়ে ভেবে দেখা কোনো দেশেরই সরকারের চরিত্র নয় বা অভ্যাসও নয়। যাই হোক আমাদের তোমাদের সরকার মাঝে মাঝে ভিসা-টিসা নিয়ে বেগ দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে মনে হয়, দূর ছাই, সব ছেড়েছুড়ে ইংলণ্ডে ফিরে যাই। আমার কী? আবার হিমালয় ফিরে ডাকে। ভারতবর্ষের সীমাহীন দারিদ্র্য চুলের মুঠি ধরে যেন টানে। কি জানি, আমি হয়তো কোনোদিনই এদেশ ছেড়ে যেতে পারবো না। যীশুর যেমন হচ্ছে, শিবের যেমন হচ্ছে।

পূর্বদিকে জগন্নাথ দক্ষিণদিকে রামনাথ  
পশ্চিমেতে রণছোড় উত্তরেতে বদ্রীনাথ  
রাজকরণে জগন্নাথ যোগকরণে রামনাথ  
ভোগকরণে রণছোড় তপকরণে বদ্রীনাথ  
কোটিতীর্থফলভণে বদরীনাথের দরশনে

যমনোজীর পরই ভেবেছিলুম আর নয়। আর যাবো না ভীর্থযাত্রায়। নানান কারণে উৎসাহে ভাঁটা পড়েছিল, শরীরে মনে প্রবল বিচলিত বোধ করেছিলুম। খচ্চরে চড়ে সর্বাঙ্গে প্রচণ্ড ব্যথা হয়েছিল আমার। যদিও পদব্রজেই নেমেছি প্রধানত, তবু ওঠার সময়ে হাঁপানী রুগী হয়ে অতটা চড়াই ভাঙার কথা ভাবতেও পারি নি। শরীরের সেই প্রচণ্ড অস্বস্তি ও যাতনা আমি দ্বিতীয়বার ডেকে আনতে রাজি ছিলুম না। এর পরে হেঁটে উঠলে উঠবো, নইলে নয়। এবং কেদারনাথে চোদ্দ মাইল হেঁটে ওঠা সাধ্যো কুলোবে না। স্বদেশ কোলকাতাতেই চোদ্দ মাইল প্লেন রাস্তায় হেঁটে আমি কোনোদিন গড়িয়াহাট থেকে দমদমে যেতে সাহস পাইনি, হিমালয়ের চুড়োয় উঠে সে সাহস পাবো কোথেকে? কেদারনাথ আউট। ভেবে-ছিলুম গঙ্গোত্রীও যাবো না। তারপর মাত্র ৩ মাইল হাঁটাপথ শুনে, রাজি হলুম যেতে। বদ্রীনারায়ণ তো এখন দিব্যি সিমলা-দার্জিলিংয়ের মতোই সিবিলাইজড টুরিস্ট স্পট হয়ে গেছে। সোজা মোটররাস্তা আছে দিল্লি থেকে। বাস যাচ্ছে, গাড়ি যাচ্ছে। কচিকাচা, বুড়োবুড়ী সবাই যাচ্ছে। কেউ মরে না ওপথে। কেউ

কষ্ট পায় না। আশ্চর্য একটা বেড়ানো হচ্ছে বটে! পি. আর. ও. বন্ধুর গাড়ি-ড্রাইভার ফ্রী ধার পেয়েছি, আর রাজার হালে ঘুরে বেড়াচ্ছি চারধাম। আমার আর এক বন্ধু তার শ্বশুরশাশুড়ী বউছেলে নিয়ে এই রকম ভাবে ঘুরে গিয়েছিলো এক ব্যাংকের পাবলিক রিলেশনস্-এর সঙ্গে। শুনে তখন কী হিংসেই না হয়েছিলো সেই বন্ধুকে। আর এখন? আমি স্বয়ং সেই অবিখ্যাত ভ্রমণের যাত্রী। ঈশ্বর বোধ হয় শুনতে পেয়েছিলেন আমার নীরব ঈর্ষার ভাষা। এটাই তাঁর ভৎসনার ধরন।

স্বরথ সিং আমাদের সারথি, কণ্ঠা পিকোলো আর ভাই রঞ্জন আমার সহযাত্রী। বার বার মন ভাঙার কারণ ঘটছে। যমুনোত্রীতে আমাদেরই সাক্ষাৎ সঙ্গিনী এক বুদ্ধা পাঞ্জাবিনী বর্ষায় পা কসকে ঘোড়াহুঙ্কু, সহিসহুঙ্কু, ছ'হাজার ফুট খাদের অতলে পড়ে তলিয়ে গেলেন। এভাবেই, শুনলুম, আগের দিনই গেছে একটা পঞ্চদশী কণ্ঠা। গঙ্গোত্রীর পথে বার বার অক্লান্তকার্য, ব্যর্থমনস্কাম বৃদ্ধ তীর্থ-যাত্রীদের মৃতদেহ শয়ান দেখেছি, যাদের তীর্থযাত্রাটি সম্পূর্ণ হয়নি কিন্তু পুণ্যের অংশটা হয়েছে একশোয় একশো। সিধেই স্বর্গলাভ এখানে মরলে। যমুনোত্রীর রাস্তাটা প্রাচণ্ড চড়াই এবং সঙ্কীর্ণ এবং দুর্গম। ওপরে উঠেও, বৃষ্টিতে কাদায় প্যাচপেচে যমুনোত্রী ক্যানিংয়ের নোংরা কাদার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। হিমালয়ের চার-চারটে গ্লেশিয়ার ঘেরা শিখর যমুনোত্রী যদিও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে উদ্দাম, বহু এবং তুলনাহীন। এবং খচ্চরের পিঠে চড়ে সেই পার্বত্য পথযাত্রাও যজ্ঞপাদায়ক বহু এবং তুলনাহীন। যারপরনাই ব্যথা হয়েছিল সারা গায়ে—বরকোটে অশ্রুতাজ্ঞন কিনে মালিশ করতে হয়েছিল। সেই সময়েই ঠিক করেছিলুম, ঢের হয়েছে, আর কেদারনাথ নয়। ঠিক করেই ফেলেছিলুম গঙ্গোত্রী থেকে আমরা সোজা যাবো বজ্রীনাথে। সেখান থেকেই নেমে যাবো হ্রদীকেশ। কিন্তু সব গোলমাল করে দিলেন এই সাহেব সমিটি—শিবখৃষ্টস্বামী। কোথা থেকে উদয় হলেন হঠাৎ গঙ্গোত্রীর সুরধুনীর তীরে। কবিতাটির মেয়ে ঘুচাই আর আমার মেয়ে পিকোর সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললেন, আর নানাভাবে অহুরোধ উপরোধ করে আমাদের রাজি করালেন কেদারনাথ দর্শনে। উনি বললেন, কেদারে না গেলে উত্তরাখণ্ড ঘোরা হলই না। এত সুন্দর আর কোনো তীর্থ নয়। এত খোলামেলা, অথচ এত নির্জন, এত তীব্র সঘনসুন্দর। খচ্চরেও চড়তে পারবো না, হেঁটেও চড়তে পারবো না, অতএব যাবোই না—এই আহ্লাদে কথাবার্তা শুনে বললেন, “কাণ্ডী চড়ে, ভাণ্ডী চড়েও যাওয়া উচিত। এত অহংকারের কী আছে, যুব বয়েসে ভাণ্ডী-কাণ্ডী নিতে লজ্জা করবে? যাবে তো ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে, যে-কোনো উপায়েই হোক গেলেই হলো। সেখানেও ঘোঁবনের দস্ত? একটু বিনয়



নেই ?” শিবখুঁষ্টস্বামী বকুনি খেয়ে স্থির করলুম, সত্যিই তো ! যেতেই হবে । ‘চারধাম’ করতে এসে তিনধাম করে ফিরবো গায়ের ব্যথার ভয়ে ? আমি কি উন্মাদ ? মাতৃষে কত কষ্ট করেই আসতো এককালে । এখনও আসে । কিন্তু তাদের মধ্যে পুণ্যার্জনের যে স্পৃহা ছিল আমার মধ্যে তো সেটা নেই । আছে বেড়ানোর লোভ আর সৌন্দর্যতৃষ্ণা । তার জগ্ন কষ্ট করা আর ভগবানের জগ্ন কষ্ট করা তো এক ব্যাপার নয় । খ্রিস্টান সন্ন্যাসী শিবখুঁষ্টস্বামীর তীর্থযাত্রা আর আমার হিমালয় ভ্রমণের স্বাদগন্ধ আলাদা হতে বাধ্য । প্রথমত আমার হিমালয় আর একজন ইংরেজের হিমালয় এক নয় । আজন্মই হিমালয় আমাদের মজ্জার মধ্যে রক্তের মধ্যে প্রবেশ করেছে, হিন্দুধর্মে হিমালয়ের ভূমিকাটি প্রবল । কি সংস্কৃত শাস্ত্রে, কি বাংলার লোকাচারে, লৌকিক গাথাগল্পে এবং ধ্রুপদী সাহিত্যে, —সর্বত্রই হিমালয়ের সঙ্গে আমাদের নাতীর বন্ধন । অথচ আজ শিবখুঁষ্টস্বামী আমাকে হারিয়ে দিয়েছেন, হিমালয়কে ভালোবাসায় । সাগরপারের এই স্নেহ, যবন সন্ন্যাসী খ্রিস্টান হয়েও কেদারনাথকে ভালোবাসে কেলেছেন মনেপ্রাণে । শিবখুঁষ্টস্বামী বলেছিলেন সে বছরটা শীতে-গ্রীষ্মে উনি গঙ্গোত্রী অঞ্চলেই কাটাবেন । গোমুখে থাকবেন । পরের গ্রীষ্মে যদি যাই, আবার দেখা হবে । পরের গ্রীষ্ম এসে গেছে, আমি তো গেলুম স্নেহ দেশে সভাসমিতির কাজে, সাত সমুদ্রুর পাড়ি দিয়ে, ডানা মেলে । ফিরে এসে দেখি এক বছর পরে শিবখুঁষ্টস্বামী ঠিক চিঠি লিখেছেন পিকাকে । —“কই, তোমরা তো আর এদিকে এলে না ?”

২

### জেনারেশন গ্যাপ

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে মাতৃষে নিজের শ্রাৎ নিজে করে উত্তরাখণ্ডের তীর্থ-যাত্রায় বেরত । পথ ছিল এত দুর্গম, ঘরে ফেরার কোন নিশ্চয়তা ছিল না । এখন লাক্ষারি বাস সোজা চলে যায় বদ্রীনারায়ণের পদতলে । নেহাৎ বাসে বাসে কেদারনাথের শ্রীচরণে পৌঁছোনো যাচ্ছে না এখনও, তাই সেই পথে প্রকৃতির রূপ যৌবনের মোহ এখনও কিছুটা রক্ষা পেয়েছে । বদ্রীনারায়ণের অবস্থা দাঁড়িয়েছে স্বামীর কাছে আটপোরে রূপসী গৃহিণীর মতো । রূপটা চোখ-বালসানো হলেও, সহজলভ্য বলে স্বগৃহে তার মূল্য নেই । এই যদি উঠতে হতো প্রাণ হাতে নিয়ে ইষ্টনাম জপতে জপতে, পায়ে হেঁটে কি খচ্চরে চড়ে, তাহলেই ব্যাপারটা পালটে যেত ।—‘কাহারে হেরিলাম ! আহা ! এ কি স্বপ্ন ! এ কি মায়া !’ বলে আর্তনাদ করে উঠতাম । যেহেতু আরাম করে গাড়িতে বসে বসে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে

মাইলের পর মাইল উঠছি, কষ্টে কষ্টে চক্ষু মেলে খানিক দূর করেই বুঝে ফেলে ছড়িয়ে দেখছি, খানিক দেখছিও না। ভারী তুষারনদীর তলে তলে তরলা অলকানন্দার অসামান্য লীলা, তার তীব্র অবাধ্য স্রোত, সত্যিই তুলনাহীন। কিন্তু বিনাশ্রমে পাওয়া যায় বলে তার দাম মানুষের কাছে কমে গেছে। আস্তে আস্তে মারোয়াড়ীদের ভগবদ্ভক্তির এবং দৈহিক গুণের বুদ্ধির কল্যাণে কোনো তীর্থই আর দূরধিগম্য থাকছে না। তার ওপর মিসেস গান্ধীর ভক্তিমতী হৃদয় যুক্ত হয়ে সর্বত্রই এখন হেলিপ্যাডের অস্তিত্ব রয়েছে। শুনেছি কৈদারনাথ-বন্দ্রীনারায়ণ মন্দিরে পথ যেদিন বন্ধ হয়—আর যেদিন খোলে, দু’দিনই হেলিকপ্টারে চড়ে বিড়লা মুন্সী মহোদয়েরা নাকি শশরীরে উপস্থিত হন, পুরোহিতের প্রথম ও শেষ আশীর্বাদ গ্রহণ করতে। আর্মির মোটর-পথ বছরভর তৈরি আছেই। বড় অফিসারেরা মোটরে যান, সন্ন্যাসী যান উড়ে, আর ছোট অফিসারেরা বাসে চড়ে। আর আমার মত দু’একটা ভাগ্যবতী ভক্তিমতীর জন্য গাড়ি যোগান ভগবান।

কিন্তু ভগবান পিকোলোকে (এবং রঞ্জনকেও) কেন যে গাড়ি যুগিয়েছেন, সেইটে অবশ্য আমি বুঝতে পারিনি। ওরা সমানেই যাত্রাপথে নানাজাতীয় বাধা বিঘ্ন তৈরি করছে। ভক্তির তো পরাকাষ্ঠা দুজনের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে এবং সৌন্দর্য-পিপাসা বলতে যা কিছু বরনার জলেই তা মিটে যাচ্ছে। আর কিছু পথ-শোভা দেখাতে চেয়ে ভাতঘুমে ডিস্টার্ব করলেই মামা-ভাগ্নীর যারপরনাই বিরক্তি। ভোরে উঠে রওনা হওয়াটা নেহাতই আমার খামখেয়ালী অত্যাচার। এই কি ‘ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা?’ এরাই তো আধমরা। এতৎসত্ত্বেও আমাদের যে কোনোরকমে আধখানা “যাত্রা” সূসম্পন্ন হয়েছে তাতেই আমি খুশি। গঙ্গোত্রী থেকে আমরা ফিরে এলুম উত্তরকাশীতে। এবারে আর সেই বাজার-মধ্যস্থ টুরিস্ট লঞ্জে না উঠে অগ্র টুরিস্ট লজটিতে চলে গেলুম। সেখানে এখন আর তত ভিড় নেই। বলতে গেলে সীজন ওভার।

৩

### চন্দন সিং

একটা বড় ঘর পেলুম ৪টে খাটওলা—পাশেই মার মার স্নানঘর। ডরমিটরিই আসলে এটা, কিন্তু লোকজন নেই। চন্দন সিং বলে একটি গাঢ়োন্মালী যুবক আমাদের সেবক এঘরে। জানলা দিয়ে সামনেই দেখা যাচ্ছে গঙ্গার উত্তাল গৈরিক তরঙ্গ, আর জানলা বন্ধ করলেও শোনা যাচ্ছে জলস্রোতের গর্জন। সামনেই সবুজ হিমালয়। এখান থেকে কোনো হিমশিখর দেখা যায় না। পাহাড়ের গায়ে

অনেক ছোটো-বড়ো মন্দির দেখা যাচ্ছে। ঘণ্টাও শোনা যাচ্ছে আরতির। ঘরটি ভারি পছন্দ হয়ে গেল। বাথরুমে গরম জল নেই। ছুটাকায় এক বালতি কিনতে পাওয়া যাবে।

চন্দন সিং হঠাৎ বললে, “আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলুন না মেমসাব? আমি রান্নাবান্না সব জানি। পাহারাও দিতে পারি। বর্তন মলুনা, প্রেস করুনা, সব কুছ আতা হায়া মুঝকো। পিওনের কাজও পারি। ক্লাস টেন তক স্কুল মে পঢ়া। অংগ্রেজী ভি পঢ়লেতা হঁ। হিন্দি ভি।”

অবাক হয়ে আমি বলি, “সরকারী চাকরি ছেড়ে তুমি কেন যাবে?”

উত্তরে শুনলুম চন্দন সিংয়ের চাকরিটা সরকারী নয়। টেমপোরারি সার্ভিস।

এ অঞ্চলের সব সরকারি টুরিস্ট লজই এইভাবে চলে। গঙ্গোত্রীতেও দেখেছিলুম কেবলমাত্র কেরানীবাবুরই পাকা চাকরি, ছ’মাস উত্তরকাশীতে থাকেন, ছ’মাস গঙ্গোত্রী লজে। আর সব ক’টি ছোকরা টেমপোরারি লোকাল এমপ্লয়ি। ওখানেই তারা বসবাস করে, বছরে ছ’মাস চাকরি থাকে, ছ’মাস বেকার। কখনও নিচে গিয়ে কাজকর্ম করে, কখনও নিচে গেলেও কাজ পায় না। চন্দন সিংয়েরও তেমনি সীজনাল এমপ্লয়মেন্ট। যাত্রীদের সঙ্গে দিল্লি বধাই কলকাতা ঘুমনে যান। মাংতা। কেউই ওকে নেয় না। অথচ এই বছরেই তো মারোয়াড়ী বাবুয়া নিয়ে গেছেন গুর বন্ধু দান সিংকে। দান সিং চিঠি লিখেছে দিল্লি থেকে। খুব ভালো আছে। ওকেও যেতে বলেছে। কিন্তু কেমন করে যারে চন্দন সিং? উত্তরকাশীর বাইরে কোথাও যায়নি সে। কেউ নিয়ে গেলেই চলে যাবে।—“মেমসাব, লে চলোগে, সাধমে, মুঝকো?” খুব মন খারাপ হয়ে যায়। আমার সঙ্গে কেউ যেতে চাইছে, অথচ আমি নিয়ে যেতে পারছি না।—এই উপলব্ধিটা অক্ষমতার। এবং তার স্বাদ ভাল নয়।

চন্দন সিংয়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে আমি ধোপার বোঝার সমান কাপড় কাচলুম। এই ক’দিনে (সাতদিনে) তো কাপড় কাচার সময় হয়নি। এখানে জোরালো গঙ্গার হাওয়ায় রাতের মধ্যেই সব খটখটে হয়ে শুকিয়ে গেল, এমন কি পিকোর লিভাইস পর্যন্ত! আজ থেতে বেরুতে ইচ্ছে করল না, রঞ্জন একাই বেরুল। পিকোটা বমি করেছে খুব। গুর শরীর ভালো নেই। গঙ্গার বাতাস খেয়ে ঘুমিয়ে রইল। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে অন্ধকার পাহাড়ের গায়ে তারার মতন আলোর শোভা দেখতে লাগলুম অনেক রাত পর্যন্ত।

ভাই চন্দন সিং, তুমি ভুল লোককে মুরুব্বী ধরেছো। আমি তোমার বন্ধুর মারোয়াড়ী মনিবের পাদনখকণার তুল্য রোজগার করি না। গাড়িখানা দেখে

ভুল করেছে তো? ও-গাড়িটা আমার নয়। আমার বন্ধুর। ওই উর্দিপরা সোফারও আমার নয়। ধারে পাওয়া। তোমাকে দেবার মতো কাজ আমার হাতে নেই। তোমার জন্তে আমার মন-কেমন করছে। করবেও চন্দন সিং। ক'জন মানুষই বা পৃথিবীতে আমার সঙ্গে চলে যেতে চেয়েছে!

## 8

### পিকোলো বিগড়োলো

উত্তরকাশীতে আবার দেখা হয়ে গেল হান্না আর অস্টেনের সঙ্গে। তারা এখনও বসে আছে, হান্নার জর সারেনি। ওদের সঙ্গে দেখি—ঘুচাই এবং পুতুল! পুতুল দৌড়ে এসে বলল, “আমাদের অনেক একস্ট্রা জিওলিন আছে, সঙ্গে নিয়ে যান। ঝরনাম্বর জল আর যেন খাবেন না। এদের সবর পেট খারাপ হয়েছে। আমরা তো আজই হুশীকেশে নেমে যাচ্ছি, আমাদের এত লাগবে না—”

পুতুল, ঘুচাই, সমরেন্দ্র সব কটা সোনার টুকরো। কবিতাদিরা ঐ ট্যুরিস্ট লঞ্জেই ছিলেন, অল্প একটা উইংয়ে। গঙ্গোত্রীটা খুব ভালো কেটেছে ওঁদের জন্তে। সমরেন্দ্র বললে, “আমাদের বিড়লা ধর্মশালাতে ঘর বুক করা আছে মা'র নামে, নবনীতাদি আপনি চিঠিটা নিয়ে যান, ২২-২৩ ছু'দিন থাকতে পারবেন। কেদার নাথে ঐটেই শ্রেষ্ঠ বাসস্থান।”

পুতুল, ঘুচাই ছুটল কবিতাদিকে ধরতে চিঠি এনে দেবে বলে।

হঠাৎ দেখি পিকোলো এদিকে ভয়ানক বিগড়ে গেছে। সে আর পাহাড় পর্বতে উঠবে না। কালকের মতো যদি বমি হয়? তার গা ঘুলোচ্ছে। তার মাথা ঘুরছে। তার পেটের মধ্যে কেমন-কেমন করছে। তার একটুও ভাল লাগছে না। তার দিম্মার জন্তে মন-কেমন করছে। তাওয়াং-এর জন্তে দুর্ভাবনা হচ্ছে। সেও আজই নেমে যাবে, ঘুচাইদের সঙ্গে দেশে ফিরে যাবে।

কিন্তু ঘুচাইরা তো এখনও দু'দিন থাকবে হুশীকেশে। তারপর মুসোরি যাবে। হরিদ্বারেও থাকবে। তাছাড়া ওদের ট্রেনে বুকিং আছে। তোর বুকিং নেই। তাছাড়া তোকে নিয়ে ওরা ঘুরবে কেন? তোর তো বাসে ঘুরতে আরোই গা ঘুলোবে, পেট শুলোবে। বমি হবে। পর্দাটানা, নিঃশব্দ, ভি আই পি মোটর গাড়িতেই যখন এই কীর্তি তোমার! মা'র কোলে বালিশ পেতে শুয়ে শুয়ে এত মেজাজ গরম! ওখানে তো—?

বেশ, পিকোলো তাহলে হান্না আর অস্টেনের সঙ্গেই নেমে যাবে! ওরা যাচ্ছে এয়ার-কন্ডিশানড লাকসারি বাসে এখান থেকে দিল্লি পর্যন্ত। দিল্লি গিয়ে

সে মিস্টার মুখার্জীর কাছে চলে যাবে। তাঁর স্ত্রী বন্দনা ওকে টেনে তুলে দেবে। আর পাহাড় নয়। এবার সমতলে ফিরে সে যাবেই।—“কেদার-বন্দী যাবো না। না—না।”

কী ঝামেলা চাঁচামেচি, গুনগুন, আদর, ধমক, ভোলানি, বকুনি, সোনামণি, পাজিছুঁচো—চলু তাহলে সবাই মিলে ফিরে যাই। এবম্বিধ মিশ্রণের ফলে শেষ পর্যন্ত পিকোলোকে পর পর ছুঁবোতল ঠাণ্ডা গোল্ড স্পট খাইয়ে বন্দীনাথ দর্শনে রাজি করানো গেল। ইতিমধ্যে ঘুচাই যে গেছে কবিতাদির কাছ থেকে বিড়লার অনুমতিপত্র নিয়ে আসতে, যাতে আমরা গিয়ে কেদারনাথে আশ্রয় পাই—সেটা বেমানুম ভুল হয়ে গেল। তখন আমার একটাই উদ্দেশ্য, পিকোকে বগলে করে কোনোরকমে রওনা হয়ে পড়া। যাতে আবার কোনো সঙ্গী পেয়ে গিয়ে পিকো বিগড়ে না যায়। একেবারে চারদিন বাদে কেদারে পৌঁছে মনে পড়ল বিড়লার চিঠিটা নেওয়া হয়নি।

৫

### মুখিষ্ঠিরের সঙ্গী

গঙ্গোত্রী যাবার সময় আমরা উত্তরকাশী থেকে রওনা হয়ে সোজা হিমালয়ে উঠে যাই। কিন্তু বন্দীনাথে যাবার জন্তে আবার নেমে যেতে হবে। ধরাসু, টিহরি, শ্রীনগরের পথ দিয়ে রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছতে হবে। মনে আছে বর্কোট থেকে ব্রহ্মখাল হয়ে ধরাসু আসার পথে পাহাড়ের গায়ে খাঁজ কেটে কেটে পাহাড়ীরা এমনই ক্ষেত তৈরি করেছে যে, হিমালয় পর্বতের ঢালু গা-টিকে যেন মনে হর দূর থেকে দেখা বিপুল কারুকার্যখচিত উড়িয়ার মন্দিরের গা। এমনিই আশ্চর্য গড়ন হয়েছে তার।

ধরাসুর কাছেই প্রথম দেখি নেকড়ে বাঘের মতো কুকুর। গোব্দা ঘাড়ে এক বিষণ্ণ চওড়া লোহার পাতের বক্সস বাঁধা, তাতে কাঁটা লাগানো। বাপরে! এ আবার কেমন কুকুর? বোঝা গেল এরা পাহারাদার, শীপ-ডগ। ভেড়ার পাল সামলায়। স্বরথ সিং জানায় এক-একটি কুকুরের দাম হাটে ৫০০ টাকা মিনিমাম। বেশিও হয় ট্রেনিং থাকলে। ‘পুলিসের মতো চোঁকি দেয়।’ গলার কলারটি কেন লোহার এবং তাতে কাঁটা বসানো কেন? এবং অত চওড়া—পুরো ঘাড় জোড়া কেন? কুকুরটার ব্যথা লাগছে না?—“না না, ওর তলায় পুর নরম কবলের লাইনিং দেওয়া আছে। এ কুকুর বাঘে ভয় পায় না। বাঘের সঙ্গে লড়াই করে। কিন্তু বাঘ যদি একবার ঘাড়টি কষে কামড়ে ধরতে পারে, তাহলেই কুকুর নট নড়ন-

চড়ন, সিধে মরণ। তাই ঘাড়ে ওটা কলার নয়, বর্মই বলা যেতে পারে। বাঘেরই দাঁত ভেঙে যাবে ওটা কামড়াতে গেলে, যায়ও প্রায়ই। চওড়া লোহার বর্ম ওটা, যাতে বাঘ ঘাড় কামড়ে ধরতে না পারে।”

আমার আদরের তাওয়াং তো তিব্বতী, হাউন্ড, সেই তাওয়াং থেকে কোলে করে তাকে এনেছি, অবিকল এই জাতেরই কুকুর। একেবারে এরকম দেখতে। স্বরথ সিং জানালো এই কুকুরগুলিও গাঁড়োয়ালী নয়, তিব্বতী, মানসসরোবরের ওদিক থেকে তিব্বতীরা নিয়ে আসে বেচতে। খুব সাহসী, খুব ইমানদার কুত্তা। ৫০০ টাকা দাম বটে, কিন্তু লক্ষ টাকার সম্পত্তি আগলায়। মাগুঘের চেয়ে ঢের ভালো। মেঘপালকের ভগবান। এই রকমই একজন নিশ্চয়ই যুধিষ্ঠিরের সঙ্গী হয়েছিল হিমালয়ে।

## ৬

### রক্তপ্রয়াগের চটি

শ্রীনগর জায়গাটিও খুব সুন্দর, যদিও সেটা কোনো প্রয়াগ নয় এবং নিচের দিকে বলে অগ্ন্যাগ্ন জায়গার তুলনার একটু গরমও। (তবে টিহরির মতো নয়। টিহরি—গরমে দিল সে সব শিহরি।) রক্তপ্রয়াগে এসে আমরা ধামলুম। বেশ ক্লান্ত লাগছে শরীর।

গাড়ি কিছুটা ভুল রাস্তায় চলে গিয়েছিল, তাই রাত্রি হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে গুচ্ছ গুচ্ছ চিঠি। কালীকম্বলীওয়ালার ধরমশালার জন্য এক গুচ্ছ আর সরকারী অতিথিশালার জন্য আর এক গুচ্ছ। কালীকম্বলীওয়ালা বহু গাড়ি ও তিনটি টুরিস্ট বাসের ঘাড়ীতে পরিপূর্ণ। স্থান নেই। রঞ্জন ফিরে এল।

সরকারী অতিথিশালাতেও কোনো ঘর বাকি নেই। তবে ভরমিটরিতে তিনটে সীট মিলতে পারে। মহা উল্লাসে তক্ষুনি তাই-ই বাগিয়ে ফেলি—এরপরে এটাও ফসকে যাবে, তখন কী করব? রক্তপ্রয়াগের টুরিস্ট লজটি ঠিক নদীর ধারে। প্রচণ্ড বেগে নদী ধাইছে ঘুরতে ঘুরতে—এটি অলকনন্দা। আর মন্দাকিনী এসে মিশেছে এরই সঙ্গে খানিক দূরে।

আহা, কী সব নাম! অলকনন্দা—মন্দাকিনী! যে-কোনো একটি নামের সঙ্গে দেখা হলেই মনপ্রাণ পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এমন একটি নদী চর্যচক্ষে দেখলেই মনে হবে, যাক, এতদিন ধরে বেঁচে থাকা সার্থক। রক্তপ্রয়াগে এমন দুটি নদীর সঙ্গম।

যে-ঘরে আমাদের পাশাপাশি তিনটে খাটবিছানা দেওয়া হয়েছে সেই ঘরে

আরো সতেরোটি শয্যা আছে। একটিই আজ শূন্য। বাকি ঘোলটিতে বোম্বাই-এর এক বাসভর্তি তীর্থযাত্রী আশ্রয় নিয়েছেন। আমাদের পাশেই একটি পিকোর বয়সী মেয়ে আছে, তার বাবার সঙ্গে সে তীর্থে এসেছে। বাবাকে খুব যত্ন করছে দেখলুম। মেয়েটির নাম কল্পনা দালাল, বি. এ. পড়ছে বয়েতে।—“বাবাকে তুমি খুব যত্ন করো, দেখে বড় ভালো লাগছে কল্পনা।”

বলতে মেয়েটি চোখ নিচু করে চুপ কবিরে রইল। একটু পরে বলল, “আমার মা এক মাস হলো হঠাৎ মারা গেছেন। বাবা খুব ভেঙে পড়েছেন।” একটু থেমে বলল, “এই ট্রিপটা বাবার পক্ষে খুব ভালো হলো। আমরা বঙ্গীনাথে যাচ্ছি, ব্রহ্ম-শিলার ওপরে মায়ের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করে আসতে চান বাবা।”

বঙ্গীনাথ শেষ ধাম। যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ হয়ে গেছে কল্পনাদের। বয়ে থেকে কিছু গুজরাটী কিছু মারাঠী ভক্ত এসেছেন তীর্থ করতে। সাধারণত কিন্তু প্রত্যেকটা বাসই বঙ্গসন্তানে ঠাসা। হরিদ্বার থেকেই আত্মক আর হুব্বীকেশ থেকেই আত্মক, দিল্লি থেকেই রওনা হয়ে থাক আর কলকাতা থেকেই—বাসের অর্ধাংশ ভর্তি থাকবেই বাঙালী যাত্রীতে। গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীতে তবু প্রচুর উত্তর-প্রদেশী, গাঢ়োয়ালী, পাঞ্জাবী দেহাতী তীর্থযাত্রী আসে—কিন্তু কেদার-বঙ্গী প্রধানত বাঙালীর তীর্থ।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙলো, দেখি খুব ব্যস্ততা বস্ত্রের যাত্রীদের মধ্যে। ঘরের মধ্য-খানে একটা টেবিলে দুটো পাত্রে চা আর কফি—যে যা চাইছে তার গেলাসে তাই ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। আমি আমার গেলানটি নিয়ে গিয়ে বললুম—কফি! শুনে লোকটি হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপর আমাকে অগ্রাহ্য করে অন্যদের পরিবেশনে মন দিল। আমি আরেকবার বললাম কফি! এবার লোকটি নাক কুঁচকে বলল, “বম্বাই বালোকো কফি হ্যায় ইয়ে, পাবলিক কফি থোড়াই হ্যায়!”

ছি ছি! লজ্জা পেয়ে পালাতে পথ পাই না। গ্রুপ ট্র্যাভেলের এই সুবিধা, ভোরবেলা কী সুন্দর চা কফি বিস্কুট দেয়। অগত্যা আমি একজন বেয়ারাকে ডেকে এনে টাকা দিলুম, “দয়া করে বাইরে থেকে তিন পেয়লা চা এনে দেবেন আমাদের?”

রুদ্রপ্রয়াগের চিতার গল্লেই রুদ্রপ্রয়াগ নামটি আবাল্য পরিচিত। চা খেয়েই রুদ্রপ্রয়াগ থেকে বেরিয়ে পড়ি। পথে ছুয়ে ছুয়ে যাচ্ছি—অনেক অচেনা, স্বপ্নে চেনা নাম। কর্ণপ্রয়াগ (পিণ্ডারগঙ্গা আর অলকনন্দা নদীর মিলন সেখানে), নন্দপ্রয়াগ (অলকনন্দা আর মন্দাকিনীর সঙ্গম; কোথাও যে ‘নন্দাকিনী’ নদী আছে, তাই জানি না), চামেলি, পীপলকোটি, যোশীমঠ। এখানে জগদগুরু শ্রীমদ্

শংকরাচার্যের মন্দিরটি রাস্তা থেকেই দেখা যায়, কিন্তু অনেকখানি নামতে হয়, আবার তো উঠতে হবে? প্রথমে পীপলকোটিতে এবং তারপর যোশীমঠে অনেক-ক্ষণ গাড়ি থামতেই হোলো। একমুখো রাস্তা, খোলা আছে কিনা, 'গেট' পাবো কিনা। চা খেলুম। দু'জন সাহেব হিপি প্রায় নেংটি পরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই স্থখে গঞ্জিকা-সেবন করছেন। এরা স্পষ্টতই পর্বতারোহী নন, ধর্মপাগল বলেও মনে হল না। এঁদের এখানে একটুও মানাচ্ছে না। চায়ের দোকানে দিব্যি থালায় করে ভাত-ভালও দিচ্ছে। আমরা একেবারে বজ্রীনাথ গিয়ে থাকো। পিকোলোটা পথে খেতে চায় না, গুর গা-বমিবিমি করে। সর্বত্র তো টিহরির গুয়েটিং রুম নেই।

৭

### জড়িয়ে আছে বাধা

এই যে আমি সপরিবারে, স-সংসারে বেড়াচ্ছি, বালতি-মগ-ইকমিক কুকারটাই যা সঙ্গে আনা হয়নি, এর স্বাদ কিন্তু মোটেই ভালো লাগছে না আমার। একা না হলে হিমালয়ের দিকে আসা উচিত নয়। এসেছি বটে, কিন্তু এ-ভাবে আসাটা কেমন যেন। এলেবেলে হয়ে যাচ্ছে। মনটা কেবলই বাধা থাকছে ঘরে-সংসারে। রঞ্জন কী খেল, পিকো কেন দুধ খেল না, কার কী গুধু চাই, কাকে শান্ত করতে হবে, কাকে বকতে হবে—বাপরে বাপ। এর জন্তে এতদূরে কষ্ট করে না এসে তো হিন্দুস্থান পার্কে থাকলেই হতো। তীর্থে আসা উচিত বোধ হয় হয় একেবারে একা নয়তো সমবয়সীদের সঙ্গে—যেখানে প্রত্যেকের নিজের দায়িত্ব নিজের। তাছাড়া হৃদয়মনও একতারে বাধা থাকা উচিত। এমনিতে পিকোর সঙ্গে, রঞ্জনের সঙ্গে আমার খুবই ভাব-ভালোবাসা। ওয়েভ লেংথের ফারাক নেই। অথচ হিমালয়ে এসে দেখছি সব গড়বড় হয়ে যাচ্ছে। হিমালয় মানুষকে এক করে দেয় যেমন তেমনি একাও করে দেয় তার মাঝে। আমি এখানে এসেও নবনীতা হইনি। মা থেকে গেছি, আর দিদি থেকে গেছি। এই মা আর এই দিদির চাপে নবনীতা মাথা তুলতে পারছে না।

পিকো বেচারারও দোষ নেই। তার সমস্তটা শারীরিক। পাহাড়ী ঘুরপথে আমারও ছোটবেলায় ভয়ানক কষ্ট হতো। বিয়ের পরেও অনেকদিন এই কষ্ট ছিল। সমানেই 'অ্যাভোমিন' 'ড্রামামিন' খেয়ে গাড়িতে ঘুরেছি। নিজে গাড়িটা চালালে কিন্তু আমার কার-সিকনেস হয় না। অগ্রে চালালেই যতো গুগোল। ১৯৭৫-এ শিলং যেতে গিয়ে আমার, পিকোর, টুম্পার তিনজনেরই এত কষ্ট হয়েছিল যে আর কখনও পাহাড়ে যাবো না ঠিক করেছিলুম। এই বমি-ভাবের যন্ত্রণা যার



হয় না তাকে বোঝানো যাবে না। তাই পিকোর ওপর চটেও উঠতে পারছি না। কি ভাগ্যি এ যাত্রায় আমার কার-সিকনেস হচ্ছে না। সেবার তাওয়াং যেতেও হয়নি। বোধ হয় অত্যাগত রোগের প্রকোপে এ রোগটা সেরেই গেল! সমুদ্রযাত্রাও আমি উপভোগ করতে পারি না এই কারণে। নী-সিক্ হবোই হবো। সেটা 'কুইন এলিজাবেথ' টু'-ই হোক আর 'স্ট্রাথনেভার'-ই হোক, কি চ্যানেল পারা-পারের একটা ইন্টিমারই হোক। আগে বিলেত থেকে প্যারিস যাবার সময়ে আমি তো প্রত্যেকবার স্টিমারে উঠেই ছুটতুম কেবিনের খোঁজে। যাতে শয্যাশ্রয়ী হয়ে পড়তে পারি। মাত্র ১০/১২টা বিছানা কম পরসায় পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে দখল না নিলেই হাতছাড়া!

ইদানীং সে-বামেলা মিটেছে হভারক্রাফ্ট হয়ে। আন্দামান আমার জাহাজে যেতে ইচ্ছে, অথচ প্রাণে বমির ভয়। তাই পিকোর হঠাৎ সমতলে নেমে যাবার গোঁ-টা আমি বুঝতে পারি।

৮

### ত্রিশঙ্কু বাস

যোশীমঠ থেকেই নানারকম হিমালয়ান পর্বত অভিযানগুলি শুরু হয়। এটাকেই প্রথম বেস ক্যাম্প করে। আর ৭/৮ মাইল পরেই গোবিন্দঘাট—চমৎকার গুরদোয়ারা আছে, লগ্-ক্যাবিন আছে সেখানে। সেখান থেকেই হাঁটাপথে যেতে হয় ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স আর হেমকুণ্ড। স্বরথ সিং বললে, সে গোবিন্দঘাটে গেছে। গুরদোয়ারায় চমৎকার বিছানা দেয়। শুধু দাড়ি কামানো আর ধূমপান বারণ আছে। আর স্ত্রীলোকের রাতিবাস করার জায়গা নেই। অতএব গোবিন্দঘাট গিয়ে স্থবিধে হবে না। ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্সের দিশি নাম নন্দন-কানন—এ বছর সেটি ভ্রমণকারীদের জন্ম থোলা নেই। সরকারী কোনো লালফিতের কারণে বন্ধ রয়েছে। হেমকুণ্ডে যেতে হয় বেশ খানিক সময় নিয়ে। ওসব আমাদের এ যাত্রায় হবে না। আমরা অবশ্য আপাতত যোশীমঠ ছেড়েই উপরে উঠতে পারছি না, 'গেট' আর মিলছেই না! কী ব্যাপার? বাসের ড্রাইভারদের সঙ্গে কাদের যেন ঝগড়া হয়েছে। বাস-ড্রাইভাররা হঠাৎ স্ট্রাইক করেছে। পথ রুদ্ধ হয়ে আছে। তারা বজ্রী থেকেও নামছে না। এখান থেকেও উঠছে না। মিলিটারী পুলিশ নানাভাবে গোলমাল মেটাতে চেষ্টা করছে। অবশেষে 'গেট' খুলে দিল প্রাইভেট গাড়িদের ছেড়ে দেবে বলে। জমতে জমতে সকাল থেকে দিবা এক প্রমাণ সাইজের গাড়ির মিছিল খাড়া হয়ে গেছে যোশীমঠের গেটের সামনে।

কাড়িতে একটি অল্পবয়সী মিলিটারি পুলিশ এসে আমাদের গাড়িতে লিফ্ট চাইল। বদ্রীনাথে কিছু পুলিশ যাওয়া দরকার। সব গাড়িতে-গাড়িতেই কিছু কিছু যাচ্ছে। পুলিশের এখন কোনো গাড়ি নেই এখানে। সুরথ সিং, রঞ্জনের সঙ্গে পুলিশটি বসল। স্কুল-ফাইনাল পাস করে পুলিশে ঢুকেছে। বছর ছুড়ি-বাইশ বয়েস হবে। আমাদের সঙ্গে খুব জমে গেল তার। সারা পথই হইহই করতে করতে গেলুম। খানিক বাদে দেখি লাইনের পর লাইন বাস নেমে আসতে শুরু করেছে। স্টাইক ভঙ্গ হয়ে গেছে।

৯

### যাত্রীদের মুক্তি

যোশীমঠ থেকে রওনা হয়েই একটি বাস দেখলুম পথের ধারে ত্রিশকু হয়ে বিপজ্জনক ভাবে শুলো খাদের ওপর বুলে আছে। বাসে কেউ নেই। পুলিশ বললে, ১১ তারিখ থেকেই গুটি ওভাবে আছে। কেউ মরেনি। ওই ঘটনা অ্যাকসিডেন্ট নয়। ওখানটাতে এক আত্মা আছেন, তিনি এই টানাটানিটা করেন। আগেও অনেকবার ঘটেছে। তবে কাউকে প্রাণে মারেন না। কোনো সাধু-মহাপুরুষের আত্মা হবে। আজ বিশ তারিখ না একুশ তারিখ, এখনও বাসটি কেউ টেনে তোলেনি, এটাই অবাক কাণ্ড। গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের বাস। সুরথ সিং, সাবধানে চালিও ভাই, কে জানে কোথায় কোন্ আত্মাকে খচিয়ে দেবো। শেষে ঠেলা মেরে দেবে! সব আত্মা তো সাধু-মহাপুরুষের নাও হতে পারে!

১০

### অলখ, নিরঞ্জন

বেশ কদিন ধরেই একেবারে হুয়ীকেশ থেকেই দেখছিলাম সারাপথ কিছু শিখ তীর্থযাত্রী হেঁটে হেঁটে ছুটে ছুটে চলেছেন। নিরঙ্কারী সর্দারও আছেন একটি একটি গ্রুপের সঙ্গে সঙ্গে গাঁদার মালা পরা। নীল পাগড়ি বাঁধা, সাদা কামিজ পরনে, কোমরে গেরুয়া, কোমরবন্ধে রুপাণ বুলছে, হাতে পতাকা। যোশীমঠে এসে তাঁরা গোবিন্দঘাটের পথে চলে যাচ্ছেন।

এঁরা পুরনো দিনের নিয়মে তীর্থে বেরিয়েছেন। যাচ্ছেন গোবিন্দঘাটে শিখদের মহাতীর্থে, পুরোটা রাস্তা পদব্রজে। পথে থামতে থামতে, বিশ্রাম নিতে নিতে, দলে দলে চলেছেন। কখনো বা প্রার্থনা সঙ্গীত গাইতে গাইতে। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে আজ তো সমানে একটির পরে একটি দল পেরিয়ে এলাম। বিশ বছরের তরুণ

থেকে সন্তর বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত হাঁটছেন, নিষ্ঠার নির্মল অঙ্কেয় মূর্তি, মন্ত্রপাঠ করতে করতে হাঁটছেন, দ্রুতপায়ে পার হয়ে যাচ্ছেন বাঁকের পর বাঁক। সন্ন্যাসীরা হাঁটছেন। সমস্তটা উত্তরখণ্ড সন্ন্যাসীদেরই দেশ, তাঁদেরই মাতৃভূমি, তাঁরা তো হাঁটবেনই। কিন্তু পদচারী এই শিখ তীর্থযাত্রীরা বোধ হয় গৃহী। অন্তত সন্ন্যাসী কিনা বুঝতে পারিনি, কেননা লক্ষণ জানা নেই আমার। কী দিয়ে চিনব? যোশীমঠের পর থেকে আর শিখ যাত্রীদের দেখা গেল না। ওদের বর্ণময় উপস্থিতির অভাবে হিমালয়ের পথ একটু যে শ্রিয়মাণ হয়ে পড়ল। জুন মাসে টোরেন্টের বসে যখন টিভিতে দেখছি, ভারতে এবং ভারতের বাইরেও শিখদের উন্নত রোষবহি—আমার ওই তীর্থযাত্রীদের মনে পড়ে যাচ্ছিল। মাহুচ চায় এক, হয় আর। স্বর্ণ-মন্দিরের ব্যাপারে কেউ জেতেনি। পরাজয় হয়েছে প্রত্যেকের। শহীদ হয়েও ভিক্তানওয়ারে জেতেনি, সার্থককামা হয়েও ইন্দিরা যেতেননি। হিংস্রতা প্রত্যেকটি জয়কে পরাজয়ে পৌঁছে দিয়েছে।

১১

### অন্তঃসলিলা

বজ্রীনাথের পথ খুব চট করেই সুন্দর হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে বরফের চাঙড়, বরফের দেওয়াল, বরফের গুহার আবির্ভাব ঘটতে লাগলো পথের ধারে। থামো থামো করতে করতেই গাড়ি পার হয়ে গেল সেই অপূর্ব তুষারগুহা, তার ভেতরে ঠাণ্ডা নীল অন্ধকারে ঝরঝর শব্দে ঝরনা ঝরছে—যেন কোনো ইংরেজি সিনেমার সেট থেকে তুলে আনা। হায় হায় করতে থাকি। নামা হোলো না। ক্যামেরাটা রয়েছে কী করতে? ফটোও তোলা হোলো না। হা-হুতাশের মধ্যে দেখি, আরে! ঠিক আরেকটা অমনি গুহা এখানে, আরো তুষার, আরো মোটা ধারার ঝরনা, আরো জটিল গুহাভ্যন্তরের বরফের জাক্রি-কাটা জালির কাজ।

লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়লুম সবাই মিলে। ছবি তুললুম, রাঙামুখো সেপাই সুক্কু বরফের মধ্যে ছড়বুদ্ধ শুরু করে দিলে। পিকো আবার বরফের চাদর বেয়ে বেয়ে বাদরের মতো (কিংবা হিলারী-তেনজিংয়ের মতো) উপরদিকে উঠতে লাগলো। তখনও বাচেন্দ্রি পাল এভারেস্টে চড়েননি, পিকোকে এই এক বছর ট্রেনিং দিলে, সেই পেরে যেত বোধহয় কাজটা। পাহাড়ে পায়ে হেঁটে তো চড়তে ওর আপত্তি নেই, পেট্রল চালিত শকটেই যত গগুগোল। অতি কষ্টে ডেকে-ডুকে স্বরথ সিং ও সেপাইজী পিকোকে নামালে—সত্যিই এটা একটা গ্রেসিয়ার। এবং পিছল। হঠাৎ পা ফসকে পা পিছলে পড়লে কোথায় পড়বে তার ঠিক নেই। ডানদিকে

পাহাড় আর বাদিকে অলকনন্দার খেলাধুলো। গ্রেসিয়ারের বরফের চাদরের তলা দিয়ে উকিঝুঁকি মারছে তার ঘননীল উপল উচ্ছল জলরাশি। বরফ ওপরটাতে জমে আছে। তলায় স্বচ্ছ উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ হৃদয়। অর্থাৎ অন্তরঙ্গলিলা হিমবাহ। দৃশ্যটি সত্যি অদ্ভুত সুন্দর। পাঁচটি পথের বাকি একই জায়গায় একই ভাবে এল এই বিশাল গ্রেসিয়ারটি। যা বোঝা গেল এটাকে কেটে কেটেই বাকি বাকি পথ তৈরি করা হয়েছে। মিলিটারির তৈরি রাস্তা, সর্বদা সমত্রে প্রস্তুত থাকে ট্যাংক ইত্যাদি বহনের জন্তে। বদ্রীনাথের পরেই ভারতের শেষ গ্রাম মানাগ্রাম। তারপর তিব্বত। মীমান্তসৈন্তের সদা জাগ্রত নজর থাকে এই পথের দিকে। গাড়ি থেকে নেমে প্রত্যেকবারই আমরা বরফের ঝরনায় খেলাধুলো করলুম। একসময়ে হঠাৎ বদ্রীনাথ এসে পড়ল।

১২

### বদরিকাশ্রমে

খোলামেলা উপত্যকা। মস্ত বড়। অনেকখানি খোলা। দূর থেকেই একবার দেখা গেল মন্দির। বিরাট দরজা মন্দিরের। বহুবর্ণ তোরণ। কাছাকাছি আসতেই মাইকে ভজন শোনা গেল। রামভজন। খুব সুন্দর স্বর। ভারি চমৎকার একটা ভক্তির আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। এই প্রথম দেখছি মাইকের কারণে ভগবদভক্তি উবে না গিয়ে মনে আবুলতা আসছে। স্থানমাহাত্ম্য? পুলিশ নেমে গেল ফাঁড়িতে। আমরা খোঁজ করতে লাগলুম বাসস্থানের। রুদ্রপ্রয়াগের টুরিস্ট লজে বলেছিল এখানকার টুরিস্ট লজে খোঁজ নিতে। নয়তো দেবলোক হোটেলে। ছুটোই ভর্তি। তখন আমি দেবলোকের পার্শ্ববর্তী ঝকঝকে ধর্মশালাটিতে বালানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে খোঁজ নিই। ই্যা, ঘর আছে। না, খরচ লাগে না। বিছানা ভাড়া পাওয়া যায়। খাবারের ব্যবস্থা নেই। সামনেই বাঙালীর হোটেল আছে, সুপ্রিয়া হোটেল, পাঁচ টাকাতে ভাত ডাল চচ্চড়ি দই পাবেন। আর কোনো কথা নয়, এইখানেই থাকবো। জায়গাটি খুব ভালো। এবং সঙ্গে লাগোয়া কলঘর। বালানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রম মানে যে মোহনানন্দ মহারাজেরই গুরুদেবের আশ্রম সেটা এতক্ষণে খেয়াল হলো। এখানেই তার মানে সেই ‘যদি হও সৃজন’ ন’জন বঙ্গসন্তানও উঠবেন। তাঁরাও বালানন্দ ব্রহ্মচারীর শিষ্য। আর সেই চারজন ভদ্রলোক আর এক তরুণ সম্যাসী দেওঘরবাসী, তাঁরাও তাই। যমুনাতীতে, গঙ্গাতীতে, উত্তরকাশীতে তাঁদের দেখা পেয়েছি। বার বার একসঙ্গে নানাভাবে ছুঁড়ে দিয়েছেন ঈশ্বর আমাদের।

ভৈরববাঁটিতে উঠে আবিষ্কার করেছিলুম ওঁদের মধ্যে একজনের বয়স সত্তর, পায়ের আর্থ্রাইটিসে পঙ্গু ছিলেন, আরেক জনের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল উরুর হাড় ভেঙে গেছে, তার জায়গায় লৌহশলাকা প্রবিষ্ট করানো আছে, তিনিও সত্তরের ঘরে—তারা সবাই খচ্চরে চড়ে যমুনোত্রী, পদব্রজে গঙ্গোত্রী যাত্রা সম্পূর্ণ করেছেন বিনাবিল্পে। কিন্তু ওঁদের সঙ্গে অল্পবয়সীরাও তো? তাই ভৈরববাঁটিতে আমরা আগে পৌঁছোলেও, ওঁরাই জীপটা পুরো ভাড়া নিয়ে চলে গেলেন, আমাদের নিলেন না। আমরা বাসে গেলুম গঙ্গোত্রী। প্রচণ্ড ভিড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ফেব্রার সময়ে আগে আমরাই জিপ ভাড়া করেছিলুম, ৭ জন হয়ে গেছি ততক্ষণে, কবিতাদিদের ৪ জনকে সঙ্গে পেয়ে। ওঁরা অস্থির। জিপ পাচ্ছেন না, কেননা ২০শে গঙ্গাদেশেরা, সেদিন ১২শে লক্ষ লক্ষ মানুষ উঠে আসছে গঙ্গোত্রীতে, প্রচণ্ড ভিড়। ব্যস্ততা। আমরা কষ্ট করেও কিন্তু ওঁদের নিয়েছিলুম আমাদের জীপে। এই প্রথমবার এক জায়গায় এসেও ওঁদের সঙ্গে দেখা হলো না।

সুপ্রিয়া হোটেলের মালিকানি সুপ্রিয়া বলে এক বাঙালী মহিলা স্বয়ং। তাঁর কাজের লোকেরা তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সুপ্রিয়াদির মা তাদের ডেকে তুললেন। ছুটি অল্পবয়সী বাঙালী ছেলে। আমাদের গরম ভাত পরিবেশন করলো তারা। সেখানে একটি সুন্দরী বালিকাকে দেখে চেনা-চেনা লাগলো। খুকু, তোমার নাম কী? নীতা। নীপা-নীতার নীতা কি? তুমি কি নমিতার মেয়ে? বলতেই সে যেমন অবাক, ঠিক তেমনি খুশি। হ্যাঁ। সে নীপার বোন নীতাই। বাবার বন্ধু কানাই (গাঙ্গুলি) কাকাবাবুর নাতনী। গীতা (ঘটক) দিদির বোনঝি। সুপ্রিয়া তার জ্যেষ্ঠমা। যা বুঝলুম এই বাঙালী মহিলা ছেলেকে নিয়ে কলকাতা থেকে সুপ্রিয়া ট্রাভেলস্ এবং এখানে সুপ্রিয়া হোটেলটি চালান। ছোটোই ব্যক্তিগত পরিদর্শনে খুবই ভালো চলছে। নীতা পরীক্ষার পর বেড়াতে এসেছে জ্যেষ্ঠমার কাছে। সুপ্রিয়ার মাও এসেছেন। ভালো ভাবেই মার্খক ব্যবসা চালাচ্ছেন। ট্রাভেলে ওঁর পুত্রটিও ওঁর সহায়। এ বছর সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া (Ph. D.) খতম করেছে। বাঙালী মহিলাটি এই শীতেও প্রতাহ স্বয়ং বাজার করে আনেন মানাগ্রাম থেকে। চাল, ডিম, সবজী, ফল কিছুই বাকি থাকে না। খুবই ভালো লাগলো বঙ্গ-মহিলার এই বাণিজ্যপ্রয়াস।

সুপ্রিয়ার হোটলে ভাত খেয়ে আমরা বেরুই মন্দিরের রাস্তায়। মন্দিরে যাবো পরে। শীত করছে। আমার শালটা তো রঞ্জন যমুনোত্রীর পথে হতুমান-চটিতে হারিয়ে ফেলেছে। একটা শাল কিনে নিতে হবে। শুধু তো বদ্বীই নয়, কেদারেও যাওয়া আছে। সেটা তো চোদ্দ হাজার ফিট। আরও শীত করবে।

বেশ সুন্দর একটা নরম গরম লেডিজ লুথিয়ানা শাল পঞ্চাশ টাকায় কিনে ফেলা হল। চারিদিকে বাজার বসেছে। কত রকমের কুসুম, সিঁদুর। বদ্রীর লক্ষ্মীর সিঁদুরকোটো, পুতির মালা, তামা-পেতলের আংটির ছড়াছড়ি। আর আছে চারধামের ছবির বই, বদ্রীনাথের পট। এ ছাড়া পবিত্র অলকনন্দার জল বয়ে নিয়ে ঘাবার ছোট-বড়ো হাজার রকম ঘটি। গঙ্গোত্রীতেও ছিলো। এক যমুনোত্রীটাই বা জংলী ঠাই। তবে বদ্রীনাথ প্রায় বতিনাথের মতোই মফঃস্বল শহরের চেহারা নিয়েছে। সরকারী মস্ত ডাকঘর। বেশির ভাগ বাড়িই কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানের বা ব্যক্তির অতিথিনিবাস, ধর্মশালা। একটা সংস্কৃত স্কুলও যতদূর মনে হয় চোখে পড়েছিল। সিনেমা হল ছিল কিনা জানি না। খোঁজ করিনি। পথের লোকেদের হাতে কিন্তু ট্রানজিস্টার ছিল না। সর্বত্রই শোনা যাচ্ছে মন্দিরের ভজন। দোকানদারও গুনগুন করে গেয়ে উঠছে রামায়ণেরই ছ'কলি।

মন্দিরেরই রাস্তায় এইসব বাজার। এবং প্রচুর চায়ের দোকান। দোসা, ইডলি, কফির দোকান আছে, অমলেটও পাওয়া যায় শুনলুম, যদিও সারা উত্তর-খণ্ডেই মাছ-মাংস-ডিম রান্না হত না এককালে। আর উঃ, কী ভিথিরির অত্যাচার! বদ্রীনাথে ভিথিরিদের আর পাণ্ডাদের রাজত্ব। অলকনন্দা পার হয়ে মন্দিরে যেতে হয়। সেতুর দু'ধারে ভিথিরিরা মিছিল করে বসে আছে। পুণ্যার্থী পয়সা ফেলতে কেলতে যাচ্ছেন। সেতুতে ওঠার খানিক আগে থেকে শুরু হয়ে যায় এই ভিথিরির কিউ। এক একজন ভিথিরি আবার যে-সে ভিথিরি নয়। তাদের ছোটখাটো ব্যবসা আছে। বাটা নিয়ে খুচরো যোগান দেয় তারা ঘাত্রীদের, এক টাকার খুচরো নিলে ১৫ পয়সা বাটা লাগে। সেইসব খুচরো আবার ভিথিরিদের খালায় ফেরত যায়।

১৩

### মুনস্টোন ব্ল্যাকস্টোন

রাস্তায় হাঁটছি, পথের দু'পাশে কত রকমের যে সাধুবাবাদের আস্তানা। কেউ আসল, কেউ নকল। আমি দেখে অত বুঝি না। যাকে ইচ্ছে হয় পয়সা দিই। সবাই পয়সা চায়ও না। কেউ ধুনি জালিয়ে ব্যোম হয়ে, কেউ সামনে মালা, পাথর, আংটি নিয়ে, কেউ শেকড়বাকড় জড়িবাঁট নিয়ে বসে আছে। একজন সাধু-বাবা, মাথায় মস্ত রাজপুত পাগড়ী গেকুয়া রঙের, পরনের ধুতিও গেকুয়া, হঠাৎ পিকোকে ডেকে বললে—‘ও খুকি, এত রাগ ভালো নয়, রাগ একটু কমাও, একটা মুনস্টোন পরিধান কর। তোমার মনটা খুবই নরম, কিন্তু একটুতেই ভয়ানক চটে

ওঠো।' পিকো তো অবাক! এবং আমি তো ভাবলুম বুঝি একুনি চটেও উঠবে: 'কে তোমাকে এসব বলতে বলেছে?' কিন্তু চটল না। বদ্রীনাথের পথে সারাক্ষণ থেমে থেমে বরফের গুহায় বর্ণায় এত খেলা করে তার মেজাজ বেশ প্রফুল্ল। আর বদ্রীনাথে পৌঁছে চতুর্দিকের সবুজ উপত্যকা, বাতাসে ভজনের স্বর, আকাশে নরনারায়ণ, নীলকণ্ঠ শিখরের হিমেল শোভা তার মেজাজ ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। মজা পেয়ে পিকো দাঁড়িয়ে পড়ল। আমিও। সাধুটি পিকোকে বলল, তোমার মন বড় ছটফট করে। পড়াশুনোয় মন বসে না। তুমি একটা মুনস্টোন পরে নাও। আর তোমার মা-বেচারীর বড় ঝামেলা, একা-একাই সংসারটা সব দেখতে হয়। তোমার বাবা তো কোনো কাজের নন, সংসার দেখেন না। তোমার মাকে সাহায্য করবে। তোমার মা চাকরি ছাড়াও অল্প যে-কাজটা করেন, সে ব্যবসায় ঠর খুব উন্নতি হবে। আর তোমার দিদিমার জন্তে একটা ব্ল্যাকস্টোন নিয়ে যাও—শনির দশা চলছে। রঞ্জনকে বললে, তোমার কেবলই নতুন নতুন ব্যবসার ফন্দি, কোনোটাই হবে না। ব্যবসা কোর না, চাকরিই তোমার ভালো।

চিরদিন শুনেই আসছি তীর্থে-তীর্থে এরকম সব সাধুবাবা থাকেন। চোখে না দেখলে যেন মজাটা সম্পূর্ণ হতো না!

সাধুবারের কেরামতি দেখে আমরা থ'। তিনি স্টোন বেচতে এসব বলছেন কিনা বোঝা গেল না। কেননা পিকোকে তিনি মুনস্টোন ধারণ করতে বললেন, কিন্তু তাঁর নিজের বুলিতেই চন্দ্রকান্ত মণি নেই। অল্প কোথাও কিনে নাও, বললেন। এখানে অনেক পাবে। ব্ল্যাকস্টোন কাকে বলে জানি না, একটা কিনলুম মা'র জন্তে। সেটা কলকাতা অবধি এসেছিল কিন্তু মাগের আঙুলে ওঠেনি। হারিয়ে গেছে। মা বললেন, উনি পাথর ধারণ করেননি কখনও, করবেনও না শেষ বয়সে। যে যাই বলুক। আমিও ওসব পরিনি। কিন্তু একথাও মিথ্যে নয় যে পিকোর স্বভাবে হঠাৎ মনোনিবেশ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। সাধুটি বুঝল কী করে? পিকোকে দিল্লি থেকে একটা মুনস্টোনের আংটি এনে দিলুম। সে 'ধ্যাংকিউ মা' বলে মিষ্টি হেসে নিলে। তারপর থেকে দেখছি সমানেই আমার ছোট মেয়ে টুপ্পা সেটি পরে বেড়াচ্ছে। রঞ্জন এঞ্জিনিয়ার। কিন্তু চাকরিতে সন্তুষ্ট না থেকে সত্যি সত্যি নানা রকমের ব্যবসার চেষ্টা করতো। উপরির ধান্দায় ঘুরতো দিনরাত। কোনোটাই সফল হতো না সেও ঠিক। রঞ্জন সেই বছরেই ঐ চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। এখন দিল্লিতে ঠিক ডবল মাইনের একটা চাকরি করছে। ওর হাতে বদ্রীর একটা তামা পেন্সিলের আংটি আছে। এখনও ও তো বলে, ওটার জন্তেই সব উন্নতি! পঁচিশ পয়সা দাম ছিল আংটিটার।

পিকোর বাবা কোনো কাজের নয়—একথা তাঁর পরম শত্রুও বলবে না। তিনি প্রচণ্ড কর্মীব্যক্তি, বিশ্রামহীনভাবে দিবারাত্র পড়াশুনা করেন। তবে হ্যাঁ, ঘর সংসার দেখবার মত অতটা সময় তাঁর নেই। সাধুটা কেমন করে কী বলল কে জানে। সাধুর দেশ কোথায়? বললে, জয়পুর। ললাটলিপি পড়তে পারি। কলকাতাতেও যাই মাঝে মাঝে। ভালহাউসিতে (না ব্রেবর্ণ রোড, কোথায় যেন?) ইউ. বি. আই. আছে, তার কাছেই ফুটপাথে বসি। রঞ্জন বলেছিল, খুঁজে বের করবে। আর আমি ‘চাকরি ছাড়াও’ যেটা করি, সেটা যদি এই কলম ঠেলা হয়, তবে সেটাকে ‘ব্যবসা’ বলায় পিকোরা খুব মজা পেয়ে গেল।—“কি গো, ব্যবসা কেমন চলছে?” বলে খ্যাপাতে লাগলো। ভুল-ঠিক যাই হোক, সাধুবাবার অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে আমরা মন্দিরের আশেপাশে ঘুরে অলকনন্দার উন্নত যুগ্মশ্রোতের সৌন্দর্য সন্দর্শন করে বালানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে ফিরলুম।

১৪

### দুরাকান্ডকীর স্বর্গারোহণ

মানাগ্রামে যেতে হবে এইবার। বিশ্রাম হয়ে গেছে সুরথ সিংয়ের। একজন বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি ডানলপে চাকরি করেন। আমাদের সঙ্গে তাঁকেও মানাগ্রামে ধরে নিয়ে গেলুম। মানাগ্রামে যেতে হলে অলকনন্দার ওপারে যেতে হয়। চমৎকার দৃশ্য। অনেকখানি গ্রেসিয়ার পার হয়ে যেতে হবে। গাড়ির রাস্তা শেষ। বরফের মধ্যে পায়ে-চলা-পথ রয়েছে। পাথুরে রাস্তা থেকে নেমে সেখান দিয়ে ওপারে গিয়ে নদীর ধার দিয়ে গিয়ে সেতু পার হয়ে যেতে হবে। এদিকে ছোট্ট মিলিটারি ফাঁড়ি মতন আছে একটা। সেখানে গাড়ি রেখে গেলেই হবে। মানগ্রামটি ছবির মতো দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। তারও পিছনে দেখা যাচ্ছে বহুধারা জলপ্রপাতের দীর্ঘ জলধারা। আমার ওখানেই যাবার ইচ্ছে। মানাগ্রামের পথেই ব্যাসগুহা। যেখানে ব্যাসদেব তপস্বী করেছিলেন।

বহুধারা জলপ্রপাতের কাছে অষ্টবহুরা আট ভাই তপস্বী করেছিলেন। বঙ্গীনাথ থেকে ‘সত্যপথ যাত্রা’ বলে আগেকার দিনে একটি তীর্থযাত্রা ছিল, এখনও যাত্রীরা যায়। সারাদিন লাগে। আষাঢ় আষাঢ় মাসে ছাড়া এ পথে যাত্রা হয় না। বরফ ঢালা রাস্তা দিয়ে, বহুধারা পেরিয়ে, মুকুন্দ গুহা চক্রতীর্থ পেরিয়ে সত্যপথ সরোবর, সেখান থেকে চন্দ্রকুণ্ডে ও সূর্যকুণ্ডে যাওয়া যায়। এ অঞ্চলে পুরোনো মুনি-ঋষিদের বহু গুহা পড়ে আছে। চমৎকার দৃশ্য। একেই নাকি আগে বলতো ‘স্বর্গারোহণ’।



এটাই সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার পথ।

মানাগ্রামে গেলে ভীম-পুলটাও দেখা হয়। ভীম নাকি বড় বড় কালো কালো পাথরের টাই ফেলে এই প্রাকৃতিক পুল তৈরি করেছিলেন। অলকনন্দার জল এখানে উদ্দাম হয়ে ফুঁসছে।

মানাগ্রামের বাসিন্দারা সবাই উপজাতীয়, তারা তিব্বতের সঙ্গে উলের ব্যবসা করত। চীনযুদ্ধের পর সেসব বন্ধ।

এখন ওদের বোনা কয়ল আর শাল ‘খাদি গ্রামোত্তোগ’ কিনে নেয়। ভেড়া পোষা, উল তৈরি, তাঁতে বোনা সবই গ্রামের লোকেরা করে। গ্রাম ছাড়িয়ে আর কয়েক কিলোমিটার গেলে মানা-পাস, মানা-গিরিপথ। সেখানে যেতে দেয় না, মিলিটারি পাস চাই।

যেতে দিলে মানা-গিরিপথ দিয়ে সশরীরে যেখানে যাওয়া যেতো সেটা স্বর্গ নয়, তিব্বত। এবং প্রায়ই তিব্বত থেকে রিফিউজি মানুষ চলে আসে এপারে পালিয়ে চাকরির আশায়, উন্নতির আশায়। আমাদের সঙ্গেই তো দেখা হয়ে গেল একটা ছেলের। বছর ষোলো-সতেরোর ছেলে হবে—আমাদের সঙ্গে জুটে গেল হঠাৎ। “মেমসাব কাম দো! হমকো সাথমে লে চলো! কেবল মোট বইবার কাজটা আমি পারবো না, আর যে কোনো কাজ করতে পারি।”

“কেন? মোট বইতে পারবে না কেন?”

“মোট বইতে বইতে মুখে রক্ত উঠে আমার পিতাজী মরে গেলেন যে—আমার মা বারণ করে দিয়েছে—মোট বইবার কাজ ছাড়া অন্য যে কোনো কাজ—পেট চলে না মেমসাব—” ছেলেটির ফুলের মতো মুখখানি দেখে মন খারাপ হয়ে যায়। আমার কী ক্ষমতা যে আমি তার পেট চালানোর ব্যবস্থা করবো! যিনি সকলের পেট চালান তিনিই তোমার পেটও চালাবেন বাছা। বদ্রীনাথকে বলো। আমাকে বলে কী হবে? আমার দেশ অনেক দূরে, সেখানে চলে গেলে তোমার মায়ের কাছে কেঁরা খুব কঠিন হয়ে যাবে। বরং এখানে চায়ের দোকান-টোকানে কাজ খোঁজ।

১৫

ও টাঁদ

শুকো হয়ে গেল ধর্মশালায় ফিরতে। টর্চ যদিও আছে, ঘরে মোমবাতি চাই। এঁরা আলো দেন না। বাজারে যেতে হবে বাতি কিনতে। আলোচনা করছি, হঠাৎ একটি ছেলে উঠে এল। ধর্মশালার সামনে অনেকে বসে আছেন, গল্পগল্প

করছেন, প্রত্যেকেই বাঙালী বলে মনে হচ্ছে। ছেলেটি এসে বলল—‘কী দিদি, মোমবাতি চাই? দাঁড়ান এক মিনিট—বলে দৌড়ে ভেতরে ঢুকে গেল। ফিরে এলো একটা মোটা মোমবাতি নিয়ে। ছেলেটার নাম অলোকনাথ। একলাই এসেছে কেদারবতী ঘুরতে। আমাদের দলের সঙ্গে ওকে জুড়ে নিলাম বিনা বাকা-বায়ে। বাকা অবিশিষ্ট বিশেষ ব্যয় করে না ছেলেটি। নদীর ধারে একটা মাদ্রাজী দোকানে দোসা কফি দিয়ে ডিনার সেরে নিলুম। জানলা দিয়ে অলকনন্দার মন্ততা দেখা যাচ্ছে, তার ওধারে মন্দির। মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। আজ সব ঘুরে দেখে এসেছি। কাল যাবো বতীনারায়ণ দর্শনে। গলির পর গলি, তাতে ভোগ আর প্রসাদ বিক্রি হচ্ছে। বতীনাতের প্রসাদটি ভারি ভালো। মেওয়া, শুকনো ফল, ডাল, মুড়কির প্রসাদ। নানা রকমের ডালা পাওয়া যায় এখানেও।

পাঁচমিকে থেকে শুরু করে হাজার টাকার পর্যন্ত পুজো আছে। মন্দিরের পাশে একটা নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া আছে বিভিন্ন দামের পুজোর। এটা আমি খেয়াল করিনি—আলোক বললে।—‘দূর শালা, ঠাকুর-দেবতাকে নিয়ে ঘোর ব্যবসা কেঁদেছে ব্যাটারা! পঞ্চাশ টাকার পুজো, পাঁচশো টাকার পুজো, ছি ছি, কী লজ্জা!—’

আমরা আগামীকাল মন্দিরে যাবো, ঐ ৫ টাকার পুজোই যথেষ্ট আমাদের পক্ষে। ৫ টাকাতে যদি পছন্দসই প্রসাদ না থাকে, তবে অবিশিষ্ট ১১ টাকাতে উঠতে রাজি আছি।

চমৎকার একটা সর্বগ্রাসী চাঁদ ইতিমধ্যে উঠে পড়লো আকাশে। চাঁদের আলোয় মুহূর্তের মধ্যে একেবারে পালটে গেল বতীনানাথ উপত্যকা। ভজনের হ্রদ এখনও বন্ধ হয় নি। সব ঘরদোর যেন এক মিনিটেই তরল হয়ে গেল, যেন কোথাও কোনো ইট কাঠ পাথর নেই—এই যে উত্তর হিমালয়—সেও যেন জমাট কিছু আলো আঁধার মাত্র। একুশ হাজার ফুট উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রক্তনিভ নীলকণ্ঠ পর্বত—নর আর নারায়ণ দুই শিখরকে দুই পাশে নিয়ে। দেখে দেখে যেন আশ মেটে না। এদিকে ঘুম পাচ্ছে, শীত করছে। ঘরে এসে ঢালা সতরঞ্চি পাতা। তক্তাপোশে ভাড়া করা নরম পরিচ্ছন্ন লেপ তোশক পেতে, নিজেদের সঙ্গে তো বালিশ আছেই—শুয়ে পড়া গেল। জানলা ঘরের মধ্যে মাত্র একটি। জানলা বন্ধ না করলে শীত,—এদিকে সব বন্ধছন্দ করে আমি ঘুমোতে ভালবাসি না। অতএব একপাল্লা খুলে রাখার ব্যবস্থা। ঘরের মধ্যে ধূমপান করতে রক্তনকে আমার কড়া নিষেধ। যেহেতু আমি আর পিকো শুয়ে পড়েছি, রক্তনের খাটটাও ওদিকেই—ও ভাবলো চুপিচুপি জানলায় গিয়ে লুকিয়ে একটা

সিগারেট খেয়ে নেবে। ঘরটা বড়। এদিকে শুয়েছি আমরা, অত টের পাবো না, ধোঁয়া যদি ঘরে না চোকে। কিন্তু জানলায় দাঁড়িয়েই রঞ্জন সব ভুলে গিয়ে টেচিয়ে উঠলো।—“দিদি! দিদি! পিকো! পিকো! ওঠ! ওঠ! এদিকে আয়!” হাতের সিগারেট হাতেই রইলো জলজ্যান্ত নাক্ষী হয়ে। আমরা ‘কেন? কেন? কী বল, কী হল?’ বলে পড়িমরি করে ছুটে গেলুম। গিয়ে দেখি জানলায় চাঁদসমেত নীলকণ্ঠ! যে দৃশ্য ছেড়ে কিছুতেই ঘরে আসতে চাইছিলুম না, সেই দৃশ্যই বরং আরো অপক্লপ হয়ে দোতলার জানলার ফ্রেমে এসে ধরা দিয়েছে। মাথায় গলায় বেশ করে কক্ষটার জড়িয়ে, হি হি করে কেঁপে, ঘরটির সব ঠাণ্ডা করে ফেলে আমরা অনেক রাত পর্যন্ত জানলা খুলে চন্দ্রমৌলি নীলকণ্ঠকে দর্শন করলুম—যতক্ষণ না চাঁদ স্ত্রিয়মান হয়ে নীলকণ্ঠর গলা ছেড়ে দিয়ে নিজের দেশে ফিরে গেল।

১৬

### পর্দা-বেপর্দা হ্যায়

সকালবেলায় করিডরে চা-ওলা চলে এল—‘চা! চা! চা! গরম চা চাই’—পরিষ্কার বাংলায়। সুপ্রিয়া হোটেলের সেই ছেলেরা। দু’জনেরই কবির নামে নাম। একজন জয়দেব আর একজন কালিদাস। অনেকদিন আছে সুপ্রিয়া ট্রাভেলসের সঙ্গে। চা খেয়ে মুখ ধুয়ে জামাকাপড় বগলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। অলোকনাথ এসে গেছে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে নদী পেরিয়ে চললুম তপ্তকুণ্ডে। তপ্তকুণ্ডে স্নান করে, ব্রহ্মশিলায় পিতৃতর্পণ করে, বদ্রীনারায়ণ দর্শন করে ব্রেকফাস্ট খাবো।

তপ্তকুণ্ড দু’চারটে আছে। প্রধান যেটা, তার পাশেই একটা কুণ্ড আছে ‘মহিলাদের জন্ম’। অলোক আর রঞ্জন গেল থোলা তপ্তকুণ্ডে, আমি আর পিকো গেলুম একটু আকুর খোঁজে। সেখানে সত্যি ঢাকা জায়গা, পরিচ্ছন্ন, জলও পরিষ্কার। তবে প্রচণ্ড গরম। জলে নামা প্রায় অসম্ভব। এক মোটা পাঞ্জাবিনী ঘাটে বসে বালতি ঘটি নিয়ে স্নান করছেন। উল্টোদিকে ৩৪টি বালিকা জলে নেমে খেলা করছে। নামল কী করে? আমি একটু একটু তবু জলে নামছি—পিকো তো একটুও না। শেষে ঐ মহিলার ঘটিটা চেয়ে নিয়ে স্নান সারতে হোলো। কিন্তু ভিজ়ে কাপড় বদলাতে গিয়ে দেখি এক মজা। এদিকে ঢাকাচুকি, কিন্তু একতলা উঁচু দেওয়ালের ওপাশে তিন-চারতলা উঁচু ধর্মশালা। তার প্রতি তলায় বারান্দায় বারান্দায় দর্শকের ভিড়। আমরা হলাম দ্রষ্টব্য। বড়ই লজ্জার ব্যাপার।

কী আর করা যায়। ওদিকে পাঁচিলের ওপর থেকেও উঁকি দিচ্ছে পুণ্যালোভী পুরুষ-  
মাছুয়ের হাত, কপাল, চক্ষুতারকা। ভক্তের জন্তে ভগবানের কী আশ্চর্য ব্যবস্থা।  
মন্দিরের ঠিক সামনেই স্বাভাবিক উষ্ণনিষ্কর—একেবারে হিমশীতল অলকনন্দার  
গা দিয়েই উঠে এসেছে তপ্তকুণ্ড। যগ্ননোত্রীতেও এই জিনিস দেখেছি। গঙ্গোত্রীতেই  
কেবল কোনো উষ্ণকুণ্ডের খবর পাই নি। কেদারনাথের পথে শুনেছি গৌরী-  
কুণ্ডেও এমনি উষ্ণপ্রস্রবণের কুণ্ড। যাত্রীদের ক্লান্তি অপনোদনের কী চমৎকার  
সুব্যবস্থা!

১৭

### প্রবঞ্চক, সাবধান!

স্নান সেরে আমি অলোক আর রঞ্জন চললুম ব্রহ্মকপালী শিলার খোঁজে, পিতৃতত্পণ  
করবো। পিকো লাকতে লাকতে ক্যামেরা নিয়ে মন্দিরে গেল। পিণ্ডদানের  
নানা বিচিত্র ব্যবস্থা। হরেক রকম দামের পিণ্ড দিতে পারেন। কেবল আপনার  
পিতৃকুলের কার কত টাকা পর্বস্ত্র নৈবেদ্য প্রাপ্ত হতে পারে, হিসেব করে নিন। চাল,  
কলা, পৈতে, হতলুকি—কী সব যেন আছে একটা পাতায় মোড়া। গঙ্গাতুলসীও  
আছে দেখলুম। গঙ্গার ধারে সারি সারি পাণ্ডুরা বসে শ্রাদ্ধতত্পণ করাচ্ছেন যাত্রীদের।  
প্রচুর দেহাতি মাছুষ দেখলুম এখানে।

সকালবেলায় আমাদের ঘরে একজন দীর্ঘ গৌরবর্ণ হৃদর্শন পুরুষ্ঠাকুর এসে  
আমাকে একটা কার্ড দিয়ে গেছেন। শ্রীযুত ভট্ট, তিনি বাঙালীদের পাণ্ডা। অবশ্য  
পাণ্ডা শব্দটা তাঁর পছন্দ নয়, কার্ডে লেখা আছে তীর্থগুরু (ব্র্যাকেটে পাণ্ডা)।  
তিনি পুরুষের নাম আছে কার্ডে। এবং ব্রজীনাথের, দেবপ্রসাদগের, হরিধারের ও  
কলকাতার চারটি ঠিকানা আছে। এছাড়া ছাপা আছে, তাঁরা নিম্নলিখিত আশ্রমের  
ও ব্যক্তির তীর্থগুরু। ভারত সেবাশ্রম, দেবসংঘ, গোঁড়ীয় মঠ, আনন্দময়ী মায়ের  
আশ্রম, শ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ ও শ্রীসীতারামদাস গুহারনাথ মহারাজ।  
এতগুলি নাম? প্রায় সব ক’টি বাঙালী ধর্মগুরু ও আশ্রমেরই ভার নিয়ে বসে  
আছেন যে এই ভট্ট পরিবার! বেশ, আমাদেরও তবে তত্পণ করিয়ে দেবেন। কার্ডের  
নিচে বড় হরফে ছাপানো আছে, ‘বিঃ দ্রঃ—প্রবঞ্চক হইতে সাবধান থাকিবেন।’

স্নান সেরে উঠে যেখানে ভট্টবাবুর দেখা পাবার কথা ছিল সেখানে তাঁকে  
পাণ্ডয়া গেল না। তিনি কোনো শাঁসালো মক্কেল পেয়ে গেছেন নিশ্চয়। মনে  
বেশ হালকা বোধ করলুম। নিজের মনে ব্রহ্মশিলায় গিয়ে এবার জলে পিণ্ড অর্পণ  
করি। পিণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে পা পিছলে আমিও পড়ে যাচ্ছিলুম জলে। ‘যা চেয়েছো

তার কিছু বেশি দিব' বলে পিণ্ডের সঙ্গে পিণ্ডদাতাও মশরীরে গিয়ে স্বর্গে উপস্থিত হলে কি জানি পিতা আর শ্বশুরমশাইয়ের কেমন লাগতো !

রঞ্জন খপাৎ করে ধরে ফেলে সেটা হতে দিলে না। অলোকও একজন পাণ্ডা পাকড়ে বাবার শ্রাদ্ধশাস্তি করে নিলে। মাত্র বছরখানেক হলো সে পিতৃহীন হয়েছে, এখনও গুরুদশা চলছে। হঠাৎ মনে পড়ল সেই কল্লনা দালালের কথা। তার মায়ের শ্রাদ্ধ এই ব্রহ্মশিলায় করবার ইচ্ছে ছিল তার বাবার।

১৮

### পথের শেষ কোথায়

কী আশ্চর্যই লাগে আমাদের এই পিণ্ডদানের রীতিটাকে আমার। সব সুন্দর জায়গাতেই আগে আমরা ঈশ্বরের পীঠস্থানে রচনা করি, আর ঈশ্বরের সামনে এসে দাঁড়াতে গেলে আমরা একবার শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতার স্বরণ করে নিই আমাদের জন্মের কারণকে। জন্মদানের জন্ত। এই যে এতদূরে আজ এসে পৌঁছেছি, এই যাত্রা শুরু করে দেওয়ার জন্ত পিতৃপুরুষকে ধন্যবাদ দিয়ে তবে আমাদের পুণ্য অর্জন হয়। হিন্দুধর্মের মধ্যে চর্চা করে নেমকহারামির স্বযোগ নেই। পিণ্ডদান, পূর্বপুরুষকে তুষায় জলদান এই যে অচ্ছেদ্য যুগযুগান্তের মধ্যে যোগাযোগ সংরক্ষণ, এই ব্যাপারটার মধ্যে একটা আত্মিক সৌন্দর্য আছে। নম্রতার, কৃতজ্ঞতার একটা শোভা আছে। মস্তকমুণ্ডনে যে বিনয়, আত্মস্থ-বিসর্জনের যে বিমল প্রভা আছে, অর্শোচ পালনের মধ্যে যে হাহাকার আর অভাববোধের প্রকট অন্তর্ভব—সেগুলি আধুনিকতার নাম করে চিন্তাহীন কুলোর বাতাসে অথবা উড়িয়ে দিচ্ছি আমরা। পরে আর ডেকেও আনতে পারব না ফিরিয়ে। রিচুয়ালভক্ত আমি এমনিতে নই। কিন্তু মৃত্যু সম্পর্কিত রিচুয়ালগুলি আমাকে আন্তরিক স্পর্শ করে। পুজো-আচ্চায় বিশ্বাস করি না। আমার ধারণা ভগবান খুবই চালু ব্যক্তি, দ্রুততম ইলেকট্রনিক ডিভাইসের চেয়েও দ্রুত তিনি মনের কথা পড়ে নেন। পুজোপাঠের কোনো দরকার হয় না। প্রাণে ভক্তি থাকলেই হলো। সেটা গুরু কম্পিউটারে নোট করা হয়ে যায়, এড়ায় না কখনো।

একদিক থেকে দেখলে সত্যি এইসব পিণ্ডদান-টানের মানে নেই। কেননা যে মানুষ মরে যায়, সে মানুষ ভাত খায় না, জলপানও করে না। তবে কেন ভালো লাগা? যে মানুষটি বেঁচে আছে, যে মরে যায় নি, কিন্তু একদিন মরে যাবে, যার সব কর্মকাণ্ডের শেষেই স্থির দাঁড়িয়ে আছে সেই অনীম বৈধবশীল পাণ্ডনা-দার—মৃত্যু, এইসব তুচ্ছ অহুষ্ঠান তারই জন্তে। যে পিণ্ড দান করে, তারই তে:

তর্পণ, তারই তৃপ্তিসাধন। মৃত্যুবাক্তি নিমিত্ত মাত্র। যাকে পিণ্ড দেওয়া হয়, সে এসবের পরোয়াই করে না।

পিতাকে পিণ্ডদান করে অলোকই তার পিতৃদায় উদ্ধার করলো। তার পিতার এতে কোনোই দায় ছিলো না। অলোকই মনে মনে বাঁচিয়ে তুললো তার মৃত বাবাকে, যিনি কোনোদিনই সশরীরে এই অপরূপ অলকনন্দার রূপরাশি দেখতে আসবেন না। পিণ্ডদানের ব্যবস্থাটা মানুষকে কৃতজ্ঞতার শিক্ষা দেয়, নিজেকে ছাড়িয়ে অস্ত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবার শিক্ষা দেয়। বদলে কিছুই পাওয়া যাবে না জেনেও কিছু দেওয়ার শিক্ষা দেয়।

আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম পিণ্ডদান করবে না। তারা যুক্তিবিবর্গ একচক্ষু জীবন-যাপন করবে। আমার সমবয়স্ক বন্ধুরাই তো আর তর্পণ করে না। পিতৃদায়ে মন্তকমুণ্ডন কর না। অর্শোচ পালে না। একটা পুরো মানুষ জন্মের মতো চলে যায়, অথচ জীবন বাইরে থেকে এমনভাবে চলতে থাকে, যেন কিছুই ঘটেনি। সবই যেমন ছিল তেমনি আছে। যেন জন্মদাতা, কি জন্মদাত্রীকে আর দেখতে-না-পাওয়ার মত চিরজীবনের ঘটনাটা কোনো ঘটনাই নয়।

## ১৯

### জয় বাবা বদরী বিশালজীউকি !

বদ্রীনারায়ণের মন্দিরেও অনেকগুলো তোরণ পেরিয়ে ঢুকতে হয়। অনেক কষ্টে নানা লাকাল্যাফি করেও খুব ভালোভাবে মনের মতো করে হয়নি বদ্রীনারায়ণের দর্শন পাওয়া। বাইরে যেসব বদ্রীনারায়ণের পট দেখেছি, ভিতরের দৃশ্য তার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি নি। ফুলে, জরিতে, মালায়, চাদরে এতই জবরজঙ্ঘ ব্যাপার, কিছুই প্রায় দেখতে-বুঝতে পারি নি। এর ভেতরেও স্পেশাল দর্শন-টর্শন আছে, স্পেশাল আরতির টিকিট আছে, যে যত টাকার পুজো দেবে সে ততক্ষণ বেশি ভেতরে থাকতে পারবে এরকমও একটা ব্যবস্থা থাকতেও পারে বলে মনে হোলো। কেবলই পাণ্ডারা মন্দির থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন দর্শকদের, মোটে দাঁড়াতে দিচ্ছেন না। ভালো করে দেখবো কী? মন ভরে নি। শুনেছিলুম বংশাঙ্কুরে কেশদার-বদ্রীর পুরোহিতরা স্বদ্র কেরালার নান্দুদ্রিপাদ ব্রাহ্মণ। দেখে বুঝলাম সব পুরুত বামুনেরই এক স্বভাব।

যেমন কালীঘাটের, যেমন বিশ্বনাথের, তেমন জগন্নাথের। সবাই সমান।

ভিথিরিদের এই প্রবল প্রতাপ সত্যি দেখবার মত। সবাই থালাবাটি পেতে বসে আছেন, যাত্রীরা সেধে ভিক্ষে দিয়ে যাচ্ছেন। নির্বিকার ভিথিরি মহারাজেরা

শদয় হয়ে তা গ্রহণ করে, জয়ধ্বনি দিচ্ছেন বদরী বিশালজীউয়ের। হঠাৎ লক্ষ্য করি ভিথিরিদের মধ্যে চিন্তাচঞ্চল্য ঘটেছে! ব্যাপার কী? অলকনন্দার ওপরে মেতুর একধারে ভিথিরির লাইন। দূর থেকে দেখি এক পৃথলী মারবাড়বাসিনী আসছেন, তাঁর সামনে পিছনে দুই ভৃত্য দুইটি বুড়ি বয়ে আনছে। একটা বুড়িতে বিপুলকায় লাড্ডু, আরেক বুড়িতে বিশাল অমৃতী জিলেইবি। মহিলা কষ্ট করে কোমর নিচু করে ভিথিরিদের পায়ে ঠকাঠক লাড্ডু-জিলেইবি ছুঁতে ছুঁতে, পুণ্য লুকতে লুকতে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। অলোক, রঞ্জন, পিকোলো, কেউই এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে নেই। অতএব আমি চট্ করে ভিথিরিদের পাশে বসে পড়ি। সঙ্গে পাত্র নেই কিন্তু স্নান করে আসছি, তোয়ালে আছে। পথে সেটি বিছিয়ে বসে থাকি। আসবে, আমার টার্ন আসবে। ঠক করে লাড্ডু, ঠাস করে জিলেইবি, পড়বে! উৎসুক হয়ে চেয়ে থাকি।

‘মা! মা! কী হচ্ছেটা কী?’ লৌহনিগড়ের মতো মূর্ত্যায় আমার প্রার্থী হাত চেপে ধরেছে, ও কে? মেয়ে পুলিশ! আবার কে?—‘ওঠো বলছি, শিগগির ওঠো—পাগল করে ছাড়বে আমাকে—’

—‘তুই বসে পড়ে যা পিকো, গামছাটা পেতে নে—’

—‘অনেকলি, মা! তুমি একটা আস্ত উম্মাদ! যদি কেউ চিনে কেলে? ওঠো, ওঠো, উঠে পড়ো—’

—‘আহা, চেয়ে দাখাই না কী সাইজ—’

—‘কত লাড্ডু খাবে, মা? আমি তোমাকে কিনে দিচ্ছি চলো—’

—‘কিনে কোথায় পাবি ও জিনিস? দেখছিস না অর্ডারি মাল? আমলি ঘিউ-কা? কী স্বগন্ধ!’

—‘মা, প্লাজ কথা শোন, আমার খুব লজ্জা করছে—এই, এই ভিথিরিদের সঙ্গে—ছি ছি—’

—‘আমরা তো সবাই ভিথিরি রে, ভগবানের কাছে তীর্থস্থানে কেভিথিরি নয়? ঐ যে মোটা মহিলা লাড্ডু দান করছেন, উনিও পুণ্যের ভিথিরি—’

—‘লম্বা লম্বা কথা রাখো, লোভী কোথাকার। তুমি একজন গরিব ভিথিরির শেয়ারটা খেয়ে নিতে চাইছো—বুঝেছো সেটা?’ পিকোর এই কথাটা আমার মাথায় ঠক করে বুদ্ধির হাঁড়িতে একটা ঘা দিলে!

—‘তুমি তো কিনেই খেতে পারো মা? তুমি কেন আরেকটা ভিথিরির খাবার কেড়ে খাবে?’ এ কথাটা খুবই সত্যি। আমি তো মজা করবার জগ্গে খেতে বসেছিলুম, অন্ত্রের ভাগ কেড়ে খাচ্ছি সেটা খেয়াল হয়নি। কত জ্ঞানী

গুণী লক্ষী মেয়ে আমার, সেটা ভাগ্যিস খেয়াল করিয়ে দিলে ! নইলে তো !—  
ইন্ট-টাট্ট ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি অল্প প্রান্তে আমার দেখাদেখি রঞ্জনও  
বসে গেছে। পিকো চোখ রাজাতেই উঠে পড়ল।

—‘উঃ, পারি না বাবা এদের নিয়ে ! যেমন দিদি, তেমনি ভাই !’ বলে গজ  
গজ করতে করতে পিকো শরু করে আমার কজ্জী পাকড়ে নিয়ে চলল।

সেতু পেরিয়েই দেখি কলাগী দালাল। ছুটে এল কাছে—হ্যাঁ, হয়ে গেছে  
তার মাতৃতর্পণ। তার বাবা ভুগ্ন। তৃপ্যন্তু সর্বদেবতাঃ।

২০

### নন্দাকিনী, মন্দাকিনী

বেল্ল দেউটার ‘গেট’ ধরে বণ্ডনা হলুম। বদ্রীনাথ থেকে আবার সেই আশ্চর্য  
সুন্দর বরনা, গুহা, হিমবাহ, আর অন্তঃসলিলা অলকনন্দার খেলা দেখতে দেখতে  
নেমে এলুম। সঙ্গে অলোকনাথ যোগ হয়েছে, সেও কেদারে যাবে আমাদের সঙ্গে।  
এটা উন্টোযাত্রা হয়ে গেছে। সবাই আগে কেদারে যান, পরে বদ্রীনাথে। অলোক  
আগেই বদ্রী চলে এসেছে আমাদের মত। এখন আর সঙ্গী পাচ্ছে না। বদ্রী  
থেকে সবাই হরিদ্বারের যাত্রী। আমরা আজ সন্কার মধ্যে রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছোতে  
চাই যাতে কালই গৌরীকুণ্ডে যাওয়া যায়। পারলে কালই কেদারনাথ পর্যন্তও  
পৌঁছে যাওয়ার ইচ্ছে। রঞ্জনের হয়তো সাধ্য হবে না। এদিকে পঞ্চপ্রয়াগের  
পথেই যাবো। কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, বিষ্ণুপ্রয়াগ দেখেও থামবো না ?

মনে মনে গজগজ করতে করতে যাই। রঞ্জন আপিস কামাই করে এসেছে,  
কোনো ছুটি নাকি পাওনা নেই ওর ( তবে এলি কেন ? ), আবার পিকোলোর তো  
কলেজ। খুলেই পার্ট ওয়ান পরীক্ষা ( তুই-ই বা এলি কেন ? )। অতএব যখন  
যেখানে খুশি থামতে থামতে যাওয়া যাবে না। এই ২০/২১ তারিখেই আমাদের  
কলকাতায় ফেরবার কথা ছিল। মা ওদিকে ভাবতে শুরু করে দেবেন। আজ  
২২শে, আমরা এসে অবধি মা’র কোনো চিঠি পাইনি, টেলিফোনও করা যায়নি।  
আজ রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছে ফোনের চেষ্টাও করতে হবে। কে কেমন আছে কে জানে ?  
পিকোলো আর আমি দুজনেই বাইরে বলে মা’র জগ্গে ভাবনা। অতএব—‘পশ্চাতে  
রেখেছো যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে !’

রঞ্জন আর অলোক সামনে। পিকো যথারীতি ঘুমিয়ে পড়েছে আমার  
কোলে। আমি জানলা দিয়ে চেয়ে আছি। তিনধাম হয়ে গেল। বদ্রীনাথ ছেড়ে  
নেমে যাচ্ছি। আবার যোশীমঠে চা। তারপর বিকেলের স্নান মায়াবী আলোয়



অদ্ভুত একটা উজ্জ্বল রঙিন আকাশের পটভূমিতে একের পর এক প্রয়াগ আবিভূত হতে থাকে। চোখে, চোখ থেকে হৃদয়ে। নন্দপ্রয়াগটা এমন কিছু নয়। সরকারী গাইডের মতে সঙ্গমটি হচ্ছে নন্দাকিনী আর অলকনন্দার। তাই নাম নন্দপ্রয়াগ। এদিকে আমার একটা বহু পুরোনো ‘গাইড বহি’ আছে। সেখানে “খাওয়ার খরচ জনপিছু প্রতিদিন ১৫০ টাকা হইতে ২০০ পড়িয়া যায়। কুলীদের মজুরী ছাড়া প্রতিদিন দুই পয়সা করিয়া ছোলা খাওয়ার জন্য দিতে হয় এবং সমস্ত তীর্থে কুলীদের খিচুড়ী খাইতে দিতে হয়। পাহাড়ী ঘোড়ার ভাড়া ১০ হিসাবে প্রতি মাইল... যাত্রীকে নিজেই ডাঙী কিনিয়া লইতে হয়...” ইত্যাদি লেখা আছে। সেই অপূর্ণ গাইড বইতে বলছে নন্দপ্রয়াগের সঙ্গমটি নন্দাকিনী আর অলকনন্দারই এবং নন্দ নামে এক রাজা এই প্রয়াগে যজ্ঞ করেছিলেন, সেই থেকে ওটার নাম নন্দপ্রয়াগ। আমার এটাই বেশি পছন্দ, যেহেতু নন্দাকিনী নামে কোনো নদীর উল্লেখ আগে দেখিনি। নন্দপ্রয়াগ থেকে কর্ণপ্রয়াগ যাবার রাস্তাটা খুব সুন্দর, বড় সুন্দর, কি রকম একলা করে দিতে পারে।

ঐ গোধূলিবেলার মন-খারাপ-করা আলো পাহাড়ের গায়ে লেগে রইলো বহুক্ষণ, গলে গলে নদীর ওপরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। এখানে নদী বেশ চওড়া, মাঝে মাঝেই চড়া পড়েছে, হুড়ি পাথরের ঘাস ঝোপের চর জেগেছে। নদীর ওপারে পাহাড়, এপারে পাহাড়। ওপারে মানুষজনের চিহ্ন নেই, কোনো পথরেখা দেখা যায় না, মন্দির না, গ্রাম না, ক্ষেত না। এপারে রাজপথ, গ্রাম, দোকানপাট। ওপারে কি তবে সন্ন্যাসীদের রাজ্যপাট? ওপারে কি বাঘ-ভাল্লুক? জিম করবেট? এই তো জিম করবেটের পাড়া। রুদ্রপ্রয়াগে বিরাট বিজ্ঞপ্তি আছে করবেট গ্যাসনাল পার্কের। এপার দিয়ে ছুটে যাচ্ছে স্বরথ সিংয়ের গাড়ি।

২১

### মুকুলগুলি বারে

গাড়িতে যেন আমি ছাড়া কেউ নেই, স্বরথ সিংও না।

এত ভালো লাগার মতো জায়গা, অথচ কেন যেন সম্পূর্ণভাবে আমার করে নিতে পারছি না। কী যেন নেই। কী থাকা উচিত ছিল? কে থাকলে ভালো হতো?

কেমব্রিজের ছাত্রজীবনে আমার পশ্চিম পাকিস্তানী বান্ধবী শিরিন কাদেরকে কিছু অফার করার উপায় ছিল না। হরিণ-নয়না সুন্দরী শিরিন সব কথার উত্তরে সবিনয়ে মাথা নেড়ে বলবে—“মেরে পাস সব কুছ হ্যায়”। আমার শুনে মনে হত,

কী অসভ্য রে বাবা ? কী দস্ত ? পরে টের পেলুম লক্ষ্যে, লাহোরের ভদ্রতার ধরনই ওইটে, কিছু চাই না, আমার কাছে আছে। সব আছে। যাহা কিছু সব, আছে আছে আছে।

এই রাস্তা যেন তেমনি ভাষায় কথা বলছে। বলছে, ওর কাছে সবকিছু আছে। ওর কিছু চাই না। এমন কি দর্শকও না। কিন্তু আমার কেন তাতে অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে না ? অস্পষ্ট অভাববোধে মন-কেমন করছে কেন আমার ? নিজেকে অপূর্ণ মনে হচ্ছে। কিন্তু কার জন্যে অপূর্ণতা ?

কে সঙ্গে থাকলে এই আকাশ বাতাস নদী পাহাড় ঝাম্‌ঝাম্‌ করে বেজে উঠতো পূর্ণতায় ? তাছাড়া সত্যিই তো আমি নিঃসঙ্গ নই। আমরা এখনও পাঁচজন গাড়িতে। সঙ্গে আছে আমার প্রথম সন্তান যাকে জন্ম দেওয়ার কর্মটি আজ পর্যন্ত আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের ঘটনা। সঙ্গে আছে অনুজোপম রঞ্জন, সেও অপত্য স্নেহেরই পাত্র। প্রীতির অভাব নেই। সঙ্গে বন্ধনের অভাব তো নেই-ই বরং একটু যেন বেশিই। তবে কেন এত অস্থির এত চঞ্চল লাগছে আমার ? এই অরণ্য-পর্বত, এই নদী-প্রপাত, এই মেঘ-আকাশ, এদের মধ্যে এমন চিৎকার করে উঠছে কেন আমার একাকিত্ব ? একে একে বৃকের মধ্যে মিছিল করে গেল খুব ঘনিষ্ঠ চেনা মুখের সারি—না, কেউ না, কেউ না, কেউ না। কাউকে চাই না।

উত্তরকাশীতে মার্কিন মেয়ে অস্টেন বলেছিল, I want to be first in someone's life. আমিও বোধ হয় তাই চাইছি। কারুর জীবনের প্রথম নামটি হয়ে উঠতে চাই। কিন্তু আমার জীবনের প্রথম নামটি কার ? একদিন উত্তর খুব সহজ ছিল,—মা। তারপর উত্তর বদলে গেল কিন্তু সহজেই রইল, স্বামী।

তারপর আরেকবার বদল হলো, কিন্তু এবারও কোনো বয়সের প্রশ্ন ছিল না, কঠিন কোনো সমস্যা হলো না, জীবনের প্রথমতম শব্দটি সন্তান।

কিন্তু এখন, যার যার জীবন তার তার নিজস্ব অঙ্গনে। জমানা বদল গয়া। আমার সন্দেহ হচ্ছে এখন আমার জীবনে প্রথম মানুষটির নাম হয়তো 'আমি'। তাই একাকিত্ব। তাই অপূর্ণতা। কাকে দেব এই সন্ধ্যার আকাশে বিলোল অলক-নন্দা ? কার হাতে দেব ?

যার জীবনে মানুষ নয়, ঈশ্বরই প্রথম তার কোনো অপূর্ণতা নেই। সেই স্থখী। কারুর জীবন প্রথমতম হয়ে ওঠার তৃষ্ণা তাকে কুরে কুরে খায় না।

যত ঝামেলা এই পালকবিহীন ছুঁপেয়ে প্রাণীটির বেলায়। কে নেবে আমার এই মুগ্ধতার ভাগ ? কাকে দেব এই নন্দপ্রয়াগের স্তব্ধ সৌন্দর্য ? তোমার একার সম্পত্তি বলে মেনে নিতেই বা অস্ববিধা কিসে ? তাঁর অনেক আছে, তিনি তো

তোমাকে এটুকু দিতেই পারেন। সবকিছু ভাগাভাগি করে নিতে হবে কেন মাহুবেরই সঙ্গে? নবনীতা, বৃকের পাত্রটি বাড়াও, বড়াও। বৃকের ভেতর এই অলৌকিক আকাশ-বাতাস, অরণ্য-পর্বত, নদী-নিঝর, সব ভরে নাও, সব সঙ্গে নিয়ে নাও। ভাগ দেবার সময় অনেক পড়ে আছে।

২২

### চিরসখা হে

নন্দপ্রয়াগের কাছে সোমলা ডাকবাংলো আছে—কিন্তু থামা গেল না। কর্ণপ্রয়াগে পিণ্ডারনদ আর অলকনন্দার মিলনক্ষেত্র। পিণ্ডার হিমবাহের যত নাম, নদীটি তত কিছু নয়। এই প্রয়াগে কর্ণ যজ্ঞ করেছিলেন। কর্ণপ্রয়াগ থেকে পথ নেমে চলল রূদ্রপ্রয়াগের দিকে। কর্ণপ্রয়াগের সঙ্গম ছাড়িয়েই অলকনন্দার ওপারে দেখতে পেলুম বিশাল চতুষ্কোণ এক গুহামুখ—তার সামনেই দু'থাক সিঁড়ি নেমে গেছে নদীর জলে। অথচ কোথাও কোনো রাস্তা চোখে পড়ল না। কোনো গরু ভেড়াও চরছে না। আশ্চর্য হয়ে গুহাটির কথা ভাবছি—নিশ্চয় ওখানে বহু যুগ আগে মাহুবের বাস ছিল, সন্ন্যাসীর আস্তানা ছিল, নইলে ঐ সিঁড়ি দু'থাক কে তৈরী করলে? কেনই বা? ওই রকম একটি গুহায় অমন অলকনন্দার তীরে ঘাঁরা বাস করতেন তাঁদের তপস্শ্রাব সিদ্ধি কেন হবে না? কিন্তু এখন ও গুহা মাহুবের কাজে লাগে না, কোনো পথ থাকতো তাহলে। ভাবতে ভাবতেই আরেকটি মস্তবড় গুহা দেখা গেল ওপারে। তার সামনে আবার একটি বিশাল মহারুহের তলাটা বেদী করে বাধানো। এখানে সিঁড়ি নেই কিন্তু নদীর খুব কাছে গুহা থেকেই উপলবিস্তীর্ণ এক সৈকত গড়িয়ে নেমে এসেছে অলকনন্দার স্রোতের মধ্যে। যেন 'গ্রাইভেট বীচ' একটি। এখানেও কোনো রাস্তা নেই। একটু দূরে একটা পায়ে চলার পথের রেখা উঁকি দিল, কিন্তু ধরা দিল না।

এই গুহা দুটি আমার মনের মধ্যে একটা গভীর নাড়া দিয়ে গেল। মুনিষ্যবিরদের নির্ভাবান সহজ জীবনের স্মৃতি বহন করে পড়ে আছে গুহা দুটো। দেখতে দেখতে আমার বৃকের মধ্যে কান্না ঠেলে উঠলো। মনে হল গুপ্তলো আমাকে ডাকছে। আমি কী চাই? সত্যি সত্যি? কেন বাঁচি? কেন আমি চাকরিটা ছেড়ে দিচ্ছি না? কিসের জ্ঞান লিখি? কেন সংসারে থাকি? কেন আমার কোনো কাজই শেষ হয় না? মনের মতো হয় না কোনো ক্লাসটাই, মন ভরে না কোনো লেখা লিখেই—কেন আমি কিছুই ধরে রাখতে পারি না—হাতে পেয়েও মুঠো বন্ধ করি না, ছেড়ে দিই, আঙুলের ফাঁক দিয়ে বারে যেতে দিই, ধরে রাখতে

পারি না কিছুই—না বন্ধুত্ব, না প্রণয়, না সম্মান, না সংসার, না শিল্প, না কর্ম, না প্রতিষ্ঠা, না ধর্ম, না বোধ, না বোধি—কী চাই তাই-ই বুঝি না। সবই আছে, অথচ কিছুই আমার নয়, কোনো কিছুতেই আমি ‘আমার’ বলে অধিকার করতে শিখি নি—বুকের মধ্যে সর্বক্ষণ ঘণ্টা বাজছে নেই নেই নেই—কী নেই? কী পেলে এই সর্বগ্রাসী ‘নেই’ ‘আছে’ হবে? কী এনে দিলে মিটেবে তোমার বায়না? ওই শূণ্য বিশাল দুটি গুহার মধ্যে যেন আছে সব উত্তর। ওখানে একবার পৌঁছুতে পারলেই হলো।

নইলে কিসের চার-ধাম ভ্রমণ? হলো না, হলো না। কিছুই দেখা হলো না। এমন সময়ে আকাশ আরো লাল করে সূর্যদেব ডুবে গেলেন হিমালয় পর্বতের আড়ালে। এক বছরের জন্তে কি সন্মাস নেওয়া যায় না? দেখে যেতেই হবে এই বিশ্বসংসারটা কেমন। এসে অবধি তো শুধু ঘরসংসারটাই দেখা হলো।

সূর্য ডুবে গিয়ে সমস্ত পৃথিবীটাকেই এক আবিল বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আবার আমার মনে সেই একাধিকত্বের গুঞ্জন উঠছে—তীর্থ গমন দুঃখ ভ্রমণ যেও না মন কারো দ্বারে। বলি, ব্যাপারটা কী? নবনীতা? কী চাও?

নির্ভর চাই। আমি চাই আমায় কেউ আশ্রয় দিক। আজ কোথায় থাকবো, কী খাবো সেটা অল্প কেউ স্থির করে দিক। আমি একটু আড়াল চাই। একজন কেউ আমার কথা ভাবুক। কে আছে? এমনজন কে আছে? কেউ না। কেউ নেই। কেউ ভাবে না।

কেউ ভাবে না? কেউ নেই? এতবড় বেইমান? ছি ছি, নবনীতা!

কে তোমার জীবনের বোঝাটা বইছে? তুমি নিজে? তুমি কি এতই শক্তিমান? তোমার কি এমনভাবে রাজ্যের হালে চারধাম পরিব্রাজন করার কথা? অর্থবল, লোকবল, স্বাস্থ্য—কোনটা আছে তোমার? তবুও তো ঘটছে? কোনো চোরা-পথে নয়, চেয়ে-চিন্তে নয়। তবু বলবে তোমার ভার কেউ নেয় না? তুমি নিরাশ্রয়? নির্বান্দব? নিঃসঙ্গ? তুমি আসলে একটি বেইমান। যার হাত না বাড়তেই বন্ধু, সেই বলছে, আমার কেউ নেই। আমি জগতে একা। তুমি একটি মিথ্যাবাদী।

নিজেই মনে মনে খুব লজ্জা পেয়ে গেলুম। আকাশ অন্ধকার, একটি দুটি তারা ফুটছে। গাড়ি ছুটেছে রুদ্রপ্রয়াগের পথে! চিরসখা হে—মার্জনা করো।

### দু'দলে দেখা হলো মধুমামিনী রে !

‘আমাদের রাত্রি হয়ে গেল রুদ্রপ্রয়াগ পৌছোতে। আবার সেই টুরিস্ট লঞ্জে গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের আতিথ্য নিলুম। এবারে অত্র একটি ডরমিটরিতে ঠাই মিলেছে। সেবারেরটা তুলনায় বেশি দামী ও আরামপ্রদ ছিল। এটা আরো সস্তা, আর কম আয়েসের।

এই ঘরে চারটিই খাট খালি, তাতে ঠিকঠাক আমরা চারজনে এঁটে গেলাম। আমাদের ঘরসঙ্গী কারা? সেই জীপের সঙ্গীরা।—বাঃ! এতদিন যে বসেছিলাম পথ চেয়ে আর কাল গুণে—মেসোমশাইদের দলটি এসে গেছেন কেদারনাথ দর্শন করে। কাল আমরা যাবো কেদারে, গুঁরা রওনা হবেন বজ্রীনাথে।’

আমাদের মধ্যে আর বন্ধুত্ব হয় নি জীপের সেই ব্যাপারের পরে। একই ঘরে থাকায় একটু মানসিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছিল। সবাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লেন, কেদার ঘুরে এসে ক্লান্ত। কেবল অনেক রাত্রি পর্বন্ত সেই অক্লান্ত ব্রহ্মচারী (লীডার) আর গম্ভীর কলেজ ছাত্রী (সেক্রেটারি) টাকাকড়ির হিসেব কষতে লাগলেন। আমি একটু একটু চিঠি লিখলুম মাকে। আর পিকো আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো কলকাতাতে ফোন করতে। দিম্মার জন্তে তার ভয়ানক উৎকর্ষা হচ্ছে। কিন্তু লজ থেকে তো পাওয়া গেলই না, কাছাকাছি রুদ্রপ্রয়াগ টেলিফোন এক্সচেঞ্জে গিয়েও রাত ১১টা পর্বন্ত চেষ্টা করেও পারলে না। অলোক, রঞ্জন, সুরথ সিং সমেত ফিরে এলো মনথারাপ করে।

শুয়ে পড়েছি। ব্রহ্মচারীদের হিসেব তখনও শেষ হয় নি। দেখি আমাদের মেসোমশাই, আরো দুজনে মিলে কী সব পরামর্শ করছেন বিছানা থেকে উঠে। অনেক কিসকিস হোলো। তার পর টর্চ হাতে মেসোমশাই আমার খাটিয়ার ধারে (ওপরের ডরমিটরিতে পার্লিশের খাট ছিল। এখানে খাটিয়া) গুটিগুটি এসে ডাকলেন—‘মালশ্বী কি ঘুমিয়ে পড়েছে?’

—‘না মেসোমশাই।’

—‘একটা কথা ছিল। একটু গোপনে।’

—‘বলুন, বলুন।’ উঠে বসি। তবুও মেসোমশাই ইতস্তত করছেন।

—‘মাকে আমি যা বলবো তোমার তাতে আপত্তি থাকলে কিন্তু করতে হবে না।’

—‘বলুন তো আগে?’

খুব গলা নামিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে মেসোমশাই বললেন,—হাতের প্যাকেটটি দেখিয়ে—‘এই যে, কিছু গাঁজা, কিছু ভাং। আমি ভুলে গৌরীকুণ্ডে ফেলে গিয়েছিলুম। তুমি মালম্মী একটু সঙ্গে নিয়ে যাবে? কেদারনাথকে দোবো বলে আমার মানত করা ছিলো। তোমরা যখন পূজো দেবে তার সঙ্গে এগুলোও যদি ধরে দাও—পৈতে, হন্তুকি ধূপ ধুনো এই সব আর কি। আর বেলপাতা। আকন্দ ফুলের মালা, ধূতুরো ফুলের মালাও ছিলো। কিন্তু প্লাস্টিকের মধ্যে ভেজা নেকড়া মূড়ে আনার জন্তে সে সবই পচে গেছে। তুমি যদি মা আমার মানতটি বাবার কাছে পৌঁছে দাও। এমন যমতাড়া লাগালে যে গৌরীকুণ্ডেই সব পূজোর জিনিস পড়ে রইল, আমি ধড়কড় করে শূণ্যহাতে বাবার কাছে চলে গেলুম।’ মনটি বড় খারাপ, মা।’

‘—কোনো ভাবনা করবেন না মেসোমশাই, দিয়ে দিন আমাকে প্যাকেট, কেদারনাথের পায়ে নিজের হাতে পৌঁছে দেবো আপনার মানত। আমি যদি পৌঁছই, আপনার গাঁজা ভাংও পৌঁছোবে, কিছু উদ্বেগ করবেন না।’ মেসোমশাই কোকলা মুখে মিলিয়ন ডলার একটি হাসি উপহার দিয়ে প্যাকেটটি আমাকে দিলেন। কেদারনাথের জন্ত পূজোর ব্যবস্থা এখন থেকেই শুরু হয়ে গেল। আমার নিজের তো পূজো দেবার কোনো প্র্যানই ছিল না। মিসেস মুখার্জীর পূজোই দিয়ে বেড়াছি প্রধানত। না হয় মেসোমশায়ের মানতটাও দেব! এ যাত্রাটা তো অগ্রে র পূজে পৌঁছে দেবারই যাত্রা দেখছি।

২৪

### গুল কা খেল

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে সকালে চা খেয়ে বেরিয়ে প্রথমে চললুম প্রয়াগটা দেখতে। প্রয়াগ দেখতে হলে একটা গলি দিয়ে যেতে হয়। তার মুখেই হেলথ ডিপার্টমেন্ট-এর আপিস। চৌকিদার এসে স্বরথ সিংকে ধরলে—‘স্বই লগায়া? পড়ছি দিখাও!’

আগেও ছ’এক জায়গায় এরকম বলেছিল। স্বরথ সিং গম্ভীর গলায় প্রত্যেকবার “লোকাল আদমী” বলে পার পেয়ে গেছে। এবারও বললে। কিন্তু ভবী ভোলে না। চৌকিদার ওকে লোকাল বলে মানলেও আমাদের লোকাল বলে মানছে না। শেষে পিকোলো গেল আপিসে। অফিসারকে গুলতাবিজ মারতে। রঞ্জন একদম চুপচাপ। অলোকের পড়ছি আছে।

পিকোলো গিয়ে ঝড়ের বেগে ভুল হিন্দিতে একটা কথার মধ্যে পঞ্চাশবার

খিলখিল করে হেসে কী যে গুল সব মারতে লাগলো, আপিসের কেরানী, দিদিমণি দুজন কেবলই হেসে গড়াতে লাগলো সিরিজ হাতে করে। পিকোর তো সিরিজ দেখেই হাত টনটন করতে শুরু করেছে এবং জিহ্বায় দুই সরস্বতী ভর করে মিথ্যে কথার যোগান দিচ্ছেন। ‘কে বলেছে আমরা কেদারে যাব? দূর দূর, আমরা তো লোকাল লোক, হুবীকেশে থাকি। ইয়া ওখানেই পড়ি। দেখুন না গাড়ির নম্বর, হুবীকেশের গাড়ি। আমরা বেড়াতে বেড়াতে এদিকে এসেছি, বিকেল-বেলাই ফিরে যাব দেবপ্রয়াগে। এখন তো আমরা কাশীতে শঙ্কর ভগবানের মন্দিরে যাচ্ছি। কেদারে আমরা অনেক গেছি। না না, আমরা মোটেই তীর্থযাত্রী নই। টুরিস্টও নই। এই দু’তিন দিনের জন্ত ঘুরতে এসেছি। প্রায়ই আসি তো।’ এই সব কথা বলে পিকো যখন তাদের বাগ মানিয়ে ফেলেছে, রঞ্জনের মনে হলো—‘মেয়েটা একা একা কতক্ষণ লড়বে? যাই একটু সাহায্য করে আসি।’ মনে হতেই সে আপিসে ঢুকলো এবং পিকোর চেয়ে তিনগুণ খারাপ হিন্দিতে ককণ কণ্ঠে আবেদন জানাতে লাগলো—‘কেন মিছিমিছি বামেলা করছেন দিদিরা? এই যে আমরা তিনধাম ঘুরে এলাম, আমাদের কলেরা হোলো না, কেবল কেদার গেলেই হবে? আশ্চর্য কথা সত্যি! আমাদের মাত্র তিনদিন হাতে আছে আর, তার মধ্যে ফিরতেই হবে—এখন ইঞ্জেকশন নিয়ে যদি জ্বর হয়ে যায় তাহলে কেদার যাত্রা হবে না। এতদূর এসে ফিরে যাব? ভেবে দেখুন। সেই কলকাতা থেকে আসছি! প্রমিস করছি, আমরা কেদারে কিছু খাব না—চা বিস্কুট ছাড়া কি—সুখাব না, প্রমিস। কেমন? প্রাইজ ইঞ্জেকশন দেবেন না!’

অলোক শান্ত ছেলে। সে পিকোর কথা শুনেছে, আবার রঞ্জনেরটাও শুনলো। কেলেংকারিটা মানেজ করতে বললো—‘আসলে গুঁরা সঙ্কলেই কলেরার ইঞ্জেকশন নিয়ে এসেছেন কলকাতা থেকে। বাড়ির ডাক্তারের কাছে। নিজেদের প্রোটেকশনের জন্ত। মার্টিফিকেট নিতে হয় তা জানত না বলে পড়ছি নেই। এই আমিই শুধু হরিদ্বারে এসে ইঞ্জেকশন নিয়েছি। আমার তাই পড়ছি আছে।’ রঞ্জনের কথাবার্তার ফলে পিকোর গুলশন গুল ধরতে পেরে হেলথ ডিপার্টমেন্টের লোকেরা অত্যাশ্চর্য। ওরা এতদিন ভাবতো, জগতের শ্রেষ্ঠ গুল বুঝি কেন্দ্রীয় সরকারই দিয়ে থাকেন। যাই হোক তাঁরা শেষ অবধি আমাদের ছেড়েই দিলেন। পিকোলো তাদের সেধেই জানালো, জলে জিওলিন দিয়ে জল খাবে, কাটা ফলটল কিছু খাবে না। কলেরা কিছুতেই হতে দেবে না।

### সেন্ট অগাস্ট, এবং বাবার বিয়ে

ইঞ্জেকশনের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে রুদ্রপ্রয়াগের সঙ্গম দেখতে গেলুম। ছোট্ট শাদা একটি মন্দির, ঠিক নদীতীরে অবস্থিত। তারই দোতলার ঝুলবারান্দা থেকে মন্দাকিনী আর অলকনন্দার সঙ্গমটা দারুণ দেখায়। দুই রঙের জল, নীল আর গেরুয়া, অনেকক্ষণ পাশাপাশি বয়ে যায়—একটি উদ্দাম, অগ্ৰাটি শান্ত। নীলটি শান্ত, মন্দাকিনী, গেরুয়া উদ্দাম অলকনন্দা। বদীনাথের সঙ্গিনী অলকনন্দা।

কেদারনাথের মন্দাকিনী। যে-পথে কেদারে উঠবো, মন্দাকিনীর যাত্রাপথ বেঙ্গে সেই রাস্তা তৈরি।

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে তিলবাড়া হয়ে অগস্ত্যমুনি বলে একটি জায়গা। অগস্ত্য-মুনির মন্দির আছে সেখানে। সরকারী গাইডে লেখা—Temple of Saint August! এমন পোড়া দেশের মরণই ভালো। সেইন্ট অগাস্টের দেশ অগস্ত্য-মুনির পরে গুপ্তকাশী। সেখানে অনেকক্ষণ বাস থামে। গেট পাবার ব্যাপার আছে বোধ হয়। গুপ্তকাশীর পরে শোনপ্রয়াগ। শোনগঙ্গা আর মন্দাকিনীর সঙ্গম সেখানে। সব বাসও শেষ। বাকিটুকু হেঁটে গৌরীকুণ্ডে যেতে হয়। গাড়ি অবিশ্বি আরো খানিকটা গেল। গৌরীকুণ্ডে যেতে হয় একটা বাজার পার হয়ে খানিকটা পাহাড়ের ওপরে উঠে। বেজায় নোংরা এক গলি দিয়ে যাত্রা। শোন-প্রয়াগ থেকেই ত্রিযুগী নারায়ণে যেতে হয়। ৬ কিলোমিটার পথ। পায়ে হেঁটে। কপাল ভালো থাকলে খচ্চর মেলে। “ত্রিযুগী নারায়ণে” যজ্ঞায়ির শিখা অলিম্পিকের শিখার মতো অনন্তকাল জলমান। ওটি প্রজ্বলিত হয়েছিল শিব-পার্বতীর বিবাহ-যজ্ঞে। সেই থেকে সমানে জ্বলছে। তিন যুগ কেটে এখন ঘোর কলি যুগ। পবিত্র হোমানল তিন যুগ ধরেই জ্বলছে, তাই ত্রিযুগী নারায়ণ নাম। পুণ্যার্থীরা হেঁটে দেখে আসেন বাবার বিয়ের যজ্ঞায়ি।

### সুনীল লজ

শোনপ্রয়াগের পর গৌরীকুণ্ড। এই উষ্ণনিষ্কার একটি বিরাট কুণ্ডের চেহারা অবস্থিত। তারই চারপাশে ধর্মশালা, হোটেল প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। আমরা এখন গৌরীকুণ্ডের দিকে না গিয়ে সোজা উঠে যাই টুরিস্ট লজের দিকে। একে-



বারে তার ডাইনিং হলে গিয়ে থামি। হ্যাঁ, কিছু খাবার জিনিস তারা বানিয়ে দিতে পারবে নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, এফুনিই পারবে, কিন্তু ঘর নেই। ঘর খালি নেই। পাশেই ‘সুনীল লজ’ আছে, ওখানে দেখুন। ততক্ষণে খাবার তৈরি হচ্ছে। ভাত রুটি ডাল আলুর তরকারি, পাপর ভাজা, আচার, দই এবং ডিমভাজা। খুব ক্লান্ত হলেও গৌরীকুণ্ডে গিয়ে স্নান করে আসার মতো এনার্জি পাচ্ছি না কেউ। এদিকে অল্প অল্প বৃষ্টি হতে শুরু করেছে। ‘সুনীল লজ’ ব্যাপারটি বেশ ইন্টারেস্টিং। পাহাড়ের গায়েই মার্কিন মেটেলের স্টাইলে পর পর ৬টি ঘর, দুটি করে খাটওয়া, ১২ জনের জন্য তৈরি। একপাশে অফিস ঘর, অপরপাশে কমন স্নানঘর ও ল্যাভটরিশগুলি। সামনে এককালি খুব সরু টানা বারান্দা আছে, রেলিং দেওয়া। সেটাকে রাস্তাও বলা যায়, প্যাসেজ বলতে আলাদা কিছু নেই। এই টানা বারান্দাই একমাত্র যোগসূত্র। ঘরের সঙ্গে ঘরের, অফিসের, বাথরুমের। একেবারে যেন পাহাড় কেটে বসানো ঘরগুলি। সামনেই খাদ। নীচে রাস্তা। ওদিকে জঙ্গলে ভরা হিমালয়ের গা বেয়ে ঝরে পড়ছে মন্দাকিনীর উত্তাল স্রোত। তার ঝরঝর শব্দে সর্বক্ষণ মনপ্রাণ ভরে থাকছে।

দূরে দেখা যাচ্ছে গৌরীকুণ্ড এবং কালীকমলিবালার ধরমশালা। ‘সুনীল লজ’-এর মতো করেই প্রায় ‘টুরিস্ট লজ’টি তৈরি—ঠিক ‘সুনীল লজ’-এর এক ধাপ ওপরে। ওদের কয়েকটা ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচড বাথরুম আছে। এবং ‘সুনীল লজ’-এর ডাইনিং রুম নেই। ‘আমরা সুনীল লজ’-এ দুটি ঘর চাইলুম, মাথা নেড়ে তরুণ প্রোপাইটার বললেন—‘একটিমাত্র ঘর আছে, চল্লিশ টাকা ভাড়া। ওর মধ্যেই যতজন খুশি থাকতে পারেন। একটুটা খরচ নেই।’ ঘর খুলে দেখি দুটি সিঙ্গেল খাট। জোড়া দিয়েও চারজন কেন, তিনজনেও শোয়া যাবে না। তবে মেঝেতে স্লিপিং ব্যাগ পাতা যাবে। অলোকের সঙ্গেও আছে, রঞ্জনের সঙ্গেও। ওরা দুজনেই মাটিতে শুতে রাজি। কিন্তু বিছে-টিছে নেই তো? বিছের হিন্দি জানি না। অনেক কষ্টে বোঝাতে চেষ্টা করি। গম্ভীর মুখে সব শুনে ছোকরা বলে—‘ছিপ্লি? হ্যাঁ।’ তারপর সোজা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় জানলার কোণে একটি ক্ষুদ্রকায় টিকটিকি।

—‘না না, ছিপ্লি নয়, বিছে, বিছে—’

—‘নেই হ্যাঁ।’ বলে ছোকরা চলে যায়।

‘এাই, এাই, চা দিয়ে যাও—’ বলে রঞ্জন, অলোক চেষ্টায়।

থেয়ে উঠতেই আড়াইটে বেজে গেল। নেমে আসছি, দেখি টুরিস্ট লজ-এর একটি কামরায় দু’জন যাত্রী ফিরলেন। ছোট মেয়েটি ঘোড়া থেকে নামলো, তার

মা ডাঙী থেকে। পুরুষমানুষ সঙ্গে নেই।

—‘আপনারা কেদারে গিয়েছিলেন? আজই?’

—‘না না, গতকাল। আজ সকালে ফেরৎ রওনা হয়ে, এই পৌছোলাম। কী রুষ্টিই নেমে গেছে! রাস্তা খুব পিছল হয়ে যায়। বহু ডর লাগত। বাবুজী তো পায়দল আ রহা, অবতক পৌছা নেহি।’

—‘ভয় নেই, এসে যাবেন এক্ষুনি। কত খরচ লাগল ঘোড়ায়?’

—‘যাতায়াত ১১০২ নিচ্ছে। আর ডাঙী সাড়ে চারশো।’

পাহাড়ী রুষ্টি, ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। এখান থেকে স্থানীয় লজ্জে নিজেদের ঘর অবধি পৌছাতে পৌছাতেই এক ঝাপটায় ভিজে গেলুম।

২৭

### বাবার পেমাদ

বারান্দায় বসে বসে রুষ্টি দেখতে দেখতে ছুপুরটা দারুণ কাটলো। রঞ্জন তো অলোককে পেয়ে বেঁচে উঠেছে। দুজনে দূরে গিয়ে ধূমপান করছে। পিকোলো মুগ্ধ হয়ে পাহাড়ের রুষ্টি, আর বর্ষণে ফেঁপেফুলে গর্জে নেচে ধেয়ে চলা মন্দাকিনীর দিকে চেয়ে চোঁকাঠে বসে আছে। ফ্লাস্কে চা ভরে নিয়েছি। মাঝে মাঝে খাচ্ছি। ভারি রিলাক্সড সময়। হাতে কোনো কাজ নেই। ঘরে আলো নেই। লেখা-পড়ার প্রস্ন নেই। মেঘছায়াঘন বরিষণ-মুখরিত ইত্যাদি বিশেষণ অলংকৃত দিন। রঞ্জন এবং অলোকের মুখে এমনিতেই কথা কম, এখন একেবারেই কথা নেই। আমার কেমন ঘেন সন্দেহ হোলো। গুটিগুটি কাছে গিয়েই গন্ধ পেলুম। এ-ধুম তো সে-ধুম নয়? সিগারেটে গাঁজার গন্ধ আছে মনে হচ্ছে? হেসে ফেলল ছেলেগুলো।

—‘ঠিক ধরেছো তো দিদি? ভেবেছিলুম বুঝতে পারবে না! খুব শস্তা যে গাঁজা এখানে! এখানে চার আনায় যা দেয়, কলকাতায় দু’টাকাতেও পাবে না! বাবার পেমাদ!’

—‘আর চার টাকাতে হাশিশ!’ অলোক বলে।

—‘তোমরা সেও খাবে? হাশিশ খেতে খেতে কেদারনাথে উঠবে? তোমরা কি হিপি?’

—‘এই সেরেছে। আমরা খাবো কেন? আমরা ব্যবসা করবো। যাবার সময় অনেক হাশিশ কিনে নিয়ে যাবো কলকাতায়, চার টাকার হাশিশ পঁচিশ-টাকায় বিক্রি হবে। আর এর কোয়ালিটি’—

—‘মোটাই ওসব কিছুর করবে না। ওসব নিয়ে আমাদের গাড়িতে চড়বে না।  
নিজে নিজে রেলগাড়ি করে যাও।’

—‘কেন যে তুমি হাশিশের ব্যাপারটা খামকা দিদিকে বলে দিলে অলোক।  
কোনো দরকার ছিলো না। দিলে নেশটার বারোটা বাজিয়ে।’

বৃষ্টি চলতেই থাকলো। আমাদের কবিত্ব অঙ্ককারের সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে এলো।  
ঘরে মোমবাতি জ্বলে বসে বসে ভুতের গল্প করবার যথাযথ স্থান এবং কাল এটা।  
কিন্তু পাত্ররা অরাজি। এই জলের মধ্যে ‘টুরিস্ট লজে’ খেতে ওঠাও সম্ভব নয়।  
আমাদের ‘সুনীল লজ’-এর পেরাপ্রাইটার এসে বললেন—‘থানা হামলোগ বনা  
দেংগে। উসলোগকো কিতনা দিয়া? পাঁচ পাঁচ রুপাইয়া? হমকো ভি পাঁচ দে  
দো। কামরামে থানা মিল যায়েগা। আব্ বতাও কেয়া থাওর্গে?’

—‘খিচুড়ি-ভিমভাজা মিলেগা?’

—‘জরুর।’

—‘আউর পাপড়ভাজা? আলুভাজা?’

—‘জরুর।’

যতই স্লিপিং ব্যাগ থাকুক, হিমালয়ের এই বর্ষায় পাথরের মেঝেতে শোওয়া  
সোজা নয়। লেপতোশক ভাড়া করে আনানো হলো নীচের বাজার থেকে, মেঝের  
বিছিয়ে তার ওপরে স্লিপিং ব্যাগ পাতা হবে।

বিছানায় কাগজ পেতে বসে মোমের কাঁপা কাঁপা আলোয় আর মন্দাকিনীর  
ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকে দারুণ জমলো বর্ষা রাতের খিচুড়ি খাওয়া।

—‘ব্র্যাণ্ডি হবে নাকি, হুঁচামচ করে?’

—‘এক চামচ হতে পারে! এখনও কেদারনাথ বাকি! সবচেয়ে ঠাণ্ডা, সব-  
চেয়ে উঁচু।’

—‘বোতল তো ভর্তিই রয়েছে দিদি, কী করবে অতটা বাঁচিয়ে?’

—‘যাই করি। তোমাদের তাতে কী? এক চামচ করে, চায়ের মধ্যে  
দিতে পারি।’

—‘তাই সহ! বাবার পেসাদ!’

২৮

### ঘোড়েল কাহিনী

আমাদের ‘সুনীল লজ’-এর মালিকের নাম সুরষ সিং। তার ছেলের নাম সুনীল,  
বয়স তিন বছর। সুরষ সিং নিজে তার চেয়ে বছর দুড়ির বড়ো হতে পারে।

আমাদের সঙ্গে খুব জমেছে। হরষ সিং বললে—‘আমি নিজেই চলে যাবো তোমাদের সঙ্গে ঘোড়া নিয়ে। আমাদের অনেক ঘোড়া আছে। কুছ মুশকিল নেহি হ্যায়।’

কেদারনাথের দয়ার প্রমাণ প্রথম থেকেই পাচ্ছি। অশ্বতর নয়, ঘোড়াই। দিব্যি Pony যাকে বলে, দেখতে গুনতে ভদ্র। আর পথ তো রীতিমত প্রশস্ত। চওড়া রাস্তায় ওটা ঘোড়া পাশাপাশি যেতে পারে। যমুনোত্রীর মতো সরু ভয়ংকর গিরিপথ নয়। বাদিকে পাহাড়, ভাইনে মন্দাকিনীর খাদ। পদযাত্রীদের—‘অন্দরসে বচাইয়ে’—হরষ সিংও সেই স্বজন সিংয়ের বুলিই বলছে গুনতে পাই—‘জানুবরকো বিসোয়াস নেহি’—!

সত্যি কি তাই? জানোয়ারদের বিশ্বাস করতেই বেশি ভয় কি?

পিকোলোর ঘোড়া ধরেছে লছমন সিং বলে একটা বাচ্চা ছেলে। আমি বদল করে নিলুম। সেবারে যমুনোত্রীতেও আমার বেলায় স্বজন সিং আর পিকোর বেলায় বাচ্চা রবীন্দ্র সিং ছিলো। আর আমার উদ্বিগ্ন প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিলো। লছমন সিংকে আমি নিয়ে হরষ সিংকে পিকোর ঘোড়া ধরতে বলি। এ ব্যবস্থায় সবাই খুশি। লছমনের সঙ্গে আমার খুবই ভাব হয়ে গেল, হরষের সঙ্গেও পিকোর দিব্যি বনিবনা! রঞ্জন পদব্রজে, অলোকের সঙ্গে। এ যাত্রায় ওর কষ্ট নেই, সঙ্গী আছে। প্রত্যেক চটিতে থামবে, চা-জিলিপি ওড়াবে। জিলিপি খাওয়া আমার কড়া বারণ, যেহেতু কলেরার ইনজেকশন নেওয়া হয়নি, পকোড়া-জিলিপি-লাডু, খাওয়া চলবে না। কিন্তু ওই বয়েসের ছেলে, আড়াল পেলে কি আর কথা শোনে? (কোনো বয়েসের ছেলেই অবিশিষ্ট আড়াল পেলে কথা শোনে না।) তার ওপর চটিতে চটিতে গঞ্জিকার ঘোর আড্ডা আছে সাধুদের দয়ার। কে জানে হাশিশ-মাশিশও খায় কিনা সাধুরা? ওদের কথা না ভাবাই ভালো।

পিকোলো আর আমি কেদারযাত্রাটি খুবই আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করছি। চওড়া রাস্তায় পড়ে যাবার ভয় নেই, দিব্যি রোদভরা শুকনো দিন, অথচ চড়া-রোদ্দুর নয়, চমৎকার ঘোড়া, লাকাচ্ছে না, গায়ে ব্যথা হচ্ছে না, তুলকি চালে চলছে, পথে পদযাত্রীদেরও ঠেলা মারছে না। হাঁটবার জুতোও প্রচুর জায়গা রয়েছে পথে, যাত্রায় কোনো টেনশন নেই। স্বন্দর অবশ্য যমুনোত্রীর পথও, বরং ভয়ংকর বলেই আরো স্বন্দর। কেদারনাথ দুর্গম নন মোটেই, কেন যে লোকে দুর্গম বলে! আমাদের পোটলাপুটলি সব রেখে এসেছি ‘সুনীল লজ’-এর অফিসে, জমা। পয়সা দিতে হবে মালপিছু দিনে এক টাকা, এই লেফ্ট লাগেজ মার্ভিসের জন্ত। রাত্রে কেদারনাথে থাকবো, সকালে কেদারনাথ দর্শন করে কেরং রওনা হবো। এটাই

সাধারণ নিয়ম ।

লছমন সিং ইস্থলে পড়ে । ভেড়াও চরায় । এই ষোড়া ওদের নয়, সুরম্য সিংয়ের বাবার । লছমনের বাবার ষোড়া নেই । সেও অন্তের ষোড়া চরায় । মাহিনামে ৭৫ তন্থা পায় । খাওয়া নিজের । এই ১১০ থেকে সে কিছুই পাবে না । দিনে অন্তত দুটো ট্রিপ তো করতেই হয় । একবার ওঠা, একবার নামা । দুবার ওঠানামা একদিনে সম্ভব হয় না সাধারণত । সীজন তো বছরে ছ'মাহিনা, যতদিন খোলা থাকে কেদারনাথের মন্দির । অক্ষয়তৃতীয়া থেকে দীপাবলী পর্যন্ত । বাকি ছ'মাস ? মুশকিলসে খানা মিলত । কাম নেহি !

বহুগুণা সত্যি গাড়োয়ালের প্রভূত উন্নতি করেছেন । গ্রামে গ্রামে ইলেকট্রিক, স্কুল, ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল, মেডিক্যাল ইউনিট, পানীয় জলের ব্যবস্থা, ভেড়ামহিষ কেনো, তাঁত কেনো, উল কেনো, জমি লাঙল, বীজ-টিজ কেনো, এবং পাম্প কেনো । - 'বন-বাঁচাও'-অভিযানে মদত দিয়েছেন, 'একটি বৃক্ষ দশটি পুত্রের সমান' 'তুমি গাছকে রক্ষা করো, গাছ তোমার পরিবারকে রক্ষা করবে' ইত্যাদি ধ্বনি চতুর্দিকে এঁটেছেন —এত করা সত্ত্বেও দেখছি গাড়োয়াল খুব গরিব দেশ । সবাই ভো আঙুর-এমপ্লয়েড ! অন্তত পার্বত্য অঞ্চলে । এদের তো আগে গুনতুম খুব যক্ষা হয়, দার্জিলিংয়ের নেপালীদের মতো, পাহাড়ে মাল নিয়ে ওঠে-নামে, খাওয়া-দাওয়া পায় না, শরীর অল্প বয়সেই ভেঙে যায় । অবস্থা এদের বয়স সকলেরই খুবই অল্প বলে মনে হয়, নইলে খুব বুড়ো । এদের দাড়ি-গোঁফ নেই, মধ্যবয়সেও হয় না ।

২৯

### ফুল খিলে হ্যায় গুলশন্ গুলশন্

রাস্তার ধারে প্রচুর গুচ্ছ গুচ্ছ শুভ্র লতাপুষ্প ছেয়ে আছে । কী ফুল ?—গোলাপ ? মনে তো হয় না গোলাপ ফুল বলে । পাংলা পাঁচ পাপড়ির ফুল । লছমন সিং ছুটে গিয়ে এনে দেয় ।—'দেখিয়ে যেমসাব । গুলাব হ্যায় ।' গন্ধ শুঁকে দেখি ওমা ঠিকই তো ! গন্ধ গোলাপেরই । পাতাগুলি বড় বড় হলেও গোলাপ পাতাই, কাঁটাও আছে । শাদা বনগোলাপে, সবুজ লতাপুষ্পে ঢাকা পথের পাশের পাথুরে দেওয়াল । আরো অনেক ফুল ফুটেছে—বেগুনী হলুদ । গোলাপি, কুচিকুচি কত রকমের ফুল—যমুনোত্রীর মতো অত না হলেও খুব কমও নয় । টুকটুকে লাল একরকম ফুল ফুটে আছে অনেক ওপরে ওপরে, পাড়া গেল না । বাকি সব ফুল পাতা তুলতে তুলতে পিকোলো আর আমি ফুলবালা হয়ে পড়লুম ক্রমশ ।

সবচেয়ে অবাক করলো মাটির খুব কাছাকাছি কোটা একরকমের ফুল । ঠিক

যেন গোথরো নাপের ফণা! ফুলটি একটা সবুজ ডাঁটায় জন্মায়। প্রথমে সবুজ ডাঁটাটা চ্যাপ্টা হয়ে যায় ঠিক ফণার আকৃতিতে। তারপর তাতে ডুরে ডুরে দাগ হয়। তারপর ডুরেগুলো কালো হয়। তারপর সেই চ্যাটালো, ভোরাকাটা ফণার ওপরে স্পষ্ট গোথরো নাপের মাথায় যেমন আলনা থাকে, তেমনি একটা চিহ্ন আঁকেন প্রকৃতি। প্রকৃতির এত কেরামতি কেন? না দুর্দান্ত পাহাড়ী ছাগলদের মুখ থেকে এই নিরীহ উদ্ভিদটিকে রক্ষা করা দরকার।

যাত্রীরা সকলেই এই ‘নাগফণ’ পুষ্পের অলৌকিক রূপলালিত্যে বিমোহিত হয়ে পড়ছেন। তবে ছ’এক জন বাচ্চাছেলে, এবং এই পিকোলো আর তার মা জননী ছাড়া কাউকে নাগফণ ফুল তুলতে দেখলুম না। ফুলটি সুন্দর নয়, অদ্ভুত। কোনো গন্ধ নেই। কাঁটাও না। আঠাও না। লছমন সিং, সুরষ সিং দুজনেই উৎসাহ-ভরে অনেক তুলেছে। বনফুলের গুচ্ছ বাহারী পাতার বোঝায়, এবং ‘নাগফণ’ ফুলের গোছা, এত সামলে, ঘোড়া, ব্যাগ, জল, ক্যামেরা, শাড়ি, শাল, এসব সামলানোর জগ্ন আর হাত বাকি থাকে না। আমি তো দশভুজা নই। পথে একটা গেসিয়ার পড়ল। ঘোড়ার মনের আনন্দে পথহীন বরফের মধ্যে চলতে শুরু করল। কিন্তু আমার খুব ভয় করছিল। ‘নেমে, হেঁটে যাই’—যত বলি, লছমন বলে, ‘ঠিক হায়, বৈঠ রহিয়ে।’ এক জায়গায় দেখি মিলিটারির লোকেরা তুষার কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে সিঁড়ি তৈরি করছে। পায়ে ধারা হাঁটছেন, এই বরফের ঢালু পথে ওঠা তাঁদের পক্ষে কঠিন।

দূর থেকে যেই ‘রামবাড়া’ চটি দেখা গেল, লছমন সিং বললে—‘আধা রাস্তা খতম!’ রামবাড়া ঠিক মধ্যপথে। প্রথমে পড়েছিল জঙ্গলচটি। সেটা ছোট কয়েকটা চায়ের দোকান। রামবাড়া কিন্তু বেশ বড় চটি। কালীকমলিবালার ধর্মশালা আছে, বিড়লার গেট হাউস আছে, এবং জায়গাটিও বড় চমৎকার। উপত্যকার ধার দিয়ে মন্দাকিনী প্রবাহিত হচ্ছেন, দূরে চারিপাশেই তুষারমৌলি হিমালয়ের শিখর যেন ঘিরে আছে। অপরূপ স্নো-ভিউ। মনে হল কেন যে লোকে দার্জিলিং-সিমলা যায়? এমন সুন্দর জায়গায় হলিডে-রিসর্ট করে না? নাহেবগুলো এতদিন ধরে এদেশে তবে করছিল কী? সুইজারল্যান্ডে এর চেয়ে সুন্দর স্পট ক’টাই বা আছে? প্রকৃতি তো ছল্লভ ফোড়কে দিয়া—মাহুধ তাতে বিশেষ কিছুই যোগ করে নি।

### মাদোদাসজী

অনেকক্ষণ ধরেই পথে প্রায় আমার পাশাপাশি আসছেন একজন দণ্ডধারী সাধু। এপথে অনেক রকমের সাধু দেখা যায়। দণ্ডধারী অনেককে দেখেছি। এঁরা দণ্ডী-স্বামীর শিষ্য। গঙ্গোত্রীতে দণ্ডীবাবার আশ্রম আছে, ধর্মশালা আছে, কবিতাদিরা একদিন ছিলেন শুনেছি। খুব শান্তিপূর্ণ আশ্রম, তবে মন্দিরের থেকে অনেকটা দূরে। আমি এই দণ্ডীবাবাকে জিগোস করি,—‘আপনার নাম কী, বাবা?’ সাধু-বাবা বেশ তরুণ, ত্রিশের নিচেই বয়স হবে। ঝকঝকে এক মুখ হেসে উত্তর দিলেন—‘মাদোদাসজী!’

—‘আপনি কোথা থেকে আসছেন মাদোদাসজী?’ তিনি হেসে বললেন, তাঁর তো কোনো বাঁধা ঘর নেই। এই মুহূর্তে আসছেন গঙ্গোত্রী থেকে। তিনি সারা বছরে ছাঁজায়গায় থাকেন : অঘোধ্যা, মথুরা, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, কাশী, হরিদ্বার। এবং প্রতি বছরই চারধাম ভ্রমণ করেন! এটা সাধুদের কর্তব্য! চারধাম ভ্রমণ, সাধুদের জন্ত, বলতে গেলে ফ্রী। কালীকদলিওয়ালার প্রতিষ্ঠান থেকে মোট বিয়াল্লিশটা পড়ছি (রুপ) দেয়।—‘ডেইলি র্যাশন উঠানেকে লিয়ে। উস্বে জ্যাदा খায়গা তো আপনা পয়সা লাগেগা!’ কিন্তু ওই বিয়াল্লিশটা রুপনেই সাধারণত চারধাম হয়ে যায়। সন্ন্যাসীরা দিনে একবার খান, বিয়াল্লিশ দিনের রসদই যথেষ্ট। চারধাম ঘুরতে তার চেয়ে বেশি বড় জোর তিন চার দিন লাগে। নিজে রেঁধে নিতে হয়। আটা, আলু, উলুন, কাঠ, সব দেয়। কালীকদলিবালা। শুতেও দেয়। ইঁা সন্ন্যাসীদের সব রকম যত্ন করে কালীকদলিবালার প্রতিষ্ঠান!

আমার শুনে ভয়ানক লোভ হতে লাগলো ওই বিয়াল্লিশটা পড়ছি হাতে করে পায়ে-হেঁটে ঘুরতে। কিন্তু প্রপারলি রেজিস্টার্ড সন্ন্যাসী হতে হবে তো। আর বাথরুমের একটা সমস্যা হয়তো আমার হবে, সন্ন্যাসিনী প্রপার হলে যেটা হয় না। এতদিন যে ঘুরছি, সত্যি বলতে কি সন্ন্যাসিনী কিন্তু চোখে পড়ল না একজনও। তাঁরা কি ঘোরেন না? তাঁদের সন্ন্যাস কি আশ্রমবাসিনী থাকার? তাঁদের চার-ধাম ভ্রমণের বাধ্যবাধকতা নেই?

—‘মাদোদাসজী, আপনি কতদিন সাধু হয়েছেন?’

—‘বচ্পনসেই সাধু হুঁ ম’য়ায়। যিস্কো ভগবান বুলালেতা আপনে কামমে, উয়ো সাধু বনু যাতা!’

‘হঠাৎ কেন সাধু হতে ইচ্ছা করল আপনার?’

—‘ক্যা জানে ? কোই চোর-ডাকু বন্ত, কোই সাধু-সন্ত্ বন্ত। ভগবান বনা লেতা !’

—‘এত অল্পবয়সে এই কঠোর জীবন আপনার ভালো লাগে ? আপনার বয়েস এখন কত ?’

লাজুক হেসে মাধোদাসজী বললেন—‘উন্নিস সালকা হুঁ !’

এতক্ষণ লছমন সিং চুপচাপ আমাদের বাক্যালাপ মন দিয়ে শুনছিলো আর হাতে ছপ্টি দিয়ে পথের ধারের গাছপালাকে ছপাং ছপাং করে শায়েস্তা করছিলো। ঘোড়াটি যেহেতু অতি ভদ্রলোক, তাকে কিছুই বলতে হয় না। দেখতেও অভিজাত ধবধবে শাদা, স্বভাবটিও “নোব্ল অ্যানিমেল” অভিহিত হবার যোগ্য। লছমন সিং এবার মাধোদাসজীকে একটা কথা বলে বসলো—‘কভী হো নেহী সক্তা !’

• —‘ক্যা হো নেহী সক্তা ?’

—‘তুমহারা উমর চৌভিস / পচ্চিস সাল হোগা। উন্নিস হো নেহী সক্তা। হমকো পতা হায় !’

—‘ক্যাসে পতা চলা ?’

—‘দেখনেসে মালুম পড়তা !’

মাধোদাসজী দেখলুম একেবারে ক্ষেপে গেলেন। কী ? তাঁর বয়স বাড়িয়ে দেওয়া ? চ্যালেঞ্জ করা ? তাঁকে হয় মিথ্যাবাদী অথবা অজ্ঞান বলা ? মাত্র তেরো চোদ্দ বছরের চেয়ে বেশি নয় লছমনের নিজের বয়েস। তার নিশ্চিত কথা বলার ধরনে আমার তো খুব হাসি পাচ্ছে। কিন্তু মাধোদাসজীর হাসি পায় নি।

—‘আরে, তুমি পাহাড়ী লোগ, থানাপিনা করতা নেই, তাগদ ভি নেহী হোতা, বাড়তা নেহী ঠিক সে, জিন্দগী ভর ইতনা ছোট-ছোটাহী রহু যাতা, ঠিকসে মোচ-দাড়ি ভি নিকলাতা নেহী। একদম জংলা আদমি হোতে হো তুমলোগ, হিলস্ পিপলকো থানা ভি নেহী মিলতা তুমকো—হমলোগ প্লেনস্‌বায়লা, প্লেনস্‌বায়লা সবকো তাগদ হোতা হায়, যিতনা পয়সা কামাতা, সব থানা থা-কে খতম করতা, ইসলিয়ে ইতনা তাগদ, উমর জেয়াদা লাগতা—আরে তুম্ লোগোঁকে তো ঘরমে থানা ভি মিলতা নেহী, সালভর—’

—‘কিউ নেহী মিলতা ? জরুর মিলতা। বহু মিলতা থানা পাহাড়মে—এইসা মত বোলনা’—লছমন সিং হঠাৎ তেড়েফুঁড়ে উঠেছে ! সঙ্গে সঙ্গে কথার স্বর পালটে ফেলেন মাধোদাসজী—‘আরে খালি থানা থানেসে কেয়া হোগা ? আসনতো নেহী করতা তুমলোগ ? হমলোগ সাধু বাবা, সাধুলোগকো উমর



বাড়তা নেহী যেইসা আদমী লোগকো উমর বাড় যাতা না, সাধুলোগকো ওইসা নেহী হোতা—ইসলিয়ে কি হমলোগকো কড়া রুটিন হায়। জপতপ, ধ্যান-পূজা, সাধন-ভজন, আউর যোগাসন—এই করনেসে দিল শান্ত হো যাতা, তবিয়ে শরীফ রহতা, আউর উমর বি নেহী বাড়তা। শুনা? যমুনাতীর মে এক সাধুবাবা হায় দণ্ডীবাবাই হায় এক, হম উনকো দেখকে আতা হু, উনকা উমর আর দো'শ মাল হোগা, দেখনেসে মালুম পড়ে গা, পঁচাশ! সাধুলোগকো উমর কোদে কভী বোল নেহী পাতা—তুম কায়সে সকোগে?’

লছমন সিং একথার উত্তর দিল না। দুশো বছরের সাধুকে পঞ্চাশ বছরের মত দেখালে, ওর তাতে কিছুই বলার নেই। উনিশ বছরের সাধুকে পঁচিশ বছরের মত দেখালে ওর আপত্তি। সংসার ত্যাগী দণ্ডী সাধুর নিজের ব্যয়েই এই দুর্বলতা দেখে অবাক হয়ে যাই! “হিলস পিপল” আর “প্লেনস বায়লা”-দের বিষয়েও তাঁর বেশ সাম্প্রদায়িক মতামত হয়েছে। পাহাড়ীরা গরিব দুখী, খেতে পায় না, সমতলের লোকেরা খেয়েদেয়ে রসেবসে থাকে। কে যে কী জন্তে সন্ন্যাস নেয়!

৩১

### প্যার-কি-কহানী

গাড়োয়ালের গরিব লোকেরা কি খায়, কী পরে, কী করে আমি আর লছমন সিং যখন এই সব কথা বলছি, ওদিকে পিকো আর সুরব সিংয়ের আরেক ধরনের গল্প হচ্ছে। সিংয়ের দাদা জিওগ্রাফির প্রফেসর কোনো এক কলেজে। সুরব সিংয়ের ছোট ভাই বি. কম. পড়ছে। উত্তরকাশীতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে আরেক ভাই। ও নিজে ‘লজ’ চালায়। বোড়া ওদের নৌকর লোগ চালায়। আজ খুদু হি চলা আয়া,—আপনা শখসে। পিকো স্বযোগ পেলেই চেষ্টায়ে আমাকে খবরগুলো পাস অনু করে দিচ্ছে,—‘মা, মা জানো ওর দাদাও প্রফেসর; কলেজে জিওগ্রাফি পড়ায়।’ ইত্যাদি।

এক সময় শুনি গান হচ্ছে—‘তৈরি প্যারী প্যারী সুরতকো, কিসিকে নজর না লাগে, চশমে বদদুর—’ পিকো এটা রিলে করল না। তারপর শুনি, ‘ইয়াদ কিয়া দিলমে কাঁহা হো তুম—প্যার-সে পুকার লো যাঁহা হো তুম—’। খানিক পরে শোনা গেল খুব মিষ্টি সুরে কী একটা গান—লছমন সিং উতলা হয়ে বলে—“ইয়ে পাহাড়ী গানা হায়, গাড়োয়াল কি গানা—বহু আচ্ছা লাগতা হমকো—”

—‘কিসের এত গান শুনছিস রে পিকো?’

—‘স্বরঘ সিং শোনাচ্ছে ওদের গান—আমাকে বলছে আনাদের গান গাইতে—’

—‘কেবলই তো প্রেমের গান শোনাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে—’

—‘তাই শোনাচ্ছে গো—কী করবো?’

—‘করবি আবার কী? শুনে যা! ইগনোর কর। তুই যেন আবার ওকে গান শোনাতে বসিস নি।’

—‘পা-গল?’

পিকো গান না গাইলেও ক্ষতি হয় নি। স্বরঘ সিং ছুটে ছুটে ফুল তুলে, দৌড়ে দৌড়ে গান গেয়ে, দেবানন্দের ঠাইলে ঘোড়ার লেজ মলে দিয়ে, মনের স্বখে নিরাপদেই পথ কাবার করলে। কেবল একবারই, সে যখন ফুল তুলছিল, পিকোর লাল ঘোড়া হঠাৎ ছুট লাগালো—অগ্ন একটা শাদা ঘোড়াকে তার লীড়ার মনে করে। সে সর্বক্ষণই আমার শাদা ঘোড়াকে অনুসরণ করে পথ চলে। ‘মামেকং শরণং ব্রজ’ বলে দিয়েছিল বোধ হয় তাকে আমার ঘোড়া। আমার শাদা ঘোড়ানী বয়স্ক মহিলা, আর সে অল্পবয়সী থোকা; সর্বদা বড়কে মান্য করে চলে। আমি একটু এগিয়ে গিয়েছি, ফুলে ফুলে এবং গানে গানে পিকো পিছিয়ে পড়েছে। তার ঘোড়া হঠাৎ আমার ঘোড়াকে দেখতে না পেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে দৌড় লাগালো অগ্ন একটা শাদা ঘোড়ার পেছনে। পিকো তো প্রাণ দিয়ে লাগাম ধরে আছে—আর স্বরঘ সিং চৈচাচ্ছে—‘লাগাম পাকুড়ো, ছোড় মত দেনা—’ তার হাত ভর্তি ফুল। লছমন সিং স্তনতে পেয়ে ছুটে গিয়ে ধরলো অগ্ন ঘোড়াকে—পিকোর তো ধড়ে প্রাণ এলো, এবং পিকোর মায়েরও।

—‘আর একটাও ফুল তুলবে না!’ ফুলের ওপর মায়ের নিবেদাজ্ঞা জারি হয়ে গেল। এমন কি ‘নাগকণ’ ফুল দেখলেও তোলা বারণ। রামবাড়া চটির পরে গরুড়চটি। সেখানে সবাই চা খাচ্ছে। সারা পথে, এক বাঙালী দম্পতি আমাদের প্রায় পাশে পাশেই ছিলেন। এক ঘোড়ায় স্ত্রী খুবই ক্লান্ত, কাতর, আরেক ঘোড়ায় তার কর্তা, বেশ শক্তই আছেন। ফেরৎ যাত্রীদের সারা পথই জিজ্ঞেস করছেন—‘আর কত দূর তাই?’ সবাই বলছে—‘এই তো এসে গেছেন! জয় বাবা কেদার-নাথ কী!’ শুনে কর্তা স্ত্রীকে সাহস দিচ্ছেন—‘ঐ তো, এসে গেছে! শুনলে তো?’ গরুড়চটিতে তাঁরাও চা খেতে থামলেন। আমরা এগিয়ে চললুম, কেদার-

নাথ আর ২/১ কিলোমিটারের মধ্যেই। ‘দেওদেখানি’ বলে এক জায়গায় এসে ঘোড়াওলারা ঘোড়া ধামিয়ে দূরে আঙুল তুলে দেখালো—‘ওই যে, কেদারনাথ !’

দেখলুম দূরে ধবধবে ঝকঝকে তুষারশৈলের বলয়ের মাঝখানে ফোটোতে দেখা কেদারনাথের মন্দির ঝলমল করছে।

দেবতার মন্দির দেখা যায় বলেই বোধ হয় জায়গাটার নাম ‘দেওদেখানি’।

রামবাড়াতে চা খেতে থেমে, রঞ্জন এবং অলোকের জন্তে অপেক্ষা করেছিলুম। ওরা মিনিট পনেরোর মধ্যেই এসে পড়ল। সুরষ সিং তার চেনা একটি পরিচ্ছন্ন দোকানে নিয়ে গিয়ে আমাদের চা খাইয়ে দিয়েছে ততক্ষণে।

রঞ্জন আর অলোককে চা-টা খাইয়ে আমরা আবার রওনা হলুম একসঙ্গে। অতএব আশা করছি কেদারেও ওরা এসে পড়বে মিনিট পনেরোর মধ্যে।—লছমন সিং পুলের কাছে অপেক্ষা করতে লাগলো ঘোড়া নিয়ে। সুরষ সিং আমাদের সঙ্গে এলো। সে মাস্তান আদমি, কেদারনাথের পাণ্ডাদের চেনে-টেনে। ধরমশালা ঠিক করে দেবে আমাদের জন্তে।

৩২

ছোটাসা ঘর হোঁগা বাদলোঁ কি ছাঁও মে—

প্রথমে কালীকন্ডলীবালা। অন্ধকার মাটির ঘর। ঠিক পছন্দ হোলো না।

আরেকটা ধরমশালা। দোতলার ওপর মস্ত ঘর—ঘরের তিন দিকে মাটির মোটা দেয়াল, মাথায় চালির ছাদ। এক দিকটা খোলা। কোনো দরজা নেই—দেখানে বারান্দার সিঁড়ি এসে থেমেছে। ফ্রী। ঘরটা খুব সুন্দর—মেঝের খড়ের ওপর শতরঞ্চি পাতা। ছ’টাকাতে লেপ তোষক ভাড়া পাওয়া যাবে। ঘরে অনেক লোক থাকার ব্যবস্থা। একা আমরা নই, অন্তত বিশ-পঁচিশজনের ঘর। পিকোর খুবই পছন্দ দরজাবিহীন ঘর বলে—কিন্তু আমার মনে হল রাত্রে যখন বরফের দেশ থেকে হাওয়া দেবে, তখন নিশ্চয়ই ব্রঙ্কোনিমোনিয়া হয়ে যাবে।—নাঃ।

—‘চলো বাবা, আরেকটা ঘর দেখি। বেশ অ্যাটাচড বাথরুমওলা পাকা ঘরদোর কি নেই কোনো? পয়সা দিতে আপত্তি নেই।’

এবারে দেখালো জে. কে. কোম্পানীর ধরমশালা। সুন্দর একতলা ডাক-বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। হ্যাঁ, বাথরুম অ্যাটাচড বটে কিন্তু তা এমন কায়দায় তৈরি যে একসঙ্গে ৪টে ঘরের সঙ্গেই অ্যাটাচড। সব চেয়ে পেছনের ঘরটা দিতে পারে, অন্য সব যাত্রী ভরা। এও ফ্রী। এও মেঝের শতরঞ্চি পাতা। ছ’টাকা দিলে বিছানা। গাঁইগুঁই করছি দেখে ছেলেটি বললে—‘খুব দামি একটা ঘর আছে

দোতলায়। পঁচিশ টাকা ভাড়া। নেবেন ?’

‘নিশ্চয়, নিশ্চয়, যদি ভালো হয়।’

জে. কে. ধরমশালার উঠানের ভেতরেই ছোট এই দোতলা। পাণ্ডার বাড়ি। নীচেও ঘর আছে। সেটা দশ টাকা। দোতলা পঁচিশ, বারান্দাঘেরা। জানলা দরজা আছে। নীচে, চাবি-দেওয়া এক্সক্লুসিভ টয়লেট। উপরের ঘর ঘর, চাবি তার। একতলারও বাথরুম আছে, অগ্নিদিকে। এই ঘরেও শতরঞ্চি পাতা, হ্যারিকেনও রয়েছে। ঘরে লোকজনও রয়েছে।—‘আমরা এখুনি নেমে যাবো। ভাড়া মেটানো হয়ে গেছে।’ বললেন বাঙালি গিন্নিটি।

—‘আপনারা ক’জন ছিলেন এ ঘরে ?’

—‘ছ’জন।’ ছ’জন কেন দশজনও থাকতে পারতো। ঘর বেশ বড়ো। এটাই নৈওয়া স্থির করলুম। ছেলেটিকে দুটি টাকা দিতে সে খুশি হয়ে পাণ্ডাকে খুঁজতে গেল। সুরষ সিং বললে—‘বিড়লা ধরমশালাই সবসে বেস্ট—আপলোক ট্রাই তো কীজিয়ে ? মালী কা সাথ বাত তো করনা ?’

মালীর সঙ্গে বাত করে আর কী হবে ? জে-কে-র একেবারে পাশেই বিড়লা ধরমশালা। ২২/২৩ কবিতাদিদের চারজনের বুকিং ছিল। চিঠিটা নিয়ে আসতে ছুট দিয়েছিল শুচাইসোনা। আমরাই তাড়াহুড়ো করে চলে এসেছি। তাছাড়া আজ ২৪শে। বুকিং-এর দিন ফুরিয়েছে। মালীর খোঁজে একবার গেলুম। চমৎকার বাড়িটা, সত্যি। একটু ঘুরে দেখে চলে এলুম, মালীর পাক্তা নেই। একজন উটকো লোক ছিল। সে আগ বাড়িয়ে বললে—‘বুকিং হায় ? পড়ছি হায় ?’ বিনা চিঠিসে ঘর নেহী মিলতা।’

—‘তুমি কে ?’

—‘আমি কুলি।’

—‘ঘর আছে ?’

—‘হম্ কিছু নেহী জানতা। মালীকো পুছো।’

আমি জে. কে.-তে ফিরে এলুম। পিকো আর সুরষ সিং গেল মালীর খোঁজে।

### ৩৩

#### নাম রেখেছি কবিতামাসি

খানিক বাদে লাকাতে লাকাতে অলিম্পিকে ৪টে সোনা-পাণ্ডার একখানা মুখ করে পিকো ফিরলো। যেন জেস্ আওয়ানের জ্বী-সংস্করণ।—‘হয়ে গেছে। বিড়লায় চলো। তোলা পুটলি।’

—‘সে কি রে ? কী করে হলো ?’

—‘কবিতামাসির বুকিংয়ের দৌলতে। আমি বললুম—আমাদের ২২/২৩ বুকিং ছিল, খাতায় ছাখো, কলকাতা থেকে বুকিং শ্রীমতী কবিতা সিনহার পাটি— অল ইন্ডিয়া রেডিওর অফিসার, তাঁর দুই ছেলে, আর মেয়ে। আমাদের আসতে দেরি হয়েছে। আমরা আজ এসেছি। মাত্র এক রাত্রিই থাকবো। একটু ব্যবস্থা করে দেবে না ?’ মালী খাতা খুলে বললো, ‘সিন্‌হা ? হাঁ, হাঁ, বুকিং থা। কিন্তু কালই ছেড়ে দিতে হবে। আজ ঘর খালি আছে। কাল থেকে আবার বুকিং হয়ে আছে।’ বলে ঘর খুলে দিয়েছে।

আমি তখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।—‘পড়ছি ? পড়ছির কী হবে ?’

—‘পড়ছি তো চায় নি রে বাবা ? চাইলে তখন দেখা যাবে। এত ভয় পাচ্ছো কেন ?’

আমি আবার ধর্মভীরু লোক। তীর্থে এসে এত গুলতান্নি ?—‘পিকো, এটা কি ভালো করলি ? যদি ধরা পড়ে যাই ? আমি কিন্তু বলতে পারবো না আমি কবিতা সিন্‌হা। তারপর যদি পুলিশে দেয় ?’

—‘পুলিশে দেবে না, মা, বড় জোর তাড়িয়ে দেবে। তখন তুমি এখানে এসে থেকে।’

—‘তখন যদি এটা না পাই ?’

—‘তাহলে আর-কোথাও পাবে। অত ভয়ের কী আছে ?’

—‘ঠিকিয়ে থাকবি ? আমি বাবা কবিতাদি মাজতে পারবো না। তুমিই মাজোগে কবিতাদি। আমি বরং তোমার মেয়ে হই।’

—‘তুমি কেবল কথাটা বেশি বোলো না মা, চুপচাপ থেকে। আমরাই ম্যানেজ করে নেবো।’

ভয়ে বুক ধুকধুক করতে লাগলো, অথচ ইচ্ছেও আছে, পিকোর সঙ্গে আমি অগত্যা বিড়লায় চললুম। সূর্য সিং কিরে গেল ঘোড়ার কাছে, রঞ্জনদের বিড়লায় নিয়ে আসবে বলে। আধ ঘণ্টা হয়ে গিয়েছে, ওরা আসে নি।

পিকো গিয়ে নীচের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। পাছে রঞ্জন এসে মালীকে ভুল-ভাল কিছু বলে ফালে। ঘরটি ভারি মনের মতো। দোতলার ওপরে। সঙ্গে বিলিতি কলঘর, ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন। ঘরে ডবল বেড, সোফাসেট, ড্রেসিং টেবিল, পোশাকের আলমারি। চমৎকার দামি হোটেলের মতো ব্যবস্থা। ফর্সা চাদর, ফর্সা বালিশের ওয়াড়, অবশ্য চেয়ে নিতে হোলো। না-চাইলে ঐ ময়লাতেই শুতে দিত সর্বশক্তিমান মালী। থানিক বাদে পিকো আর রঞ্জন, (অলোক সমেত)

বাগড়া করতে করতে এসে হাজির। রঞ্জন বলছে, ভুরু কপালে তুলে।

—‘ব্যাপার কী? তুই কি পাগল হয়ে গেছিস? আমাদের দেখবামাত্র মালীর কানের কাছে অমন, “এই যে, হামকো দাদালোগ আ গিয়া” বলে চৈচাতে লাগলি? আমি তোর দাদালোগ হলুম কবে?’

—‘আজকেই। তুমি কবিতা সিন্হার ছেলে। আমি তার মেয়ে। বুঝলি? তুমি পুতুলদা, আমি ঘুচাই, অলোক সমরেন্দ্রদা। মা কবিতামাসি!’

—‘অর্থাৎ, আজ যদি এ-বাড়িতে আগুন লাগে, জুতুগুহটি পাকাপোক্ত! আমার বাবা এসব ব্যবস্থা একেবারেই ভালো লাগছে না। শিগগিরি চা আনতে বল!’

চা আসে। এবং তারপরেও আমি কাষ্টপুতুলির মত বসেই থাকি। যতবার মালী আসে আমি চোখ ফিরিয়ে নিই। স্নানের কি গরম জল লাগবে? সেটা পিকো বলে। ছপুরে কী খাবো? সেটা রঞ্জন বলে। ভয়ানক ঠাণ্ডা, একটা আগুন জ্বালানো যাবে নাকি ঘরের মধ্যে?—অলোক বলে। আগুন আসে। গরম জল আসে। খানাও আসে। আমার বুক কাঁপে। আমি রিলাক্স করতে পারছি না। আমি মালীকে সমানে এড়িয়ে যাই। ভুলেও চোখাচোখি করি না। কী দরকার?

চা-টা বেশ ভালো। দাম কেবলই বাড়ছে। গৌরীকুণ্ডে ষাট, আশি পয়সা দাম ছিল রামবাড়ায়। এখানে ১৮ হয়ে গেল। খানা কিন্তু সেই ৫৮। ডাল-পাঁপড়-পুঁরি সবজি দেয়। ঘরের মধ্যে, এই বালতির আগুনটা খুব কাজে দিচ্ছে। প্রবল ঠাণ্ডা এখনই। রাত্রে কী হবে? জানলার বাইরের গ্রহরী স্বয়ং তুষারধবল হিমালয়, আর সবুজ ঘাসে ঢাকা উপত্যকা। জানলা খোলা দুঃসাহ্য—যা শীত বাইরে। শুনেছিলাম অবিশিষ্ট কেদারে মাত্রাতিরিক্ত ঠাণ্ডা পড়ে বলে যাত্রীরা রাত্রে রামবাড়াতে নেমে গিয়ে থাকেন।

৩৪

### রাজার চিঠি

পরিস্কার চাদর বালিশের ওয়াড় আনিয়ে সুন্দর করে বিছানা পেতে খেয়ে-দেয়ে শোবার বন্দোবস্ত করছি, রঞ্জনরা বাইরের লবিতে সিগারেট খাচ্ছে, এসে বলল—‘কারা যেন সব এসেছে দিল্লি থেকে, একটা ফিল্মের ইউনিট। তাদের ঘর নেই। তারা নাকি জি. ডি. বিড়লার চিঠি নিয়ে এসেছে।’

—‘আমরাও তো বিড়লার চিঠি নিয়ে এসেছি। চিঠিটা অবশ্য উত্তরকালীতেই রয়ে গেছে!’ বলে পিকোলো।

—‘কিন্তু কে লিখেছে সেই চিঠিটা? কে. কে. না জি. ডি. না বি. কে—  
কিছুই তো জানিস না। চিঠি-পত্রের কথা না তোলাই ভালো। বরং কোনের  
কথা আমরা বানিয়ে বলতে পারি। ওরা ব্যস্ত মানুষ, কোনেই সব ঠিকঠাক করতেই  
পারে।’ রঞ্জন বুদ্ধি দেয়।

—‘ওরে বাবারে—একদম ওসবের মধ্যে যাবি না,—খবদার বানিয়ে বানিয়ে  
বলিস নি পিকো, সর্বনাশ হবে, শেষ রক্ষা করতে পারবি না, সোজাসুজি সত্যি কথা  
বলে দে বরং—’

—‘সত্যি মিথ্যে কিছুই বলবার দরকার নেই দিদি, শ্রেফ চেপে যান’—বলে  
অলোক।

চেপে আর কী করে যাই? মালী এলো মাথা চুলকোতে চুলকোতে। মালী  
জানালা, জি. ডি. বিড়লা সাহেব লিখেছেন, ওদের দোতলার ঘর ছেড়ে দিতে!  
অত্যাশ্চর্য সব ঘর আগে থেকেই বুকড, লোক আছে। আমাদেরই বুকিং খতম হবার  
পরে এসেছি, তাই আমরা যদি এ ঘরটা ছেড়ে দিয়ে ঠিক এর নীচের ঘরটায় যাই  
তাহলে খুব ভাল হয়। সরেজমিনে তদন্ত করবার উদ্দেশ্যে, যুদ্ধং দেহী হয়ে পিকো  
বাইরে গেল। আমিও। তাকে সামাল দিতে। দেখি ভয়ানক ট্যাশ-মার্ক  
উদ্ধত কয়েকজন পুরুষ, একটি দাস্তিক মহিলা, আমারই বয়সী হবেন, খুব রংচং করা  
মুখ, সোয়েটার স্যাক্স পরা,—‘ইলেকট্রিক হাঁটার কেন নেই’, বলে খুব হস্তিধি  
করছেন লবিতে। তাঁদের চা দেওয়া হয়েছে—খেতে খেতে তাঁরা নাক তুলছেন,  
মুখ বাঁকাচ্ছেন, এবং বলছেন রানিং হটওয়াটারটা চালিয়ে দিতে। তাঁদের কথাবার্তা  
মালী কিছুই বুঝতে পারছে না। পিকোলোই তাঁদের সবিনয়ে জানালা,—‘কেদার-  
নাথে আপাতত ছ’মাস হোলো বিজলী নেই। তুবারঝড় হয়েছিল, ধস্ নেমেছিল,  
বিদ্যুতের স্তম্ভ উপড়ে লাইন ছিঁড়ে দিয়েছে। এখনও সে সব লাইন সারানো হয়  
নি। পিসার-লীনিং-টাওয়ারের মতো পড়ো-পড়ো দেখতে বিজলী স্তম্ভটা পথে  
দেখেন নি? আমরা তো দেখলাম!’ তাঁরা অস্থমনস্থ হয়ে গুনলেন। কোনো  
উত্তর দিলেন না। গুনলেন কিনা টের পাওয়া গেল না। আমাদের যে তাঁরা খুবই  
নিম্নস্তরের প্রাণীজ্ঞান করছেন সেটি ভিন্ন আর কিছুই বুঝতে দিতে তাঁদের উৎসাহ  
ছিল না। কিন্তু জি. ডি. বিড়লার চিঠি নিয়ে এসেছেন এটা তাঁরা সেধেই বললেন  
এবং তৎক্ষণাৎ পিকো বলে ফেলল, ‘সে তো আমাদেরও আছে।’

আর আমার মস্তিষ্কে বজ্রপাত হলো। আমার মনে হলো, সর্বনাশ! এফুনি  
তো বলবে—‘কই, দেখি?’ তখন?

আমি তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে বাস্পপুঁটলি বন্ধ করে গুটিগুটি নীচের ঘরে নেমে

চললুম। করসা চাদর-গুয়াড়গুলো খুলে নিয়ে যেতে তুললুম না, অবশ্যই, তোয়ালেও।

রঞ্জন বললে, ‘কেন চলে যাচ্ছে? ওরাই নীচে থাকুক। বাজে লোক!’

আমি বললুম—‘ভাই, ঝামেলা বাড়িও না। অর্থ ত্যজতি পণ্ডিতঃ শোননি? সর্বনাশ সমুৎপন্ন হয়েছে, অর্ধেক ত্যাগ করাই মঙ্গল। যদি ধরে ফেলে?’

আমরা বিনা বাক্যে নীচে চলে যাবো, এটা বোধহয় মালীও ভাবেনি। ঝামেলা বাধলো না দেখে আমাদের প্রতি সে যারপরনাই প্রসন্ন হয়ে উঠলো। এবং ওপরের অগ্নিকুণ্ডটি নিবে এসেছিলো বলে, নিচে আবার একটি অগ্নিকুণ্ড জালিয়ে এসেছিল। কিন্তু বলে দিল, রাত্রে দেবে না। রাত্রে ঘরে আগুন জ্বালানো বারণ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওপরের ঘরে মদের গন্ধ বেরুতে লাগলো—কেননা একটু পরে আমরা দোতলার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম—আশ্চর্য এক চাঁদ উঠছিল তখন কেদারের মাথাতে। এত শীত করছে, উঠানে যেতে পারছি না। ওপরে ঢাকা বারান্দা আছে।

ফিল্ম ইউনিটের লোকেরা কেন এসেছিল, তারা কারা, সরকারি ফিল্মস ডিভিশন, না কোনো ব্যক্তিগত প্রযোজক-পরিচালকের প্রয়াস কিছুই বোঝা গেল না। কিসের ছবি হবে, কেদার সম্পর্কিত ছবি, না কেদারটা একটা প্রাসঙ্গিক ঘটনা—কিছুই জানা হলো না।

৩৫

### জয় বাবা কেদারনাথ!

বিকেল থেকেই বর্ষা শুরু হয়ে গেল। ২।৫টে/৩টে থেকেই ভয়ানক বৃষ্টি পড়ে এদেশে। কেদার থেকে তাই বিকেলের দিকে কেউ নামতে চায় না, বা উঠতেও চায় না গৌরীকুণ্ড থেকে। পথ পিছল হয়ে যায়, ঝাপসা হয়ে যায় চোখ, এবং হাড়ের ভেতর পর্যন্ত কাঁপুনি শুরু হয়।

এখানে ঘরের মধ্যেই কি শীত! কি শীত! আমরা নানারকমের খেলা শুরু করেছি। এই খেলাটায় গল্প বলো, কান ধরো, নাচ করো, গান করো, হামাগুড়ি দাও, যাকে যা করতে বলা হচ্ছে, সে তাই করছে—শুধু অলোক কিছু করছে না। প্রতিবার অলোকের দান এলে, সে চুপটি করে থাকছে। আমরা বলতে বলতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে শেষে রঞ্জনকে বললুম, ‘ধর তো রঞ্জন পা ছুটো! এ-বাটা তো মরেই গেছে—এটাকে বাইরে ফেলে দিয়ে আসি!’ বলেই, যেমন কথা, তেমনি কাজ। আমি ধরলুম পা ছুটো, রঞ্জন হাত ছুটো—পিকো দরজা খুলে ধরলো, চ্যাং-



দোলা করে ছলিয়ে অলোককে নিয়ে উপস্থিত হলুম বাইরে লবিতে। অলোক বিন্দুমাত্রও আপত্তি করছে না, দিব্যি আত্মসমর্পণ করে শুয়েই আছে শূন্যে। আমরা ওকে উঠোনে হিহি শীতের মধ্যে সত্যি সত্যি ফেলে দেবো বলে দরজার কাছে গিয়ে দেখি একটি পাঞ্জাবি পরিবার লবিতেই আশ্রয় নিয়েছে। ঠক্কর করে কাঁপছে। এরা শোবে কোথায়? বাচ্চাকাচ্চাও রয়েছে সঙ্গে। কখন এলই বা?

অলোককে উঠোনে ফেলে না দিয়ে ‘জয় বাবা কেদারনাথকি’ বলে লবিতে সোফার ওপরেই বিসর্জন দিয়ে ফিরে এলুম। খানিক বাদে দেখি অলোক ফিরে এসেছে। দরজায় টোকা দিয়ে বলছে, ‘এই মহিলা আর তাঁর বাচ্চারা বাথরুমে যেতে চান, আমরা কি যেতে দেবো?’ সঙ্গে করেই মহিলা এবং শিশুদের নিয়ে এসেছে।

বাথরুমের পর তাদের জিজ্ঞেস করলাম, ‘শোবেন কোথায়?’

মহিলা বললেন, তাঁর স্বামী গেছেন ব্যবস্থা করতে।

—‘বাচ্চারা এই বিছানায় শুতে পারে খানিকক্ষণ’—বলতে তাড়াতাড়ি মহিলা বললেন, না না, তার দরকার নেই। গুঁরা মন্দিরে আরতি পূজা দেখতে যাচ্ছেন। এনার্জি আছে বটে! তাঁদের আর দেখিনি, ব্যবস্থা হয়েছিল নিশ্চয়।

কেদারনাথের মন্দিরের ঠিক পাশেই আমাদের বিড়লা ধর্মশালা। ধর্মশালা তো নয়, দামি বিলিতি কায়দার হোটেলের মতই মূল ব্যবস্থা। কেদারনাথের আরতির ঘণ্টা শোনা যাচ্ছে—কিন্তু একটু সদি হয়েছে—ভয়-ভয় করলো অতটা শীতে পথে বেরুতে। তবু বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম। বাইরে চম্রালোকিত হিমালয়ের পটভূমিতে বিশাল পাথরের নিশেদ ছায়াময় মন্দিরটি আশ্চর্য দেখাচ্ছে। সুন্দর শব্দটি যথেষ্ট নয়!

বজ্রীনাথের মন্দিরটি বিশাল। পয়তাল্লিশ ফুট উচু বহুবর্ণ তোরণ, অনেকটা তিব্বতী ধাঁচের। ভিতরে তো শুনেছি ওটা স্বর্ণমন্দির। শুনেছি বটে, কিন্তু যখন পূজা দেওয়ার জন্তু গেলুম, তখন সোনার কিনা, দেখে নিতে মনে ছিল না।

তিরুপতির রূপোর তোরণ সোনার তোরণ দেখে নিতে হয় না, তারাই চোখে আঙুল ফুটিয়ে নিজেদের প্রদর্শন করে। এত ঝকঝকে পরিষ্কার পালিশ-করা সোনারূপো ভালো লাগেনি। দেশের মানুষ খেতে পায় না, কিন্তু সোনারূপো দিয়ে দেবতার চোঁকাঠ মুড়ে রেখে দেয়। অবিশ্বি দেবতার আর তাতে কি? তার কাছে পেতল-সোনার কাঠ-পাথরে থোড়াই কারাক পড়ে! যাই হোক কেদারনাথের এই পাথুরে মন্দিরটির স্থাপত্যও আমার খুব ভালো লাগলো—এর মধ্যে কেমন একটা গুরুগম্ভীর, রাশভারি, austere শ্রদ্ধান্বয় ব্যাপার আছে। এই শীত,

এই তুষার, এই দীর্ঘ পার্বত্য পথ হেঁটে পার হয়ে আসা কাতর যাত্রীদল, এসবের সঙ্গে এমন একটি মন্দিরই ঠিক মানায়। এখানে ঢাক বাজছে, বদ্রীনারায়ণের ভজন হচ্ছে না। মাইক নেই। কেদারনাথের মন্দির অঞ্চলটি ছোট্ট, বাজারও ছোট্ট, গঙ্গোত্রীর মতো অনেকটা। বদ্রীর মতো এলাহি কাণ্ড নয়। মন্দাকিনীও ঠিক পাশ দিয়ে ছোট্টে না। কেদারনাথের কাছে কোনো উষ্ণনির্ব্বারও নেই, সেই পাহাড়ের নীচে গৌরীকুণ্ডে। এখানে পথশ্রান্তি দূর করতে আছেন হাজির হিমালয়, আর কেদারনাথ স্বয়ং।

৩৬

### স্বপ্ন ? মায়া ? মতিভ্রম ?

বদ্রীনারায়ণে জানলা খুলে চন্দ্রমৌলী নীলকণ্ঠ পর্বতকে দেখেছিলুম। কেদারনাথে রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পরে একবার ইচ্ছে করলো মন্দির, আর হিমালয়কে রাত্রের দেখা দেখে নিতে। কাল সকালেই তো নেমে যাবো। এই প্রথম রজনী, এই শেষ রাত্রি।

শোবার আগে আরেকবার কেদারনাথের দর্শন পেতে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম।

—ওকি ?

—ওরা কারা ? কোথা থেকে এলো ? কখনই বা এলো ?

—কেমন করে এতো কাছে এসিয়ে এসেছে স্বদূর হিমালয় ? হঠাৎ খুলে গিয়েছে কুয়াশার পর্দা, অনাবৃত হয়েছে জ্যোৎস্না-ধবধবে তুষারে-ঢাকা শৃঙ্গের পরে শৃঙ্গ—এক সারি তুখেল ঘোড়ার ঘোড়সওয়ার, ছুটে এসেছে অলঙ্কা থেকে,—ঝকঝকে তীক্ষ্ণ ইম্পাতের বর্ষাফলক তাদের উত্তত মুঠোয়। এই তরল চাঁদের আলো, এই অলৌকিক মেহপদার্থ পিছলে যাচ্ছে পেশীবহুল পর্বতের শক্ত শরীরে। সুন্দরী চাঁদ বুঝি এখান থেকে বেশি দূরে নয়, তাকে দেখেই এই প্রতিবেশী সৈন্তদের সর্বাঙ্গে হাসির আভা উথলে পড়ছে। এই চোখের কত কী পাওয়া বাকি ছিল সারাদিন। কোথায় লুকিয়ে ছিলে তোমরা, ঘোবনদৃষ্ট ধবধবে শিখরশ্রেণী, কোথায় যেতে যেতে ধমকে দাঁড়িয়েছো ? চঞ্চল গতিময়তা এখনও সর্বাঙ্গে মাথানো। এমন অসামান্য চমক দেওয়া প্রকৃতির নিজস্ব নাটকেই সম্ভব। “স্বপ্নলোকের চাবি” কথাটা শোনাই ছিল, এখন মনে হলো কেউ যেন সেটা হাতে পেয়ে খুলে ফেলেছে গোপন দরোজা। হিমালয়ের এই প্রসন্ন হাসিটিই সেই স্বপ্নলোক।

সামনে যদি কেদারনাথের মন্দির স্থির হয়ে না দাঁড়িয়ে থাকতো হয়তো ভাবতুম

আমি ভুল করে অন্য কোথাও চলে এসেছি। কোথাও চিহ্নমাত্র ছিল না এতগুলি ধবধবে শিখরের। দিনভর এবার ঘুঁমি করে লুকিয়ে ছিল মেঘ কুয়াশার আড়ালে। এদের পিছনে দূরবর্তী পর্বতটিই দেখা যাচ্ছিল শুধু। এখন দেখি উত্তুঙ্গ রূপের পাহাড় একেবারে ঘিরে ধরেছে। ‘রজতগিরিনিভ’ বলেছে কেন যে ‘চাকচাক্য-বতঃসংকে তা বোঝা গেল। স্তম্ভিত হয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম জানি না। এত করুণা? এত করুণা তোমার? এ যেন আমারই জন্তে একটা স্পেশাল শো! হে ইংরেজ সাধু শিবব্রীহস্পামী, তোমাকে শতকোটি ধন্যবাদ। তুমি অত জোর না করলে আমি তো আসতুমই না। আর কেদারে না এলে সতি সত্যি অপূরণীয় লোকসান থেকে যেতো। কোনোদিন জানতেও পারতুম না কী হারালুম। ছেলে-বেলার সেই কাঁচি সিগারেটের বিজ্ঞাপনের মতো: “আপনি জানেন না আপনি কী হারাইতেছেন!”

লোভীর মতো, একান্ত লোভীর মতোই—মৃগ অতৃপ্ত নয়নে চেয়েই রইলুম এক-টানা—যতক্ষণ না শীতের প্রকোপে দাঁড়িয়ে থাকা একেবারেই অসম্ভব হলো বারান্দায়। কাশি শুরু হয়ে গেল।

ঘরে ফিরতে গিয়ে দেখি বারান্দায় অল্প একটু দূরেই অলোক আর রঞ্জন। নিস্তরঙ্গ। জানি না কখন এসেছে।

একবার এই বিপুল মহান্ বিশ্বয়ের সামনে পড়ে গেলে—বাক্রহিত হয়ে যাওয়া ভিন্ন গতি নেই! এই রাতটি সারাজীবন ধরে আমার চেতনার স্রোতে স্বপ্ন-দেখার মতো ভেসে উঠবে। হয়তো রঞ্জন-অলোক ওখানে সাক্ষী না থাকলে আন্তে আন্তে একদিন ওটা সত্যিকারের স্বপ্নই হয়ে যেতো। স্বপ্নের কোনো সাক্ষী থাকে না। এখনও চোখ বুজলে দেখতে পাই সেই সাদা ধবধবে পর্বতের পায়ের কাছে কেদার-নাথের নিস্তরঙ্গ কালো পাথরের মন্দিরের সিলুয়েট। মাহুঘের তৈরি হয়েও ভারি স্বন্দর মানিয়ে গেছে, প্রকৃতিকে একটুও ডিস্টার্ব করে না। যেন এই প্রকৃতিরই অঙ্গ। সন্ধ্যারতি দেখতে নাই বা গেলুম, এই যে আরতি দেখা হয়ে গেল। এর আর তুলনা কোথায় পাবো? এই তো চন্দ্রতপনের আরতি।

ওখানে দাঁড়িয়ে আবার মনে হলো এবারের আসাটা ব্যর্থ। এ-আসা আসা নয়, আবার আসতে হবে। যেখানে খুশি যতদিন খুশি থামতে হবে। এই যে কেদারনাথে প্রথম এবং শেষ রজনী, এতে তো মন ভরে না। সন্ন্যাস নিয়ে আসতে হবে। সন্ন্যাসী লোকটাকে আগে বিসর্জন দিয়ে, তারপর আসতে হবে। তবে হিমালয় আমাকে কনফিডেন্সের মধ্যে নেবেন। সন্ন্যাসী না হলে এই মহাসন্ন্যাসীর সঙ্গে ভাব জমাবো কেমন করে?

### ভি. আই. পির ছয়লাপ

আবার রাত্রে ছেলেরা মাটিতে, মেয়েরা খাটে—এই বন্দোবস্তেই ঘুমোনো গেল। বিশাল ঘর, খাট মাত্র দুটো। আরও দুটো খাটিয়া যদি ওরা দিতে পারতো, পাতবার যথেষ্ট জায়গা ছিল। কিন্তু রাত্রে একবার বারান্দায় যাবো ভেবে ঘরের বাইরে বেরিয়ে দেখি লবিতে খাটিয়া পাতা হয়েছে। সব ঘরেই অনেক বেশি বেশি লোক। এঁরা সবাই জি. ডি. বিড়লার সহী করা চিঠি নিয়ে এসেছেন বলে মনে হোলো না। রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নরের সহী করা চিঠির দৌলতেই নির্ধাৎ চুকেছেন। তা ভালো, ধর্মশালা মানেই আতুর নিরাশ্রয় তীর্থযাত্রীকে আশ্রয় দেবার ঠাই। কে কার চিঠি আনলো সেটা জরুরি হওয়া উচিত নয়।

যা বুঝলুম একতলার ঘরগুলো মালী ছুঁচার টাকার বিনিময়ে ফাস্ট কাম ফাস্ট সার্ভ বেসিসে খয়রাতি করে, দোতলারগুলো ভি. আই. পি-দের জন্ম চাবি দেয়া থাকে, বিড়লার চিঠি দিলে সেগুলো মেলে। নীচের বাথরুম দিশি। উপরেরটা বিলিতি। অবিশিষ্ট নীচেরটাই বেশি পরিচ্ছন্ন। মস্ত স্নানঘর, গরম জল নিয়ে সকালবেলা ভালো করে স্নান করা গেল আরামে। গোর্গীকুণ্ডে যা সম্ভব হয়নি। স্নান করে চা খেয়ে চললুম মন্দিরে। ভোরবেলা একজন পাণ্ডা এসে আমাদের কার্ড দিয়ে গেছেন যথানিয়মে। তিনিই আমাদের মন্দিরে নিয়ে যাবেন। অল্প-বয়সী গাড়োয়ালী ছেলেটিকে বেশ ভালোই লাগলো। বললে—রঞ্জন-অলোকরা যেন এক্ষুনি গিয়ে কিউ-তে দাঁড়ায়, জায়গা রাখে একজন-একজন করে। বিশাল কিউ তো? সবাই মিলে স্নান সেরে একসঙ্গে যেতে যেতে ভীষণ দেরি হয়ে যাবে। ছেলেরা তো চায়ও না স্নান করতে। খুব আহ্লাদের সঙ্গেই ছুটলো তারা লাইনে দাঁড়াতে। জানে না তো মন্দির-চত্বরে ধূমপান নিষিদ্ধ।

### ইয়ম্ গঞ্জিকা ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ

ঠাকুর কার পূজো কার হাত থেকে নেন! মেসোমশাইয়ের মানতের পূজোর দান-সামগ্রী বের করতে গিয়ে দেখি গাঁজা, ভাং, হস্তুকি, বেলপাতা, পৈতে, ধূপ, ধূনার সঙ্গে দিব্যি মাটির কলকেও রয়েছে ৪টে। অবাক কাণ্ড! সবই দেখি গোনো গুনতি ৪টে করেই প্যাকেট আছে। যেন আমাদের ৪জনের হাত দিয়ে সাজিয়ে পৌঁছে দেবার জগ্গেই! মন্দিরে গিয়ে ছেলেদের রিলিফ দিলুম। তারা গেল পূজোর

ডালা কিনতে। ৪টে ডালা নিয়ে এল বাজার থেকে। ডালায় কাপড়, সিঁদুর, অনেক কিছু রয়েছে। কার্ডে আমাদের পাণ্ডার নাম আছে শ্রীমহাদেবপ্রসাদ ও শ্রীগুরুপ্রসাদ শর্মা, চামোলির লোক। কেদারনাথের ঠিকানা—যোগমায়া আশ্রম।

যোগমায়া আশ্রম উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মাতৃদেবীর পুণ্যস্মৃতিতে তৈরি ধর্মশালা। বাঙালি যাত্রীদের নিশ্চিত আশ্রয়। আমাদের সেই খুদে পাণ্ডাটি বলেছিল এর কথা, দেখিয়েও দিয়েছিল দোতলা বাড়িটি, কিন্তু স্থানান্তর ছিল। অনেক বাঙালি যাত্রী আশেপাশে তখনও ছিলেন দাঁড়িয়ে।

এই পুজোর কিউ-তে আজ সকালে কিন্তু বাঙালির সংখ্যাই বেশি। প্রচুর এই অঞ্চলের গ্রামের মানুষ এসেছেন, তাঁদের হাতের সস্তা ডালায় আমাদের চেয়ে অনেক মূল্যবান ভক্তির রসদ আছে। পাণ্ডারা খবরদারি করে বেড়াচ্ছে যার যার যজমানের।

কিনে আনা ডালাতে আমাদের মেসোমশায়ের মানতের দ্রব্যগুলি সাজিয়ে দিতেই সত্যি বেশ স্পেশাল-ডালা, স্পেশাল-ডালা দেখাতে লাগলো। ভালো করে নজর করে চকর মেয়ে দেখে এলুম। মন্দির চত্বর জোড়া অত দীর্ঘ, ভক্তসারিতে আর কারুর ডালাতেই গাঁজার কলকে শোভা পাচ্ছে না। অর্থমূল্যে এমন ডালাটি কিনতে পারা যেত না এখানে!

এখানেও নানান দামের পুজোর ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে টাকার অংকের সঙ্গে পুজোর সময়টা যুক্ত। যত বেশিক্ষণ ধরে কেদারনাথকে পূজো করা হবে তত বেশি খরচ। পাঁচ মিনিটের, পনেরো মিনিটের, আধ ঘণ্টার, পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পূজো থেকে টানা চব্বিশ ঘণ্টার পূজো পর্যন্ত আছে। এমন কি এক বছরের প্রাত্যহিক পুজোর ব্যবস্থাও। এবং সত্যিই হাজার হাজার টাকার পূজো দেওয়া যায়।

বজ্রীনাথে ছিল নানা দামের আরতি দর্শনের ব্যবস্থা। সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটা সাধারণের দর্শন বন্ধ। তখন শুধু ‘স্পেশাল আরতি’র সময়। ‘ভিজিটরস ওনলি’। গোল্ডেন আরতি সিলভার আরতির (এটা মাত্র ১১২) টিকিট কিনতে পাওয়া যায়। সত্যি সেলুকাস! কি বিচিত্র এই ভক্তি!

জুতো খুলে জমা রাখতে হয় মন্দিরের বাইরে। সেখানে দেখা হলো সেই পথের বাঙালি দম্পতির সঙ্গে। তাঁরা দিব্যি তাজা হয়ে উঠেছেন, ফোটো তুলছেন। মিশুক মানুষ বিমলবাবু গ্রাশনাল ইনসিওরেন্সে কাজ করেন, মিল্ক কলোনিতে বাস। ওঁকে বললুম আমার ক্যামেরায় দু একটি ফোটো নিতে, যাতে আমিও থাকতে পারি তাতে। উনি মহা উৎসাহে অনেকগুলি ফোটো তুলে দিলেন। নিজের দামি ক্যামেরাতেও তুললেন। (গোপনে জানাই, কলকাতায়

এসে কিন্তু দেখি বিমলবাবুর তোলা ছবিগুলি ওঠে নি! ভাগ্যিস একটা ছবি পিকোলো তুলেছিল, তাই তবু একখানা ছবি রয়েছে আমার কৈদারে)।

যতই দীর্ঘ লাইন হোক, এক সময়ে টার্ন এলো, জুতোটুতো খুলে মন্দিরে ঢোকা হলো। প্রথমেই বৃষ, তারপরে সিদ্ধিদাতা গণেশ। এবাধি অনেক অবান্তর ঠাকুর দেবতার মনোরঞ্জন করতে করতে অবশেষে স্বয়ং কৈদারনাথের গর্ভগৃহে প্রবেশের সুযোগ মিলল। মন্দিরের ভেতরটা অন্ধকার। কিন্তু এখানকার আবহাওয়া বহীনাথের মতো নয়, এখানে তো উচুনাক নারায়ণের মন্দির নয়। শিবঠাকুরের। শিবঠাকুরের স্বভাবটি আলাভোলা, তাঁর মন্দিরে অত কড়াকড়ি নেই, দিবি বিগ্রহের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁর প্রসন্নতা আদায় করা যায়। স্পর্শপূজাই প্রচলিত।

কৈদারনাথের বিগ্রহ বলতে আছে ষাঁড়ের পিঠের কুঁজের আকৃতির একটি কষ্টি পাথরের চাঁই। যেন কচিকাঁচা একটি পাহাড় সব আকাশের দিকে মাটি ঠেলে উঠতে শুরু করেছিল, হঠাৎ তার মাথার ওপরে মন্দির চাপা দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অথবা, মাটির তলায় লুকিয়ে আছে এক বৃহৎ স্বভভতার কুঁজটুকুই ভেসে আছে উপরে, একুণি বুঝি তেড়েফুঁড়ে উঠে আসবে, লগুতগু করে দেবে সাজানো পূজো-পূজো খেলা।

আমার খুব ভালো লেগে গেল কৈদারনাথ মন্দির। আর আমাদের নৈবেদ্যও খুবই মনে ধরে গেল কৈদারনাথের। অন্তত তাঁর পূজারী ব্রাহ্মণদের তো বটেই। গাঁজার কন্ধে দেখে তাঁদের চোখেমুখে কী বিমল দিবা বিভাই যে ফুটে উঠলো! অতি যত্ন করে পুরিয়া খুলে গাঁজা নিয়ে কলকে সাজালেন, স্বন্দর করে দাঁড় করিয়ে দিলেন পরপর চারটে কলকে। সিদ্ধি-টিদ্ধি দেখেও মহা পরিতৃপ্ত! সবচেয়ে ভালো লাগলো পূজোর সময়ে অগ্ন্যগ্ন নৈবেদ্যর সঙ্গে যখন আমায় দিয়ে বলালেন— ‘ইয়ম্ গঞ্জিকা ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ!’ আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই হাজার টাকার পূজো দিলেও কি শিবঠাকুর কি পুরুতঠাকুর কেউ অত খুশি হতেন না, কালীঘাটের কলকেগুলি দেখে যত উল্লসিত হয়েছেন। মেসোমশায়ের প্রতি কৈদারনাথের আর প্রসন্ন না হয়েই উপায় নেই। ফাঁকতালে আমরাও পেয়ে গেলুম দয়ার ভাগ।

৩৯

### পুরি-হালুয়া পয়সা পুয়া

পূজো দিয়ে বেরিয়ে বিমলবাবুদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার সন্ধানে গেলুম। শুনলাম কৈদারনাথ মন্দির নাকি পাণ্ডবদের তৈরি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর স্বজন হত্যার

মহাপাপ থেকে রক্ষা পেতে তাঁরা শিবের খোঁজে এখানে অবধি তেড়ে এসেছিলেন। শিব পাণ্ডবদের নিষ্ঠা পরীক্ষা করবার জন্তে তাঁদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে লাগলেন কাশীবিশ্বনাথের মন্দির থেকে পালিয়ে এলেন গুপ্তকাশীতে, সেখান থেকে একেবারে দুর্গম কেদারে! সেখানে শিব ষাঁড় সেজে লুকিয়ে রইলেন পার্বত্য গরু ষাঁড়ের দলে। ভীম তখন দুই পাহাড়ে দুই পা স্থাপন করে শিবের পথ আটকালেন, দেবতা তো মানুষের পায়ের ফাঁকে গলতে পারবেন না। ধরা পড়ে গিয়ে নিরুন্নয় হয়ে শিব তখন পাতাল প্রবেশ করলেন।—কিন্তু ‘পালাবি কুথা’ বলে ভীমসেন পালোয়ান তাঁকে জাপটে ধরলেন, চিনতে পেরেছি ঠাকুর! তখন পঞ্চকেদারে ফুটে উঠলো শিবঠাকুরের পঞ্চ অঙ্গ। সেই ষাঁড়ের পিঠই এই পুণ্য কেদারনাথের বিগ্রহ ধার পুজো করে স্বজন-হননের পাপ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন পঞ্চপাণ্ডব।

হায় কেদারনাথ—কি আশীর্বাদ করেছিলে তুমি? সেই স্বজন-হননের কলঙ্কিত অভ্যাস আমাদের আজও তো ঘুচলো না! পাঞ্জাবে, আসামে, অন্ধ্র, কাশ্মীরে, বাংলাদেশে, শ্রীলঙ্কায়। এই বিশাল ভূখণ্ডের যেদিকেই তাকাই, স্বজনের রক্তে মাটি রাজা। হে কেদারনাথ, আমাদের পূর্বপুরুষকে তুমি কেমনতর আনমনা মুক্তি দিয়েছিলে? আমি তো দেখছি সেই স্বজন-হননের মহাপাপেই অক্ষয় ফলভোগ করছে এই মহান ভারতীয় উপমহাদেশ। অতাবধি!

ছবি যেমনই তুলুন, বিমলবাবু কিন্তু লোক চমৎকার। লাইনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই বলছিলেন, ‘ব্রেকফাস্ট কী খাবেন অরডার দিয়ে দিন বরং। আমরা কাল দারুণ খিচুড়ি খেয়েছি এই ধারায় অর্ডার দিয়ে। যদি পুরি-হালুয়া খান, তাহলে ৬ জনেরটা অর্ডার দিলে স্ববিধা, ওরা ওজনের মাপমতন অর্ডার নেয়। কত কিলো স্বজি, কত কিলো আটা, এই রকম হিসেবে দাম ধরে, ক’গুণা লুচি ক’হাতা হালুয়া এভাবে নয়।’ বেশ তো, দিয়ে দিয়ে আন্দাজ মতো অর্ডার, আমরা ভাগ করে নেবো। সত্যি খুব ভালো পুরি-হালুয়া খাইয়েছিলেন। পুজোর পরে, মন্দিরে পাথুরে দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে, গরম গরম পুরি, হালুয়া আবার গাওয়া ঘি-য়ের স্ববাস, চমৎকার দুধের চা। পিকোলোর তো আছে নানান বায়না, সে হালুয়া খাবে না, নোনতা খাবে। নো প্রবলেম, তাঁর জন্তে এনে ফেললেন ফাস্ট কেলাস আলুর তরকারি। তখন প্রত্যেকেরই অবশ্য পিকোর আলুর তরকারিটার দিকেই নজর পড়ল। মা হিসেবে আমি চেষ্টা করলুম নজর না দিতে (একেবারে বিমাতৃহুলভ কর্ম)। কিন্তু একটু একটু নজর কি আর দিই নি? কেদার থেকে নামবার সময়ে বিমলবাবুর স্ত্রী আমাদের সঙ্গে ঘোড়ায় নামলেন, কিন্তু কর্তা এবার অস্বারোহণে রাজি নন। তিনি রঞ্জন, অলোকের সঙ্গে পদব্রজে নামবেন ঠিক

করেছেন। তাঁরা হেঁটেই যাবেন ত্রিযুগীনারায়ণ। পরে তুঙ্গনাথ। রুদ্রনাথও যাবার ইচ্ছে আছে।—গৌরীকুণ্ডে পৌঁছে কিন্তু অলোক বলেছিলো—‘বিমলবাবুরা আর ত্রিযুগীনারায়ণে যেতে পারবেন বলে মনে হয় না, বিমলবাবুর হাঁটা সহ হয়নি, পা দারুণ ফুলে গেছে। ষোড়া নেওয়া উচিত ছিল।’

শুনে খুব মন খারাপ হয়ে গেল। প্রবল উৎসাহ ছিল, জানি না ওঁদের হর-গৌরীর বিয়ের যজ্ঞে আহুতি দেবার স্বেচ্ছা শেষ পর্যন্ত হয়েছিল কিনা।

৪০

### নাম, শুধু নাম

সমস্যা হলো ঘর ছাড়তে গিয়ে। মালী খাতা হাতে এসে দাঁড়ালো, নাম ঠিকানা লিখে যেতে হবে রেজিস্টারে, কখন এলুম, কখন গেলুম, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাচ্ছি—এই সব, খুব গুরুত্বপূর্ণ খবর। সে প্রশ্নের উত্তর জানতে জানতে একটার পর একটা জাম পার হয়ে যায়।

আমি বললুম—‘ওরে বাবা রে আমি তো কবিতা সিংহ সই করতে পারবো না। অ পিকো, কোন্ ঠিকানা লিখবো? আমার হিন্দুস্থান পার্ক, না কবিতাদির গোবিন্দ ঘোষাল লেন?’ পিকো তো হেসেই আকুল। আমার সমস্যাটা তাকে স্পর্শই করছে না! আমি সই করলাম বাংলায়, নবনীতা দেবসেন। তারপর ইংরেজিতে, কেয়ার অব শ্রীমতী কবিতা সিংহ, আকাশবাণী, কলকাতা। তারপর বলছি—‘ভাই মালী, কবিতা সিন্ধা আমাদের দিদি হ্যাঁ, হামকো লিয়ে ঘর বুক কিয়া থা, হাম উন্কা ছোটী বহেন হ্যাঁ—।’ মালী কিছুই বলছে না, শুধু তাকাচ্ছে। পিকোর দিকে একবার, আমার দিকে একবার।

আর রঞ্জন রানিং কমেন্টারি দিয়ে যাচ্ছে—‘ওরে বাব্বা! তাকাচ্ছে কী! অ পিকো, খবদার ওর চোখে চোখ রাখিসনি, ভয় হয়ে যাবি! অ দিদি, পালিয়ে এসো, পালিয়ে এসো, আর দেরি করলে ষটি বাটি কেড়ে নেবে’—কিন্তু মালী কিছুই বললে না। বকশিশ নিয়ে দিব্যি হেসে নমস্কার করে চলে গেল। তবে কি বৃথাই আমার এত ভয়, এত উদ্বেগ, এত দ্রুত নাড়ীর স্পন্দন? মালীর কিছুই এসে যায়নি? যাঃ—

আমি আরেকবার কেদারনাথকে—আরেকবার শাদা ধবধবে উত্তুঙ্গ হিমালয়ের সেই শিখরশ্রেণীকে খুঁজে দেখলুম। নেই। কাল রাত্তিরের সেই যুবক হিমালয় আজকে সকালে আর নেই। এখন শাদামাটা, শাদা-কালো, বুদ্ধ এক পাহাড়। কুয়াশার চাদরে পা ঢেকে, অগ্ন্যম্নস্ক, স্থির বসে আছে। কালরাত্রের তুর্দান্ত মহাশ্ম



অশ্বারোহীর দল কোথায় লুকিয়ে পড়েছে। চন্দ্রালোকিত মধ্যরাত ভিন্ন বোধহয় তারা দেখা দেয় না।

শংকরাচার্যের সমাধি ঠিক মন্দিরের পিছনেই। অলোক আর রঞ্জন গেল। আমি আর পিকো ততক্ষণে থলি গুছিয়ে নিতে লেগে যাই। মন খারাপ! এই তো চারধাম শেষ। এবার কেবলই ফেরার পথ।

মন্দাকিনীর সেতুর ধারে গিয়ে দেখি ঠিক ঘোড়া নিয়ে লছমন সিং, সুরষ সিং রেডি। তারা পৌঁছে গেছে এত সকাল সকাল! যাত্রী না থাকলে ঘোড়া দৌড়ে উঠে আসে। তার চালকও। ঘোড়ায় চেপে আসে না, পাছে ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়ে!

ফেরার সময়ে তাড়াতাড়ির চেষ্টা না করলেও তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। বারে বারে যদিও ঘোড়া থামিয়ে ফিরে ফিরে চাইছি। ‘দেওদেখানি’তে এসে শেষ বারের মতো দেখে নিলুম কৈদারনাথের মন্দির। এমন অসামান্য স্নো-রেনজ আগে দেখি নি। পৃথিবীর তো অনেক পর্বতমালাই দেখবার স্বযোগ করে দিয়েছেন দয়াময় ভগবান। তবু কতো বিশ্বয় যে বাকি থাকে জীবনে! কতো রহস্য!

৪১

### পুনরপি খেত-সন্ত-কথা

আরো বিশ্বয় বাকি ছিলো। গৌরীকুণ্ডে পৌঁছে, বাস্তুপ্যাটরা নিতে ‘সুনীল লজ’-এর আপিসে গেলুম। এখানেই ঘোড়ার ভাড়া, ঘরের ভাড়া, খানার দাম, বিছানার ভাড়া, লেকট লাগেজের চার্জ—সব কিছু মেটাতে হবে। কোনোটাই বেশি দামি নয়, কিন্তু সব মিলিয়ে বেশ কয়েকশো দাঁড়ালো। গভীরভাবে ব্যাগে হাত পুরে টাকা পয়সা বের করে, মেটাতে গিয়ে দেখি—কী কাণ্ড? কখন ফুরিয়ে গেছে চপলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। টাকা তো নেই? কোথায় টাকা? কী করবো এবারে? কী সর্বনাশ!

রঞ্জনের সঙ্গে কিছুই টাকা ছিল না। ড্রাইভার সুরষ সিংয়ের কাছে কত আছে একবার জিজ্ঞেস করব নাকি? পেট্রল কেনার টাকা আছে ঠাঁর কাছে, তা জানি। এই সব ভাবছি আর পাগলের মতন হিসেব করছি। এখানেই থাকতে হবে, এবং T M O করে টাকা আনাতে হবে? দেখি যদি দিল্লিতে টেলিফোন করা যায়। বুকের মধ্যে ভয়ের ধস নেমেছে। আর ব্যাগটা হাতড়াচ্ছি। মাঝে মাঝে আমার ব্যাগে আমারই ভুলে যাওয়া পুরনো টাকাকড়ি বেরিয়ে পড়ে—যদি বেরোয়? নাঃ বেরোচ্ছে না। ফোন? এখানে কোথাও থেকে ফোন করতে পারা যাবে?

হঠাৎ হাতে ঠেকলো একটা পুরুমতন খাম। বের করে দেখি, শিবখ্রীষ্টস্বামীর জমা দেওয়া পচিশশো টাকা। আঃ! যেন তাঁর ফোকলা মুখের হাসিটা চোখে দেখতে পেলুম। গঙ্গোত্রীর সেই সাহেব সাধু জোর করেই পিকোকে এই টাকাটা তখন গছিয়ে দিয়েছিলেন। আমি প্রবল আপত্তি করেছিলুম। নিতে চাইনি পরের টাকার দায়িত্ব। যদি মরে-টরে যাই, ঋণী মরব? নাছোড় সাধু বললেন, ‘তাহলে ধরে নাও এই টাকাটা তোমার মেয়েকে আমার ‘দানম’। আবার আমার যখন এই টাকাটা দরকার হবে, আমি তোমাদের কাছে চাইবো। তখন তোমরাও ওটা আমাকে ‘দান’ করবে? ধার শোধ-বোধের ব্যাপারই রইলো না তাহলে!’ শিবখ্রীষ্টস্বামীজী একটি অনাথ-আশ্রম গড়তে চান। জমি কিনবেন। তাই টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে বাড়িতে চান, ঘুচাই আর পিকোর কাছে জানিয়েছেন। কিন্তু উনিশতো সন্ন্যাসী, উনি ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে চান না। তাই লোকদের দিয়ে দেন, পরে আবার চেয়ে নেবার ভরসায়।

—‘এই তো হৃষিকেশের এক চায়ের দোকানে তিনশো ডলার জমা রেখেছি। ফেরার পথে চেয়ে নেব।’

—‘সর্বনাশ করেছেন। ও টাকা আপনি আর পাবেন না।’ আমি বলে ফেলি।

—‘কেন পাবো না?’

—‘এরা বড় গরিব। টাকা খরচ হয়ে যাবে। ফেরৎ দিতে পারবে না। ওভাবে টাকা ছড়াবেন না আপনি।’ তারপরেই ওই টাকাটা রাখতে আমি রাজি হয়ে যাই। কি জানি কাকে কোথায় দেবেন, কার কীভাবে ক্ষতি হয়ে যাবে। গুঁর নিজেরও টাকাটা যাবে, তাদেরও চোর বদনাম হবে। শিবখ্রীষ্টস্বামী বলেছেন, কলকাতায় এসে টাকাটা নিয়ে যাবেন। খামের ওপরে দিল্লির একটা ঠিকানা, আর নিজের ব্রিটিশ পাসপোর্টের নম্বরটা লিখে দিলেন।—‘আমি টাকা তো রাখবো, কিন্তু তার জন্তে নিশ্চিত একটা ঠিকানা চাই, আইডেন্টিফাইং একটা কিছু চাই—’ বলে চেষ্টামেচি করাতে উনি লিখলেন। উনি বললেন, পচিশশো টাকা আছে। আমরা কিন্তু গুনে নিইনি। শ্বশুরমশাই বলতেন, সর্বদা টাকা গুনে দেবে, গুনে নেবে। আমার মনে থাকে না।

এই সেই টাকা। কেদারনাথে আমাকে আসতে রাজি করিয়েছিলেন সেই খ্রীষ্টান সাধুই। ভ্রমণের খরচও যুগিয়ে দিলেন তিনিই। শিবখ্রীষ্টস্বামীর খাম থেকেই দরকার মত টাকা নিলুম। ধার নিচ্ছি। পথে আবার ধার নিতে হবে। ফেরার পথ-খরচ পুরোই বাকি। টাকাটা এখনই গুনে রাখা দরকার। গুনেতে

বসে দেখি পঁচিশ নয়, সাধু দিয়েছেন মোট ছাব্বিশশো টাকা। ছাব্বিশটি করকরে একশো টাকার নোট।

পথের মধ্যে হঠাৎ এভাবে টাকা ফুরিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম। কিন্তু এর চেয়েও আশ্চর্য এই ছাব্বিশশো টাকা আবিষ্কার। শিবব্রীষ্টস্বামীর থামটি দেউলিয়া অবস্থায় হাসতে হাসতে তোমার হাতে যিনি এগিয়ে দিলেন তিনি কে?

এই যে বেইমান নবনীতা, সকলের ভার বইতে বইতে তোমার নাকি পিঠ কুঁজো হয়ে গেছে? তোমার ভার নাকি কেউ নেয় না? তুমি নাকি নিরাশ্রয়, নির্বান্ধব, জগৎপারাবারের তীরে একলা?

খুব শক্ত একটা মুঠোর মধ্যে ধরা রয়েছে তোমার হাত, নবনীতা। সেই হাত কখনো ছেড়ো না। কখনো তুলো না।

৪২

### দেখা হবে

শোনপ্রয়াগে অলোককে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি চলেছে গুপ্তকানী। পিকো চৌচিঁয়ে উঠলো, ‘মা—ঐ যে, সেই সাধু।’ আশ্চর্য—এঁকে আমরা সেই যমুনোত্রীতে দেখে-ছিলাম—যাত্রার শুরুতে। একটি মাত্র পা, পরনে কোঁপিন, মাথায় জটা, হাতে দণ্ড। যমুনোত্রী হয়ে, হয়তো গঙ্গাদেশেরায় গঙ্গোত্রী ঘুরে, কেদারনাথে আসছেন। পদ্মকে গিরিলজ্জন যিনি করান, আমাকেও তিনিই হাতে ধরে নিয়ে চলেছেন? এই সন্ন্যাসীর যে একটি পা নেই সেটা সবাই দেখতে পাচ্ছি। আর আমিও যে হস্তপদহীন বিকলাঙ্গ, সে খবর শুধু তিনিই জানেন।

যাত্রারস্তুে ঝাঁকে দেখেছিলাম, যাত্রা শেষেও তাঁর দেখা পেয়ে মনটা পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। শোনগঙ্গার সঙ্গে মন্দাকিনীর সঙ্গমের প্রবল গর্জনের শব্দের মধ্যে যেন আমারই বুকের উত্তাল উত্তাল কৃতার্থতা প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

আবার আসবো, হিমালয়, আবার দেখা হবে। নিজের নামে একটা পোস্ট-কার্ড ছেড়েছি গোঁরীকুণ্ড থেকে। যেন ভুলে না যাই—প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছি, এবারে একা আসবো, তখন আরেকটু ঘনিষ্ঠ হতে দিও, হিমালয়।